1959

CA-32

19-299NMR CA-32

0937
P-926

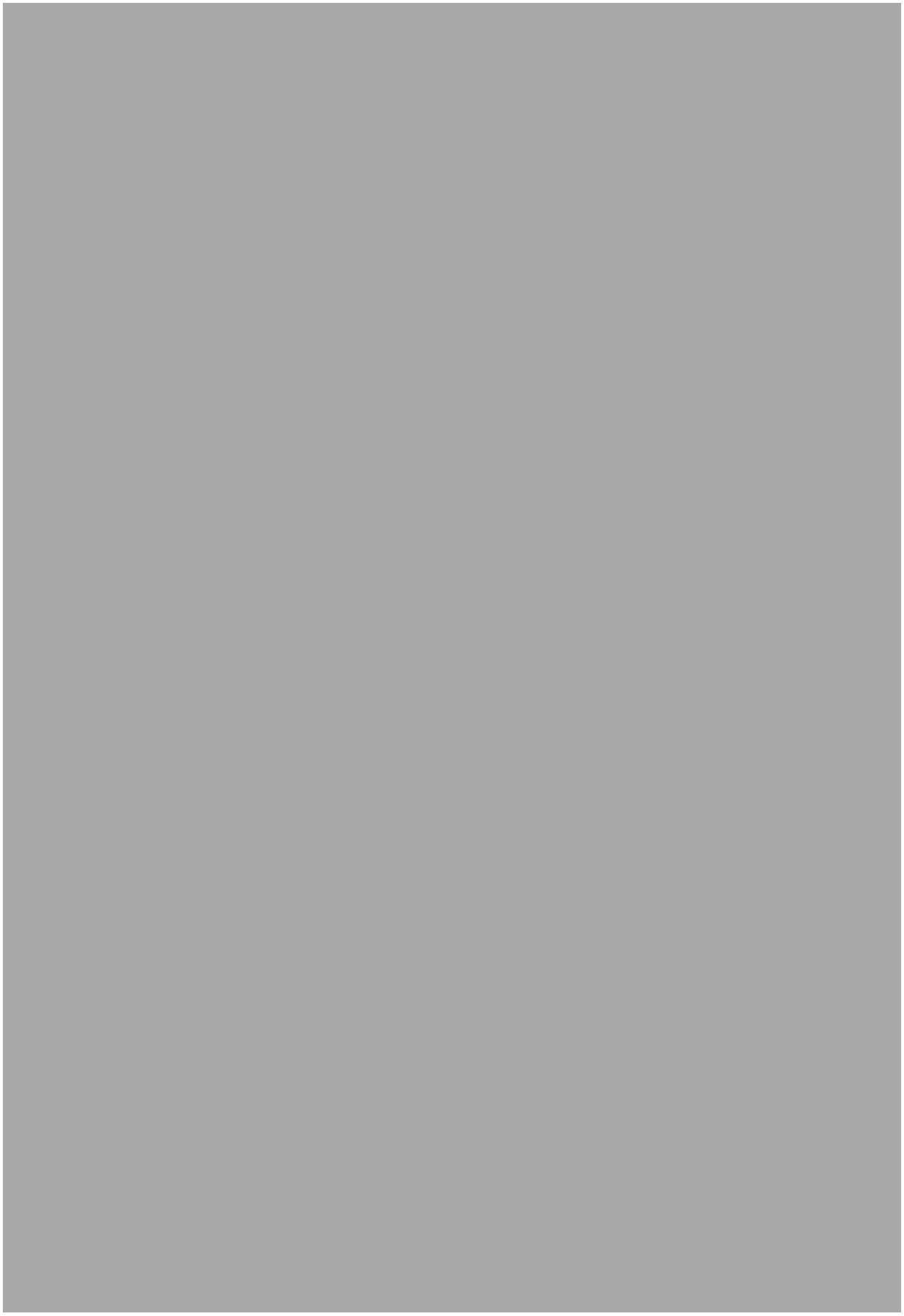

40

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

১৩৬৬

13·7
926

013.1
P.926

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

চত্বারিংশৎ বর্ষ

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীঅমল ভট্টাচার্য (সভাপতি)
" শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
" শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীকেতকী কুশারী (সম্পাদিকা)
শ্রীতপনকুমার লাহিড়ী (কর্মসচিব)

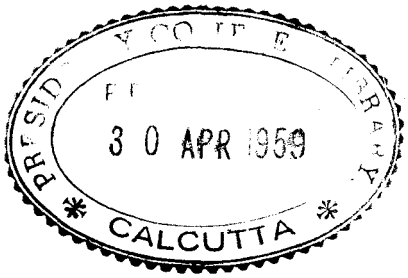

বৈশাখ ১৩৬৬ এপ্রিল ১৯৫৯

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

বৈশাখ ১৩৬৬ এপ্রিল ১৯৫৯

একটি সনেট ও একটি ট্রিওলেট

সুরজিৎকুমার দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, কলা

দর্পণে যে-মুখ ছাখো সে শুধু তোমারি নয়। ওতে
আরো কিছু অর্থ আছে। আরো এক অস্তিত্বের ছায়া
নিভৃতের রুদ্ধকক্ষে অজ্ঞাত গভীর উৎস হতে
উৎসারিত অভিলাষে ব্যাপ্ত করে অনিসর্গ মায়া।

সে শুধু তোমারি নয়। মুক্তকেশী ব্যথার পিছনে
না হলে কেবলি কেন মনে হয় কেউ বুঝি আছে!
বাতাসের ছদ্মবেশে, কেতকীর গন্ধে খুব কাছে
কেউ কি দাঁড়ালো সরে আড়ালের অন্ধকার কোণে!

এবং সন্ধ্যার ম্লান অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের চোখে
যতবারই চোখ পড়ে কেউ কি ইশারা করে? ডাকে?
রুদ্ধ করো বাতায়ন, অন্তরীণ দীপেরও আলোকে
যৌবন লুকাও ত্রাসে, কেউ বুঝি অপেক্ষায় থাকে।

দর্পণে তোমার মুখে প্রতিভাত অনিসর্গ ছবি:
দুই ঈশ্বরের সৃষ্টি: দেহের আত্মার দুই কবি।

জীবনে কয়েক মুহূর্ত যেন হীরে।
সচ্ছল নই, অভিলাষও পরিমিত।
জীর্ণ সাধের উজ্জ্বল পাড় ছিঁড়ে
আরোপ করেছি তবু মুহূর্ত হীরে।

আমার নির্বাক ঠোঁটে উত্তরের ভীরুকলি জাগে,
দলিত পেষণে তাকে ঝরাই, তবু সে বলে—বলো,
আলোর বলয় দূরে স'রে গেলে, ব্যর্থ অনুরাগে
রামধনুর আশা নিয়ে কেন চোখ কান্না-ছলোছলো ?
জোয়ার জাগবে না আর, চুপি চুপি ঢেউ ফিরে যাবে
বালুকার বেলা ধুয়ে, অনেক দাগকে মুছে দিয়ে,
শঙ্খ-কড়ি-ঝিনুকের উপহার দু'হাতে বিছিয়ে
প্রহত ঢেউয়ের দল সমুদ্রের বুকেতে হারাবে।
আমি বলি—যন্ত্রণার মধুমাস হয়নি নিঃশেষ,
দূরের আলোকস্তম্ভে এখনই ত' দীপ-জ্বলা সুরু ;
শর্বরীকে আলো দিয়ে প্রভাতের তপস্যা বিশেষ
আনবেই নতুন দিন। সমুদ্রের-ও বুক দুরু দুরু
নতুন জোয়ার-জলে। তারপর অকস্মাৎ এ কি !
আলোর বলয় যেন ঘুরে আসে, সাঙ্গ পরিক্রমা।
স্মৃতির অ্যালবামে ফের পুরানো ছবিরা হয় জমা
নতুনের রূপ ধরে—উজ্জ্বল দু' চোখ মেলে দেখি ॥

সূত্রধার

অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—(প্রাক্তন ছাত্র)

রুগ্ন শীর্ণ,
কে যাও আমার পাশ বেয়ে ? তুমি জীবনদেবতা
নও, তুমি নও আমার জীবন অথবা প্রাণের
গভীর বিধাতা, তোমার শরীর আমার শরীরে
বুঝতে পারি না ; আর, তুমি নও মৃত্যুর ছলে
ডাকঘরে সেই আয়ুষ্কান্ত রাজার মতন।

রুগ্ন শীর্ণ,
কে এসে আমার ক্ষণভঙ্গুর দুর্গের মান

প্রাণপণে রাখো, বয়সনোয়ানো শপথের ফুল
বিকোতে দাও না মৃত্যুর কাছে, জীবনের কাছে।

রুগ্ন শীর্ণ,
কে ওঠো আমার ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে,
আমার দেহের লণ্ঠন হাতে সারাঘর ঘোরো,
ভুলে যাও হাওয়া তোমার কেউ না আমার কেউ না!

জলের পুরাণ (অংশত)

জ্যোতির্ময় দত্ত—(প্রাক্তন ছাত্র)

হেমন্ত দুপুর যেন বাতাস
আর সূর্যের সিক্ত স্নিগ্ধ সরোবর ; নদীর সবুজ জলে
সূর্যের স্তম্ভিত মুখ যেন লতায় আচ্ছন্ন আলো
লুকোনো বোঁটায় বাঁধা, অজস্র পাতার আড়ালে,
ফুলে-ওঠা হলুদ কুমড়োর কৈলাস।

সে এসেছিল মহিষ চরাতে।
মন্থর মহিষের শিঙের উপর
বসে এক দূরদার্শনিক,
সমস্ত ব্যস্ত বস্তুর প্রতি উদাসীন, শালিক
তার হাঁ-করা ঠোঁটের সূক্ষ্ম করাতে

বাতাসের সুতো কাটছিল। মেয়েটির দৃষ্টি যতদূর
যায়, দেখা গেল সমস্ত পৃথিবী
যেন এক উলঙ্গ ভবঘুরে হালকা সাধুর
পিছুপিছু চলে গেছে। ঘাসের শীতল চাতালে
টইটুম্বুর হ্রদের মতো যা টলটলে,

তা সূর্যের আলো নয়, যেন সূর্যের চুয়োনো সঞ্চয়।
যেমন গঙ্গায় কুয়াশার সঙ্গোপনে ধ্যানস্থ বয়ার
সম্পূর্ণতা ভেঙে দেয় স্টীমারের নির্বোধ অলজ্জ আলো
একটি পরুষ চীৎকার তেমনি কঠিন ধারালো
অসঙ্কোচ ব্যস্ততায় হঠাৎ পৌছায়

আচ্ছন্ন মেয়েটির চেতনার নিথর নিঃসীম কেন্দ্রে।
সে দেখলো আরেক রাখাল, এত কাছে
যে মনে হোলো বাইরে নয়, বরং, শরীরের গভীর কানাচে
যেন কেউ নিভৃতে উত্তাপ নিচ্ছে। ঘাসের উপর তীব্র রৌদ্রে
ছেলেটির সবুজ ছায়া যেন শ্যাওলায় ঢাকা

কোনো কম্পিত তরল প্রাণী, তার সবুজ ছদ্মবেশের আড়ালে
পায়ের শব্দ শুনে লুকিয়ে, লুটিয়ে আছে।
সোনালী পিঁপড়েরা যেমন, কোনো কোনো পেয়ারার ডালে,
উঠতে গিয়ে ঝ'রে যায় (এত মসৃণ গাছের গুঁড়িটা !)
তেমনি এই সুঠাম ছেলেটির শরীর গড়িয়ে জীবন্ত স্বেদের ফোঁটা

ঝ'রে ঝ'রে পড়ে।

দুটি কবিতা

কেতকী কুশারী—পঞ্চম বর্ষ, কলা

সাউথ পার্ক সেমিটি

পৌত্তলিক পৌরাণিক উষ্ণবায়ু এ বাদামী দেশে
শতাব্দীর অপরাহ্ণে জীর্ণদেহ যে আত্মারা ঘুমায়
তাদের বিষণ্ণ শান্তি, জ্যোতির্ময় একান্ত বিশ্বাস
কিনে গেছে রক্তদানে কোনো এক ঈশ্বরসন্তান।

দুটি কবিতা

যে দেশে ট্র্যাজেডি নেই তার আর্দ্র মৈদাঘ আকাশে
অতিস্তব্ধ স্মৃতিস্তম্ভ বুঝি স্বদেশের স্বপ্ন দেখে,
চূড়া থেকে চূড়ান্তরে আলোড়িত, আগত প্রহরে
ঐতিহ্যের মধ্যরাত্রে ইয়োরোপে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

আদিনাগ, আদিপাপ, আদিদ্বন্দ্ব শুভ-অশুভের,
নতশির সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসীর নিরুদ্ধ বাসনা,
গুপ্তকক্ষ মঠে মঠে পাপী ছায়ামূর্তি ভিক্ষা করে
নারকীয় চিত্তশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, অলৌকিক ক্ষমা।

চিন্তাহীন আত্মদানে ব্যগ্র মোক্ষপ্রিয় মহাদেশ,
রাজদুহিতার অঙ্কে শায়িত গলিতকুষ্ঠরোগী,
হাসে অন্ধ দেবদূত, ভিত্তিগাত্রে পবিত্র কুমারী,
সমুত্থিত উন্মথিত শিশুকণ্ঠে সংরক্ত সংগীত।

রাত্রিদিন আন্দোলন, প্রবৃত্তির প্রথম প্রলয়,
বিকায় নক্ষত্র-আত্মা, পরক্ষণে মরে অনুতাপে,
যন্ত্রণায় কম্পমান অনেকান্ত অর্কেস্ট্রার মত
লৌহমার্গে পড়ে থাকে কারেনিনা হিমাহত রাতে।

বিনয় অন্তিম পুণ্য : আরো ঝরো স্বর্গীয় করুণা,
হয়তো এখন সন্ধ্যা নাতিদূরে অনাদি গঙ্গায়,
বিষুবীয় বৃক্ষদের স্নেহচ্ছায়ে যারা শুয়ে আছে
তাদের বিবর্ণ চোখে অবিশ্বাস এনো না কখনো।

২. রামাহো

শরতের অপরাহ্নে দ্রুত এলো অনিবার্য জ্বর,
চেতন তন্দ্রার ঘোরে সমাচ্ছন্ন হলো সর্বদেহ,
মহান্ দুঃখের মত স্পর্শ করলো অস্তসূর্যস্নেহ,
দিগন্তের শব্দদের মনে হলো অস্বভাবী স্বর।

প্রবল ইচ্ছার স্রোত : তলহীন তাপের বন্যায়
ডাক্তারী ছুঁচের মত সূক্ষ্ম ক্ষোভে বিদ্ধ হলো মন,

কঠিন তপস্যা-লব্ধ সোপ্রানোর তির্যক রণন
মনে হলো অকারণ, নিরর্থক, বিশুদ্ধ অন্যায়।

পৃথিবী পুনরাবৃত্ত, তিলমাত্র তবু শ্রান্তি নেই,
শস্যহানি, শিশুমৃত্যু, দিনশেষে শ্বেতশঙ্খ বাজে,
বিপ্রলব্ধ যুবতীর:তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত হওয়া সাজে,
অশোভন এই জ্বর আমি কিন্তু জানতাম আসবেই।

কিছু নেই প্রার্থনীয়, অসার্থক রত্নের সন্ধান,
অন্তহীন ধৈর্যভরে ব্যাক্ করে সাবধানী ট্রেন,
ক্ষণিকের উল্লাসের সংবাদের নৈশ লেনদেন,
অকস্মাৎ দ্রিমিদ্রিমি দেশোয়ালী রামচন্দ্র-গান।

মাল্যবান্-অরণ্যানী মেঘাত্যয়ে ফেলেছে নিঃশ্বাস :
অতীতের রোমন্থনে নিরুৎসুক যদিও সংসার,
তোমাকে মিনতি করি, জ্বরতপ্ত লগ্নে একবার
পাতার মর্মরে শোনো শ্রীরামের পুণ্য ইতিহাস।

বিগত কৌলীনভীতি, সহনীয় হবে না বিচ্ছেদ,
এই গান, এই নাম, সহস্র শরৎরাত্রি ধ'রে
অযাচিত অনুরাগে বারংবার নিবেদন করে
মিলনের সমারম্ভে ক্ষত্রিয়ের অনির্বাণ খেদ।

মহাশূন্যে শীঘ্র হবে সায়ন্তন শুভ চন্দ্রোদয়,
এ শুধু সূচনামাত্র, পরিণতি পাবে কর্মফল,
মহার্ঘ এ অনুভব! অন্য সব বস্তুত নিষ্ফল,
হুতবহ অন্তরাত্মা ভিক্ষা করে শালীন প্রণয়।

শেষের প্রহরে

মৃদুল নিয়োগী—প্রথম বর্ষ, কলা

শূন্যে পাখি উড়ে যায় শিশু-আশা আকাশে উধাও,
স্বর্ণিল সূর্যের মন দিগন্তের দূত হয়ে আসে,
বাতাসে স্বপ্নের ঘ্রাণ ; এ ইন্দ্রিয় যখনই সজাগ—
তখনই দেহের প্রশ্ন : মন আজ কাকে ভালোবাসে ?

মনে হয় এও যেন শরতের সাহানা-গোলাপ ;—
সমুদ্রের অতলান্তে আলোকের অযথা প্রলাপ'
কখন লেগেছে ভালো, একবার বলো, শুধু মন,
আমি ভাবি : এলোমেলো আকাশের উদাস বাউল
দেহতত্ত্ব গানখানি গেয়ে যাক তবু ক্ষতি নেই,
আজ চাই দিগন্তের আহ্বান : একমুঠো ফুল
এবং হৃদয় হোক্ শিশু-আশা পাখির মতন।

তারপর চাঁদ ওঠে, ধ্রুবতারা জ্বলে ওঠে ধীরে—
পথের ঠিকানা মেলে ; সুখ থেকে শান্তি আসে ফিরে।

প্যারাডাইস লস্ট

অধ্যাপক নির্মলকান্তি মজুমদার

শুক্লা একাদশীর ঝিকিমিকি বেলা। পাড়ায় বিজয়া দশমীর প্রণামপর্ব চলেছে। হাসতে হাসতে অনিমেষ রায় দেখা দেন অমলেন্দু মিত্রের বাড়ীতে।

অনিমেষবাবু বনেদী ঘরের সন্তান। বেশ শিক্ষিত লোক। প্রিমিয়ার কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. ও ল পাশ করেন প্যারাডাইস হস্টেলে থেকে। হস্টেলে তাঁর রুমমেট ছিল বাংলার কোন বিখ্যাত রাজপরিবারের একটি

ছেলে। সেই পরিচয়ের মধুর সমাপ্তি ঘটে পরবর্তী জীবনে। অনিমেষবাবুর বিবাহ হয় এই অভিজাত বংশে। বাপের বিপুল জমিদারি। রোজগারের চেষ্টা করেন নি কোন দিন। ভোগবিলাসেই অতিবাহিত হয়েছে দীর্ঘকাল। দেশবিভাগের ফলে জমিদারির বেশীর ভাগ পাকিস্তানে পড়ায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্তমানে জমিদারি প্রথার অবসানে বড়ই বিব্রত বোধ করছেন। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বিরল। অধিকাংশ মানুষকেই কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করতে হয়। তবে সুখের পর দুঃখটা সত্যিই বড় মর্মান্তিক।

প্রীতি-সম্ভাষণের পর মিষ্টিমুখ করতে বাড়ীর ভিতরে আসেন অনিমেষবাবু। মিষ্টির রেকাবিটি হাতে ক'রে সিঁড়ির পাশে দাঁড়াতেই অমিতাভ ওপর থেকে নেমে এসে তাঁকে প্রণাম করে। অমিতাভ অমলেন্দুবাবুর বড় ছেলে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার ক'রে আই. এ. পড়ে প্রিমিয়ার কলেজে। সাগ্রহে তার মাথায় হাত দিয়ে শুভাশিস্ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন অনিমেষবাবু—তুমি প্যারাডাইস হস্টেলে থাক? কেমন লাগে?

অমিতাভ ঘাড় নেড়ে জানায় হস্টেল তার ভালোই লাগে। অনিমেষবাবু যেন সন্তোষজনক উত্তরই প্রত্যাশা করছিলেন। বলেন—ভালো লাগবারই কথা। কী আনন্দেই না কেটেছিল আমাদের ছাত্রজীবন! মনের পাতায় এখনো অম্লান হয়ে রয়েছে সেদিনের স্মৃতি। তোমার কোন ওয়ার্ড?

—২ নম্বর।

—২ নম্বরের ট্র্যাডিসন খুবই ভালো। আমাদের আমলে যাঁরা ২ নম্বরে থাকতেন তাঁদের কয়েক জনই এখন বাংলার শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন। তোমার রুম নম্বর?

—২০।

—২০ নম্বর তো খুব পয়মন্ত হে! ঐ রুমের সমীর বসু আই. সি. এস. পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল। ওঃ, সেদিন কত হইহই! বনমালীর সমস্ত খাবার আধ ঘণ্টার মধ্যে সাফ হয়ে গেল।

অনিমেষবাবু একটু থেমে রক্ত-রাঙা পশ্চিম আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তিরিশ বছর আগেকার সেই আনন্দমুখর দিনটিতে তিনি যেন ফিরে গিয়েছেন, যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন পুরনো ছাত্রবন্ধুদের মাঝে। অমলেন্দুবাবু বলেন—অনিমেষবাবু, আপনি বনমালীর খাবারের কথা ভাবছেন আর এদিকে আপনার খাবারে মাছি বসছে। খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি।

অপ্রস্তুত হয়ে আধখানা সন্দেশ মুখে পুরে বনমালীর প্রসঙ্গ তোলেন অনিমেষবাবু—কী চমৎকার ব্যবস্থা ছিল বনমালীর! যা চাইবে, তাই পাবে—মাংস, চপ, কাটলেট,

কচুরি, শিঙাড়া, সন্দেশ, সবরকম। খাঁটি জিনিস দিয়ে তৈরি—খেয়ে কখনও অসুখ করত না। এখন শুনেছি ক্যান্টিন হয়েছে। ভালো জিনিস দেয়? ভ্যারাইটি মেলে?

—আমি ক্যান্টিনে খাইনে। আমাদের টিফিন সরবরাহের ভার নিয়েছে ওয়ার্ড সার্ভেণ্ট। যারা ক্যান্টিনে খায় তারা অবশ্য সুখ্যাতিই করে। ক্যান্টিনের ভেজিটেবল্ চপের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে হস্টেলের বাইরেও।

—ক্যান্টিনের পরিচালক আমাদের বনমালীর কেউ হবে হয়তো। একটু খোঁজ নিও। একটা মজার ঘটনা বলি শোন। আমাদের আই. এ. পরীক্ষা সামনে। জানুয়ারি মাস। কনকনে শীত। ঠনঠনিয়াতে কয়েকটা ঝিনঝিনিয়া কেস হয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফেরবার সময় খুব কাঁপুনি ধরল। আবহাওয়া খারাপ। ভারি ভয় পেলাম। হস্টেলে ঢোকবার পর মাথায় একটা খেয়াল চাপল, বনমালীকে গিয়ে বললাম গরম গরম লুচি আর মাংস আমার ঘরে দিয়ে আসতে। পেট ভরে লুচি মাংস খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আশ্চর্য! ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গলগল ক'রে ঘাম হয়ে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। যথারীতি রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়াশুনা করলাম। এখন সে স্বাস্থ্যও নেই সে সাহসও নেই। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের গৌরবের দিন চলে যায়।

কয়েক মিনিট বিরতি। অনিমেষবাবু বাকী সন্দেশগুলো শেষ ক'রে মাটিতে রেকাবিখানি নামিয়ে রাখেন। অমলেন্দুবাবু এতক্ষণ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনছিলেন অনিমেষবাবুর গল্প। তাঁর খাওয়া শেষ হতে জল ও পান এগিয়ে দেন। এক নিশ্বাসে জলের গ্লাসটা খালি ক'রে পান চিবোতে চিবোতে আবার আরম্ভ করেন অনিমেষবাবু—বুঝলে অমিতাভ, আমাদের যুগে হস্টেলের ধোপা ছিল বাবুলাল। বেনারস অঞ্চলে বাড়ি। বহুকাল কলকাতায় বাস। একেবারে তারিখ ধ'রে কাপড় দিত। কখনও কোন জিনিস হারায় নি—বালিশের ওয়াড়ও না, রুমালও না। এই বাবুলালকে জীবনে ভুলব না। আমি লজিক-এ স্ট্রং ছিলাম। কিন্তু প্রশ্নগুলো বেখাপ্পা রকমের হওয়ায় পরীক্ষা একদম খারাপ হয়ে গেল। অঙ্কে মেক-আপ করতে হবে ব'লে মনে জোর ক'রে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছি। কয়েক পা এগোতেই দেখি গাধার পিঠে পর্বতপ্রমাণ বস্তা চাপিয়ে বাবুলাল আসছে হস্টেলের কাপড় নিয়ে। সর্বনাশ! একজন সহপরীক্ষার্থী মন্তব্য করলেন—"অযাত্রা, অযাত্রা। আজ একেবারে ডুবে যাব।" দেখেশুনে আমার অবস্থাও শোচনীয়। পরীক্ষা কিন্তু বেশ ভালো হল। অঙ্কে কত পেয়েছিলাম জানো? একশো ছিয়ানব্বই। অঙ্কের জোরে মোটের ওপর আমার পজিশন উঁচুতেই ছিল। বাবুলালের মুখ দেখে মুখরক্ষা হয়েছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। অনিমেষবাবুর সেদিকে খেয়াল নেই। তাঁর মধ্যে যে ছাত্রটি এতদিন সুপ্ত ছিল সে যেন আজ জেগে উঠেছে। তিনি শুরু করলেন—আমাদের সময়ে ওয়ার্ডগুলোকে চমৎকার ভাবে ক্ল্যাসিফাই করা হয়েছিল—No 1 for singers and

actors ; No 2 for scholars and stars ; No 3 for players and sportsmen ; No 4 for debaters and philosophers ; No 5 for disturbers and mischiefmakers.

অমলেন্দুবাবু হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। অমিতাভ কিছুক্ষণ ভেবে বলে—আজকাল বিভিন্ন ওয়ার্ডের ঐ ধরনের বৈশিষ্ট্য নেই। সব ওয়ার্ডেই সব রকম ছেলে অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে আছে। যুদ্ধের সময়ে পুরনো ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে কিন্তু নতুন ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠে নি।

—ঠিক, ঠিক। ও গ্যাপটার কথা ভাবি নি। আচ্ছা, ছেলেদের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে নিশ্চয়। স্বাধীন দেশ। ঘরে বাইরে নতুন হাওয়া, প্রগতির পথ খোলা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহারে আমরা একবার অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলাম। প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এক অদ্ভুত উপায়ে। সমস্ত ছেলেরা সব ওয়ার্ড থেকে নিজের নিজের খাবার জলের কুঁজো একই সময়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠনে। বিশ্রী ব্যাপার। এখন ভাবলে হাসিও পায়, লজ্জাও হয়। এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় আজকালকার ছেলেদের রুচিতে বাধে। কি বল ?

—মোটেই না। সেদিন আমাদের আলো নিবে গিয়েছিল রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময়। অমনি কয়েকজন ছেলে 'বলহরি হরিবোল' ব'লে চেঁচাতে লাগল আর কয়েকজন ক্যানেস্তারা বাজাতে লাগল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেক কষ্টে তাদের শান্ত করলেন। অত্যন্ত কুৎসিত কাণ্ড।

অমলেন্দুবাবু বলেন—যে বয়সের যা। ছাত্রেরা আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই আছে। হয়তো কিছু রকমফের হয়েছে। আগে থিয়েটারে যেত, এখন যায় সিনেমায়। আগে ইডেন গার্ডেনে বেড়াত, এখন বেড়ায় লেকের ধারে।

মৃদু হেসে অনিমেষবাবু বলেন অমিতাভকে—তোমাদের জীবনধারা সেই একই খাতে বইছে তা হলে। আমাদের সময়ে দুষ্টুমিতে পয়লা নম্বর ছিল মৃগাঙ্ক জানা। মেদিনীপুরে বাড়ি। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকত। যেমন শক্তিশালী, তেমনি স্পষ্টবাদী। হস্টেলসুদ্ধ লোক তাকে ভয় করত। এমন কি কর্তৃপক্ষও তাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। একদিন একটা নেপালী হ্যারিসন রোডের মোড়ে মৃগাঙ্কের পকেট মারতে যায়। মৃগাঙ্ক বিদ্যুদ্‌বেগে তার হাত চেপে ধ'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসে হস্টেলে। তার মারের চোটে নেপালী আমাদের সামনে নাকখত দিয়ে বলে সে জীবনে অমন কাজ আর করবে না। মৃগাঙ্ক তাকে পুলিশের হাতে না দিয়ে ছেড়ে দেয়। তার অন্তঃকরণটা সত্যিই উদার ছিল। কলেজ ছাড়ার পর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। কার সঙ্গেই বা হয়! পশুপতি হাই কোর্টের জজ, পরিতোষ কলকাতা পুলিশের হর্তাকর্তা, প্রণব নামজাদা ব্যারিস্টার, মলয় ডাকসাইটে সার্জেন। আমাদের মধ্যে কত মাখামাখি ছিল এক সময়, কিন্তু আজ বিরাট ব্যবধান।

অনিমেষবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। তাঁর কণ্ঠে বাজে বেদনার সুর। দীপান্বিত পথের পথিক তাঁর বন্ধুরা আর তিনি আজ ঢাকা বিলুপ্তির তিমিরে। বৈঠকখানার ঘড়িতে আটটা বাজে। অনিমেষবাবুর ছেলে এসে জানায় বিপিনবাবু প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। স্বপ্নোত্থিতের মত অনিমেষবাবু বলেন—ও, বিপিন অপেক্ষা করছে। আমি তাকে সাতটায় আসতে বলেছিলাম। সাতটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ!

অমিতাভকে বলেন—আজ আসি—ভালো ক'রে পড়াশুনা কর। তোমার ওপর আমাদের অনেক আশা ভরসা। যাব একদিন প্যারাডাইসে, দেখে আসব কেমন আছ তোমরা। অনেকদিনের অনেক কথা সেখানে লেখা আছে অদৃশ্য অক্ষরে। যেতে ইচ্ছা হয় বই কি!

তারপর অতীত হয়েছে প্রায় দেড় বছর। জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে কত আকাশের চাঁদ, একে একে বিদায় নিয়েছে কত নিশীথের তারা। অনিমেষবাবু আজও পা দেন নি প্যারাডাইসে। কলেজ বন্ধ হলেই অমিতাভ দেশে আসে। দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। কুশল জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু ভুলেও তোলেন না হস্টেলের কথা। কোন রকমে শিষ্টাচার বজায় রেখে পাশ কাটান। অমিতাভের পড়ার ঘর থেকে তাঁর সমস্ত বাড়িটাই নজরে পড়ে। অনিমেষবাবু টিউবওয়েলের ধারে ব'সে স্নান করেন। লুঙ্গি প'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খান। কণ্টেনার হাতে যথাকালে বাজার থেকে ফেরেন। রূপালী রোদে মাথার চুলগুলো ধবধব করে। হেমন্তের ক্লান্ত দুপুরে চিলের চিৎকার অন্তরে আঘাত দেয়। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে পাঁচি পাগলীর বৈরাগ্যের গান চোখে জল আনে। দিন চলে যায়।

আমাদের অনুপ্রাস-প্রবণতা

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগের যখন সূচনা ঘটেছিল, সেই সময়ে মধুসূদন ছিলেন শক্তিমান কবি, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন শক্তিমান গদ্যসাধক। 'আধুনিক' কথাটাই আপেক্ষিক। তা নিয়ে তর্ক করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার দুটি দিক বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন —একদিকে পাঁজির হিসেব, অন্যদিকে মর্জির বিশেষত্ব, এই দুই লক্ষণই ধর্তব্য। সে যাই হোক, ১৮৬০ সালে মধুসূদনের লেখা কয়েকখানি চিঠির মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র

বিষয়বস্তু এবং তার রীতি-প্রবর্তনা সম্বন্ধে নানা মন্তব্য পাওয়া গেছে। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—'I have used more 'অনুপ্রাস' and 'যমক' than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank Verse'।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম কয়েক ছত্রের মধ্যেই অনুপ্রাসের প্রাচুর্য দেখা যাবে—

কোথা সে কনকাসন, রাজছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে ?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন ?
কোথা পারিজাত-ফুল, ফুলকুলপতি ?

আরো আগেকার বাংলা কবিতায় অনুপ্রাসের প্রাচুর্য ছিল অব্যাহত। মধুসূদন সংকোচ বোধ করলেও কবিওয়ালাদের এ-বিষয়ে কোনো কুণ্ঠা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মহিমা বোঝেন নি। অনুপ্রাসের ঝোঁক বজায় রেখে তিনি বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

এসব মতামত অবশ্য অনেকদিনের পুরোনো জিনিস। তবে, সেকাল থেকে অপেক্ষাকৃত একালে এসেও আমাদের লেখকদের মধ্যে কারও কারও রচনায় অনুপ্রাস-প্রীতির বেশ আতিশয্য চোখে পড়ে। সেই সূত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়া স্বাভাবিক। ১৩১৮-১৯ সালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ১৯১২-১৩ সালেও অনুপ্রাসের ঝোঁক নিঃশেষ হয় নি। তখনকার 'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রতিভা', 'ঢাকা রিভিউ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় অনুপ্রাস-চর্চার এবং অনুপ্রাস সম্বন্ধে বচসারও কমতি ছিল না। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে, সংস্কৃত কলেজের সারস্বত সম্মেলনে এবং রসিক ও বিদ্বানের সভাতে-সম্মিলনে অনুপ্রাস সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পড়া হোতো। ১৯১২ সালের ২২এ জুলাই ললিতকুমার 'ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে' 'অনুপ্রাসের অট্টহাস' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন ; তার সূচনাটা এইরকম—

'অয়ম্ অহম্ ভোঃ। আমি অনুপ্রাস। রসের আদিতে যেমন আদিরস, অলঙ্কারের আদিতেও তেমনি আমি। নায়ক-নায়িকার মধুর মিলনে আদিরস এবং ভাব ও ভাষার মধুর মিলনে আমি ঘটকের কাজ করি।'

উচ্ছ্বাসের বশে ললিতকুমার অনুপ্রাসের পক্ষে আরো উৎসাহের কথা লিখেছিলেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই তিনি জানিয়েছিলেন—

'আমি বিশ্বব্যাপী, জগজ্জয়ী, শক্তিশালী, সর্বেসর্বা'।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে পৌঁছে তাঁর কলমের দৌড় এতোদূর বেড়ে গিয়েছিল যে বাক্যের আয়তন প্রায় অবাধ হয়ে উঠেছিল। যেমন—

'জীবে শিবে, জীবে জলে, স্থলে সূক্ষ্মে, রূপরসে, দিগ্‌দেশে, জলে স্থলে, ভূলোকে দ্যুলোকে, অনলে অনিলে সলিলে, আলোকে আঁধারে, আকাশে বাতাসে, সরিৎসাগর-ভূধরে, পারাবারে, সমুদ্রসৈকতে, সাগরসঙ্গমে, বারিধিবক্ষে, বাড়বহ্নিতে, তরঙ্গভঙ্গে, লহরীলীলায়, শীতল নির্মল জলে, সসাগরা ধরায়, ধরাধামের শ্যামশোভায়, ফলমূলে, উদ্ভিদে, ফুলফলে, পত্রপুষ্পে, পত্রপল্লবে, লতাপাতায়, তরুলতায়, শাখাপ্রশাখায়, জলেজঙ্গলে, বনেবাদাড়ে, পাহাড়পর্বতে, গিরিগুহায়, গুহাগহ্বরে, নদীনালায়, খালে-বিলে, বিল ও ঝিলে, চরাই ও উতরাইএ, জীবজন্তুতে, পশুপক্ষীতে, সরীসৃপে, কৃমিকীটে, সাতসমুদ্রে, দশদিকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, বিশ্ববৈচিত্র্যে, সর্বত্র আমাকে প্রভূত পরিমাণে পাইবেন।'

১৩১৯ সালের ভাদ্র ও আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল ললিতকুমারের এই লেখা! গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিদ্যার নানান শব্দ এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দিয়ে হঠাৎ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের কথা তুলে তিনি বলেছিলেন—

বৌবাজার, বাগবাজার, রাজার বাজার,
বাবুর বাজার, টিকটিকি বাজার,
বৈঠকখানা বাজার……সর্বত্র আমি।

এইরকম আরো কয়েকটি লেখা একসঙ্গে জমিয়ে বাংলা ১৩২০ সালে তিনি একখানি বই প্রকাশ করেন। সে বইয়ের নাম 'অনুপ্রাস'। এ-ছাড়া তাঁর আরো বই ছিল। ছোটোদের জন্যে তিনি 'ছড়া ও গল্প' লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্রে তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'যেখানে বেতের চাষ ছিল সেখানে ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যে আপনি ঠাকুরদাদার পদে পাকা হইয়া বসুন এবং নাতিনাতনী দলের আনন্দ-কোলাহলে দেশে আপনার জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতে থাকুক।'

আমাদের সাহিত্যের আরো আধুনিক, আরো সাম্প্রতিক পর্বে লঘু প্রবন্ধের যে ধারাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে, সেই ধারার কথা ভাবতে বসলে তাঁর আর-একখানি বইয়ের নাম মনে পড়ে। 'অনুপ্রাস'-এর নমুনা থেকেই তাঁর মনের ধরনটা বোঝা গেছে। 'ফোয়ারাতে'ও সেই ফুর্তির মেজাজটাই মুখ্য। তাঁর অনুপ্রাস ছিল সংক্রামক! 'ফোয়ারা'-র সমালোচনা লিখতে গিয়ে 'ভারত-মহিলা' জানিয়েছিলেন, 'ললিতবাবুর তরল সরল রসটলমল রচনাগুলি একত্রে পাইয়া আজ বড় আনন্দ হইতেছে।' রবীন্দ্রনাথ

তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, 'আপনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি ফোয়ারা দান করিলেন গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে ভোগ মজা নিরবধি।'

১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এবং ঐ মাসেরই 'মানসী' পত্রিকায় যথাক্রমে 'খাঁটি সাহিত্যে অনুপ্রাস' এবং 'সুকুমার সাহিত্যে অনুপ্রাস' নামে তাঁর দুটি লেখা বেরিয়েছিল। সেই লেখা দুটিতে বাংলা বই এবং বাঙালী লেখকদের নাম ইত্যাদির যে তালিকা সাজানো হয়েছিল, তাতেও আমাদের অনুপ্রাসপ্রবণতার বিশেষত্বটি বেশ উপভোগ্যভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। বৈষ্ণব যুগের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'বিবর্তবিলাস',—জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়,'—রঘুনন্দনের 'রামরসায়ন' আর ভারতচন্দ্রের ধেড়েভেড়ের কৌতুককাহিনী ইত্যাদি পুরোনো আমলের নামে নামে অনুপ্রাস তো ছড়িয়েই আছে, এমন-কি বিহারীলালের 'বন্ধু-বিয়োগ' ও 'বাউল-বিংশতি'তে, সুরেন মজুমদারের 'সবিতা-সুদর্শন', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল', 'রাজা ও রানী' এবং আরো একালের সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থনামের উদাহরণে ললিতকুমার সেই একই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। বাংলার 'প্রথম নভেল ফুলমণি ও করুণা'—এই উক্তটুকুও তাঁর সেই অনুপ্রাসচিন্তার মধ্যেই অকস্মাৎ চোখে পড়ে যায়! সম্প্রতি 'ফুলমণি ও করুণা' সম্পাদনা করে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সে-বইখানি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজে উৎসাহ সঞ্চার করেছেন। ললিতকুমারও 'ফুলমণি ও করুণা'-র বিশেষ দাবি বা ঐতিহাসিক মর্যাদা উপেক্ষা করেন নি।

সে যাই হোক, ললিতকুমারের এই অনুপ্রাস-সন্ধিৎসার সবটাই একজন অধ্যাপকের (তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন) খেয়ালমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধের গুণে তাঁর এ-আগ্রহ জেগে উঠেছিল। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', 'বাংলা শব্দদ্বৈত' এবং 'ভাষার ইঙ্গিত'—এই প্রবন্ধ তিনটি সে-সময়ে ভাষাবিদ্‌দের বিশেষ একটু নাড়া দিয়েছিল।

একটি উপন্যাস পাঠ প্রসঙ্গে

শান্তা সেনগুপ্ত—পঞ্চম বর্ষ, কলা

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন নবাগত লেখক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সবিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীঅবধূত। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর ত্রয়োদশ সংস্করণ মুদ্রিত হবার বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছে। এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জনের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথেরও খুব কম গ্রন্থেরই

হয়েছে। লেখকের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর পরবর্তী রচনার অন্যতম 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'। এই বইটিরও পাঁচটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় এক বছরের মধ্যে।

উপরিউক্ত দুটি গ্রন্থ পাঠ করে লেখকের এই জনপ্রিয়তার একটা সঙ্গত হেতু খুঁজে বার করা কঠিন হয় না। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ও 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এই যে, এই দুটি গ্রন্থের পটভূমিকা রচিত হয়েছে আমাদের পরিচিত জীবনসীমার বাইরে অপরিচিত স্থান ও পাত্রকে নিয়ে। ঘটনা ও চরিত্রের প্রভূত বৈচিত্র্য ও অভাবনীয়তা আছে এই দুটি গ্রন্থে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ দীর্ঘ মরুপথ পরিক্রমার মধ্যে কতগুলি অভিনব অভিজ্ঞতা লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। মরুযাত্রার ক্লেশ, অনাহার ও পথভ্রান্তির আশঙ্কা, জয়শঙ্কর মুরারজীর করুণ মৃত্যু, দস্যু-আক্রমণের আশঙ্কা, জল তথা জীবনদাতা কূপওয়ালাদের দীনকরুণ জীবনযাত্রা, এবং সর্বোপরি কুন্তী-থিরুমলের বিচিত্র রোম্যান্টিক কাহিনী—সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে কতগুলি আকর্ষণীয় বস্তু আছে এই গ্রন্থে। তবুও মনে হয়, এই সকল ঘটনাপুঞ্জ ও চরিত্রপুঞ্জ থেকে লেখক এমন কোন শিল্পরসের সৃষ্টি করতে পারেননি যার জন্য পাঠকসমাজে এই গ্রন্থটির ব্যাপক সমাদরকে সঙ্গত বলে মনে করা যায়। লেখক এখানে যেন জীবনভূমির উপরতলাতেই বিচরণ করে গেছেন, জীবনসত্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। মরুভূমির পটভূমিকায় কুন্তী-থিরুমলের কাহিনী নিয়েই মানবজীবনের গভীর ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরতে পারতেন লেখক। কিন্তু তিনি ঘটনা-বর্ণনার উপরে উঠতে পারেননি। তাই প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও লেখকের গভীর জীবনদৃষ্টির অভাবে এই উপন্যাসটি পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে পারে না। বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বিচ্ছিন্ন কাহিনী যতই চিত্তাকর্ষক হোক, সামগ্রিক বিচারে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৃতি হয়ে ওঠেনি।

তবু, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর সঙ্গে তুলনায় 'মরুতীর্থ হিংলাজ' লেখকের সার্থকতর রচনা। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর পটভূমি আরও বিচিত্র। লেখক উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত শ্মশানে কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেছে বহু জীবিত ও মৃত মানুষ। শ্মশানযাত্রীদের পিছনে ফেলে আসা জীবন, শ্মশানবাসী ডোম ও অন্যান্যদের চলমান জীবন—এই জীবিত ও মৃত উভয়কে নিয়েই শ্মশানভূমির প্রতিদিনের কথাকে লেখক বলেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। বাংলা কথাসাহিত্যে আর কোথাও শ্মশানভূমির জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে নিয়ে একটি সমগ্র উপন্যাস রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ বইটির প্রধান আকর্ষণই তার প্রতিপাদ্য শ্মশানজীবনের এই অভিজ্ঞতাগুলি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—ব্যাপকতা ও বিচিত্রতায় এই অভিজ্ঞতাগুলি অনন্য! শ্মশানভূমির ও তার পারিপার্শ্বিকের, এমন-কি লেখকের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত গদীটির বর্ণনাও গতানুগতিকতার বাইরে। তার উপর, জীবিত অথবা মৃত, এই শ্মশানচারী

মানুষগুলির জীবনের ইতিহাসকেও অনেক বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে ও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। বৈচিত্র্য ও অভাবনীয়তার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে সেই ঘটনাটির আর তুলনা কোথায় যেখানে পুলিশ-অভিযানের সময়ে লেখক প্রজ্বলিত চিতারোহণ করেছিলেন মড়ার একটি খণ্ড হাত মুখে নিয়ে! 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এ এই রকম বহু খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনার পরিচয় ছড়ানো, যাকে লেখক বলেছেন, 'মহাশ্মশান—উদ্ধারণপুর-ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া মণিমুক্তাগুলি', পাঠক যদিও নিজের অভিরুচিমত এই 'মণিমুক্তাগুলি'র মূল্য যাচাই করে নিতে পারেন। শ্মশানভূমির জীবন-যাত্রায় যে কতখানি বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব, এবং সেই জীবনকেও যে আবার সাহিত্যের উপজীব্য করে তোলা যায়, সেকথা শ্রীঅবধূত সপ্রমাণ করতে না বসলে তা জানার সুযোগ আমাদের হতো না।

আলোচ্য গ্রন্থে সব ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে একটি বিশেষ সমস্যা। লেখকের বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জ ও পাত্রপাত্রীদের চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়, লেখক সর্বত্রই এক বিকৃত জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটিতে যে-সব কাহিনী ও ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, যে-সব চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র পাশব প্রবৃত্তির রূপায়ণ, ব্যভিচার ও অসংযত স্থূল কামপ্রবৃত্তির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গ্রন্থের আদ্যন্ত আছে এই একটিই ধুয়া। ঘটনার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রামহরি ডোমের প্রসঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মানুষের বিকৃত, বীভৎস, স্থূল জীবনেরই কথা ব্যক্ত হয়েছে। রামহরি ও তার বউয়ের প্রসঙ্গ যেখানেই উঠছে, সেখানেই পাঠকের মনকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে অশালীন কোন ঘটনা বা বর্ণনার জন্য। অথচ নীচুতলার মানুষ মাত্রেই যে অমানুষ, এমন বিশ্বাস আজকের দিনে ক'জনের আছে? আবার, শ্মশানে প্রায়শঃই আগমন ঘটে কৈচরের যে বামুনদিদির, তিনিই বা সমাজের কোন স্তরের জীব? বলরামপুরের সিঙ্গীমশাই গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধিকার করে আছেন। তাঁর জীবনকাহিনী একান্ত নারকীয় কাহিনী। লেখক সাড়ম্বরে বর্ণনা করেছেন তাঁর সমগ্র পঙ্কলিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত। এছাড়াও আছেন তান্ত্রিক আগমবাগীশ, শক্তিসাধনার জন্য নিত্য নূতন শক্তির প্রয়োজন হয় যাঁর। কি উপায়ে যে তিনি এই সব শক্তি সংগ্রহ করেন তাও বর্ণনা করেছেন লেখক। শীলেদের ভাগনী সুবর্ণের জন্য গ্রন্থের অন্যতম চরিত্র খন্তা ঘোষের মৃত্যুকে প্রেমের আলোকে জ্যোতির্ময় বলে মনে করা যেত যদি তার অন্য আরেক প্রেমপাত্রী লক্ষ্মীর সন্ধান লেখক আগেই দিয়ে না রাখতেন। এ ছাড়াও, এক বিস্তৃত প্রেমোপাখ্যান স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে, যদিও সেই প্রেমে কোন মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় নেই। প্রেমের সাধনা-বেদনা বা নিষ্ঠা-ঐকান্তিকতাকে চিত্রিত করার চেষ্টা লেখক কখনও কখনও করলেও, নিতাই বৈষ্ণবীর প্রেম বড়ো বড়ো বাঁধা বুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে

মনে হবে। লেখকেরই এই দয়িতা-নারীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহ বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা স্থূল দেহানুরাগই প্রকট।[১] নিতাই বৈষ্ণবীর প্রেম ও আত্মনিবেদনে শরৎচন্দ্রের কমললতার অনুকরণ-প্রচেষ্টা আছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে নিতান্তই ব্যর্থ ও অক্ষম অনুকরণ। মোট কথা, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' যেন আগাগোড়া এক ঘুলিয়ে ওঠা দুঃস্বপ্ন, এখানে মানবজীবনের সত্য কোথাও স্থান পায়নি। বলা যেতে পারে যে দেহধারী মানুষের স্থূল প্রবৃত্তি যদি অসত্য না হয়, তবে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এ কি মানবচরিত্রেরই একটি বিশেষ সত্য রূপায়িত হয়নি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে সাহিত্য বস্তুজীবনের নিছক অনুকরণই তো নয়। নির্ভেজাল অনুকৃতিবাদ মহৎ শিল্পের জন্ম দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বাল্মীকি-কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে অধিকতর সত্য, 'ঘটে যা তা সব সত্য নয়'। বস্তুজীবনের ঘটনাবলীর থেকে কিছু বর্জন ও কিছু গ্রহণ করেই শিল্পের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিক্রিয়াতেই শিল্পীর মনোভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পেয়ে থাকে। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর কাহিনী-অংশ Facts-এর দিক দিয়ে সত্য হলেও, Truth-এর দিক দিয়ে সত্য নয়।

এ কথা ঠিক যে মানুষের আত্মার মতো দেহও সত্য, বরং দেহ ততোধিক বাস্তবসত্য। সাহিত্যে মানুষ তার আদিমতম জৈবিক প্রবৃত্তিকেও নিশ্চয় ভাষা ও রূপ দেবে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে কল্লোলযুগের লেখকেরা নরনারীর যৌনজীবনকে অকুণ্ঠভাবে সাহিত্যে রূপায়িত করবার কথা প্রথম ঘোষণা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল, 'তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।'[২] তাই, মানুষের জৈব আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিলেই যে সাহিত্যের জাত মারা যায় না, এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু শিল্পীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। জীবনকে দেখবেন তিনি তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে, মন্দের সঙ্গে ভালো, অপ্রেমের সঙ্গে প্রেম, দেহের সঙ্গে আত্মাকে মিলিয়ে। জীবনকে কল্পনা করা যেতে পারে একটি বিরাট, বিপুল, প্রবহমান নদীরূপে। এখানে আবর্ত আছে, শ্যাওলা-গুল্মের স্তর আছে, আরও আছে বহুবিধ আবর্জনা। কিন্তু নদীর সত্য পরিচয় তো সেই আবর্জনার মধ্যেই নিহিত নেই—তার জলে খেলে বেড়ায় রূপালী মাছেরা, তার বুকে ঢেউ তুলে যায় চঞ্চল বাতাস। সব মিলিয়ে নদী তার পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে—তার সেই সামগ্রিক রূপটিই বড়ো। পৃথিবীর সকল মহৎ সাহিত্যেই জীবন অবিমিশ্র সৌন্দর্যের স্বর্গোদ্যান নয়। প্রখ্যাত শিল্পী জেমস্ জয়েসের বহুখ্যাত উপন্যাস 'ইউলিসিস'কেও অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে আদালতে মামলা তোলা হয়েছিল, এবং সেই মামলার রায়ে এ কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল যে শিল্পীর অবাধ

১ কৌতূহলী পাঠক পঞ্চম মুদ্রণের চতুর্দশ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন।

২ বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক (সাহিত্যচর্চা)।

স্বাধীনতা আছে যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করার। কিন্তু সেখানে সেই সঙ্গেই সপ্রমাণ করা হয়েছে যে রুচিবিকার ও অশালীনতা মহৎ সাহিত্যের ধর্ম নয়। জেমস্ জয়েসের উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় আরো বড়ো কিছু। তাই সেখানে জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে সেই সকল তথাকথিত অশালীন উপাদান, একান্ত প্রধান হয়েই তা দেখা দেয়নি। অষ্টাদশী ফরাসী লেখিকা ফ্রাঁসোয়াজ সাগঁ-র বহুখ্যাত উপন্যাস 'স্বাগত, বিষাদ'-এর নামও এই প্রসঙ্গে করা চলতে পারে। এই উপন্যাসেও অনেক ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ আছে যার প্রতি রুচিশীল পাঠক হয়তো বিতৃষ্ণা দেখাতে পারতেন। কিন্তু সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুনিপুণ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখিকা এমন এক মনোরাজ্যে পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, যেখানে শালীনতা-অশালীনতা বিচারের কোন প্রশ্নই তোলা সম্ভব হয় না। সাহিত্যে বাস্তবতা-অবাস্তবতা, শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এ কথা তো মানতেই হবে যে শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবন যদি সামগ্রিকভাবে ধরা না দেয়, যদি একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকেই লেখক জীবনকে দেখে থাকেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হতে বাধ্য, তাহলেই তাঁর সৃষ্টি অসার্থক। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এ জীবনের এই সামগ্রিক চেতনা নেই। এখানে আগাগোড়াই বীভৎসতা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই ইনফার্ণো, কোন প্যারাডিসোর নির্মল আলো ঠিকরে ওঠে না। এই নরকে চিত্তশুদ্ধি নেই।

বোদলেয়ার, টমাস মান, ডস্টয়েভ্স্কি প্রভৃতি বিখ্যাত 'morbid' লেখকদের মধ্যে জীবনের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস, যে অকৃত্রিম সৌন্দর্যবোধ, মানবসমাজের প্রতি যে অবিচলিত সহানুভূতি, অন্তিম grace লাভের যে দৃঢ় আশা আছে, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এ তা কোথায়? সব স্থূলতা, নীচতা ও বিকারের মধ্য থেকে মহত্তর জীবনে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা নেই যে রচনায়, জীবনের বিরাট পরিণামের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ নেই যে বইয়ে, তা সাহিত্যের আসরে শুধু আবর্জনাই সৃষ্টি করে থাকে। একটি দেশ ও একটি জাতির জীবনের সব ভালোকে বাদ দিয়ে শুধু তার গ্লানি ও পঙ্ককে দেখে এবং দেখিয়ে যে কারণে মিস্ মেয়ো 'নর্দমা পরিদর্শক' আখ্যা পেয়েছিলেন, সে-সব কারণই শ্রীঅবধূতের মধ্যেও বর্তমান। বেঁচে থাকার কোনই সার্থকতা নেই এই বোধ যে বই জাগায়, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই বস্তুধর্মী বলে মনে হোক না কেন, তা সাহিত্যপদবাচ্য নয়।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' লিখতে বসে লেখক এমন এক রচনাভঙ্গিকে আশ্রয় করেছেন, যা তাঁর এই স্বকীয়, বিশেষ ভাবনারই অনুকূল। আগাগোড়া তরল, লঘু ভঙ্গিতে লেখক বর্ণনা করে গেছেন সব কাহিনী। এ তারল্য বা লঘুতা স্নিগ্ধ কৌতুকের নামান্তর নয়, এ যেন পরিহাসের ভাব আনার চেষ্টা এমন বিষয়ের উপর যাতে পরিহাসের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। কাহিনী-বিন্যাসে দৃঢ় বাঁধুনি নেই। বিষয়ের আকর্ষণ ছাড়া, বিষয়-বিন্যাসের কৌশলে পাঠকের মনকে ঘটনার শেষ পর্যন্ত লেখক টেনে নিয়ে যেতে পারেন না।

জীবিত এবং সৃষ্টিশীল কোন লেখকের বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহস। এবং এ কথাও স্বীকার্য, তাতে অনেক সময়ে যথার্থ সমালোচনা করাও সম্ভব হয় না। কালের নিরিখই হয়তো সাহিত্যবিচারের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবুও, ধৃষ্টতা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে এইটুকুই বলা যায় যে এক বছরের মধ্যে যে বইয়ের পাঁচটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, সে বই সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না থাকা এবং ভালোমন্দ কোন একটা মতামত পোষণ করা অসমীচীন নয়। সাহিত্যবিচারে জনপ্রিয়তাকেই একমাত্র মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যের ঐশ্বর্য নিয়ে গৌরব করার কারণ থাকা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিককালের সাহিত্যের কোন কোন ধারাকে নিয়ে আত্মতুষ্টি বোধ করাও উচিত নয়। জীবিত লেখকদের মধ্যে বহু প্রতিভাবান ও শক্তিশালী লেখক আজও আমাদের সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করে চলেছেন। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি-রাজ্যে যে একটা লঘুতার হাওয়াও বইতে শুরু করেছে, তাকেও অস্বীকার করা উচিত হবে না। বাইরের চটকেও আজ বিকিয়ে যাচ্ছে অনেক অন্তঃসারশূন্য জিনিস। নামোল্লেখ করে অপরাধের বোঝা আর ভারী না করাই সঙ্গত। শুধু এইটুকুই বলা যায় যে বাজারে বহু খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে যে-সকল উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ, তাদের অনেকেরই মধ্যে অবাস্তব জীবনদর্শন, বিকৃত রুচিবোধ ও অশালীন মনোভাব নিতান্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বাস্তবতাবোধ আর perversity যে সম্পূর্ণই ভিন্নগোত্রীয়, এ বোধ হারালে চলবে কি করে?

আমি পলাতক

প্রণবকুমার বর্ধন—পঞ্চম বর্ষ, কলা

না সুমিতা, আতঙ্কিত হ'য়ো না। এ আমাকে লেখা আমারই চিঠি।

স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি, তুমি এখন নীল আলোর ছায়ায় ধোয়ানো একটি ঘরে সোফার নরম গভীরে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে একমনে উলবোনার নামে একটা গার্হস্থ্য পরিতৃপ্তির সূক্ষ্ম রেশমতন্তুর ঊর্ণাজালকেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুনছ। দরজা-বন্ধ কোণের ঘর থেকে মিণ্টুর পড়ার একটানা অথচ চাপা শব্দ আর পাশের ফ্ল্যাটের রেডিও থেকে একটা পল্লীগীতির অস্পষ্ট সুর তোমার কানের কাছে এসে গুনগুন করছে। তুমি শুনছ না, কিন্তু তন্দ্রালস দুপুরে ঘরে হঠাৎ উড়ে-আসা একটা ঘূর্ণমান ভোমরার শব্দের মতই সুরটা তোমার কানে ক্রমাগতই বাজছে। বাজছে আর বাজছে। সুতোর উপর আলতো টানে তোমার কোলে উলের বলটা কেবলই অস্থির হয়ে নড়ছে। তুমি সুখী হয়েছ, সুমিতা।

একমনে তুমি বুনে যাও। আমি দেখি। আমার কল্পনার চোখে আমি দেখি। দাঁত দিয়ে নরম ক'রে কামড়ে-ধরা তোমার নীচের ঠোঁটের ডানপাশে একটা ছোট্ট তিল কেমন একটু নেচে আবার স্থির হয়ে থাকে আমি তাই দেখি।

আমাকে ভুল বুঝো না সুমিতা। একটা অশান্তির ঝড় তুলে তোমার এই সুখের বয়নকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া আমার চিঠির উদ্দেশ্য নয়। আমি তা চাই না।

এবারে হয়ত তুমি মনে মনে হাসছ। তোমার একটু ফাঁক করা দুই ঠোঁটের মাঝখানে হয়ত একটা করুণার হাসি কেঁপে কেঁপে উঠছে। জীবনে যারা ব্যর্থ হ'লো তাদের জন্য অন্তর থেকে সংগ্রহ-করা একটা সৌখীন কৃপার শিশিরে তোমার ঠোঁট আর ভিজিও না সুমিতা। তুমি আমার উপর রাগ ক'রো, তুমি আমাকে ঘৃণা ক'রো, কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমাকে করুণা ক'রো না।

তুমি তো জানতে ছোটবেলা থেকেই যে জিনিসটা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি নি তা হচ্ছে কারও করুণার পাত্র হওয়া। তুমি এও জানতে যে আমার বন্ধুরা আমাকে বলত অহঙ্কারী, ইগোটিস্ট। কিন্তু তুমি জানতে না আমার ভিতর ঐ ইগো কত প্রবল। একটা চলতি বাস যখন স্টপেজে এসে আবার যাত্রা সুরু করবার আগে কতক্ষণ অপেক্ষা করে, তখন সীটে ব'সে নিজের কথা যদি কল্পনা করতে পার সুমিতা, তবে দেখবে ঐ সময় কেমন একটা চাপা উত্তেজনার মর্মর গাড়ীর ইঞ্জিন থেকে সংক্রামিত হ'য়ে তোমার পা থেকে সুরু ক'রে সমস্ত শরীরে হিল্লোলিত হয়ে যায় আর সমস্ত শরীরটা যেন এক নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে থাকে। ঠিক তেমনিভাবে আমার ভিতর একটা প্রচণ্ড ইগো ক্রমাগতই ফুঁসছে, বাইরের কঠিন পাথরে প্রতিহত হ'য়ে একটা ফেনিল উদ্দামতায় বারবার ভেঙে পড়ছে। আমার জীবন এই বিক্ষুব্ধ অহমিকার জীবন। তোমাকে আমি আমার গল্প শোনাব, সুমিতা।

আমি জানি তুমি বিরক্ত হচ্ছ। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তুমি একবার দেখলে তোমার স্বামী ফিরে আসতে আর কত দেরী আছে। দেখলে, ঘড়ির পেণ্ডুলামটা সকৌতুকে মাথা দোলাতে দোলাতে তোমাকে জানাল যে সময় এখনও হয় নি। তুমি একটু বিরক্ত হ'য়ে আবার উলের কাঁটায় চোখ ফেরালে—বিরক্ত হ'লে তোমাকে যে কি অপূর্ব দেখায় কি বলব, কপালে দু'টো নরম ভাঁজ পড়ে, স্বল্পরোম ভুরুটা একটু উঁচু হয়, নাকের ডগাটা কিরকম ফুলো-ফুলো আর লালচে হয়ে যায়, ঠোঁটদুটোর বঙ্কিম মসৃণতায় তোমাকে তখন রানী-রানী মনে হয়। না, তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও সুমিতা। জীবনের সুতোকে নিপুণ কাঁটার মুখে দুটো সোজা আর একটা উল্টোর জটিল পথে চালিয়ে নতুন এক সুখের কারুকার্যকে ফুটিয়ে তোল তুমি, আর সেই সুখের আবেশে তোমার কোলে উলের বলটা মৃদু নাচুক, আমি তোমায় বাধা দেব না।

আমি কিন্তু আমার কথা বলব। নিজেকেই শোনাব।

তোমার কখনও হয়েছে কিনা জানি না, আমার মাঝে মাঝে কিরকম কান্না পেত, যার কোন বাহ্য কারণ খুঁজে পেতুম না। আমি যখন কোন কিছু গভীরভাবে ভাবতুম, ভাবনার গুমোটে আমার ভিতরটা যখন থমথম করত, তখন কেন জানি হঠাৎ মনে হ'ত কান্নার কথা। তারপর বুকের একটু নীচে থেকে সুরু ক'রে গলা, চিবুক আর নাক-চোখের পেশীতে কেমন একটা রুদ্ধশ্বাস বেদনার উষ্ণ স্রোত ঠেলে ঠেলে উঠত। আমি কাঁদতাম। তারপর যখন কানের কাছে বালিশের একটা ধার ভিজে ভিজে হয়ে উঠত, চোখের নীচে একটা শুকনো দাগ রেখে শেষ ফোঁটাটা যখন গালের ঢালু বেয়ে কানের পাতলা প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াত, তখন মনে হ'ত আমার কান্নার তো কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটুকু বুঝতুম যে কাঁদতে আমার ভাল লাগে। (মনোবিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল বন্ধুরা আমাকে বলত ম্যাসোকিস্ট।) কেঁদে আমি যে আরাম পাই, আমার নিজের গল্প বলায়ও তাই। সেই আরামটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না সুমিতা।

যাঁরা জাত গল্প-বলিয়ে তাঁরা গল্পটা আরম্ভ করেন শেষ দিক থেকে, তারপর পিছন ফিরে তাকান, স্মৃতির আলোকে ফেলে-আসা চৌকাঠগুলির উপর দিয়ে পাঠককে নিয়ে যান অনেক অনেক পিছনে যেখানে গল্পের ব্রাহ্মমুহূর্ত আর ঊষার অরুণাভাস। এবং সবশেষে থিসিউস যেমন এরিয়াড্‌নির দেওয়া সুতোর হাত ধ'রে ধ'রে জটিল পথের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন, তেমনি ক'রে পাঠকও অনেক প্রাসঙ্গিক জটিলতা ডিঙিয়ে উপসংহারের মুক্ত-আকাশ মোহানায় এসে নিজেকে ফিরে পান। সমালোচক কলম বাগিয়ে লেখেন, গল্পের আঙ্গিকে এক অনবদ্য রচনাশৈলীর চরম পরাকাষ্ঠা। আমি তো অতশত কায়দাকানুন জানি না। আমার গল্প আমি গোড়া থেকেই সুরু করি। আর তা ছাড়া গল্পটা যখন আমার নিজেকেই শোনাচ্ছি তখন আঙ্গিকের অত ঠাট-ঠমকের কি দরকার। বাড়ীতে যখন থাক, তখন তোমরা মেয়েরাও তো আটপৌরে কাপড়ই পর, তাই না?

ছোটবেলার কথা আমার ভাসা-ভাসা মনে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ···বোমা··· সাইরেন···আর কেমন একটা চাপা ভয়ের গুমোট। কলকাতা তখন নিঝুম। তারপর আমার শৈশব কাটে ছোটনাগপুরের একটি ছোট্ট শহরে। পাথুরে জায়গা, প্রকৃতির এক ঊষর মূর্তি সেখানে। আশেপাশে কয়েকটি ঘর ছাড়া বাঙালী খুব কম। সঙ্গীসাথী বিশেষ জোটে নি। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকেই আমার কেমন একা থাকতেই ভাল লাগত। এক একদিন বিকালে রেললাইন ধ'রে অনেকদূর পর্যন্ত একলা হেঁটে গেছি। এখনও মনে আছে, রেললাইনটা যেখানে ক্যানালের ব্রীজের উপর দিয়ে গিয়েছে, সেইখানটায় নীচের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে উঠত। দেখতাম জলটা অনেক উঁচু থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ছে আর একটা ভীষণ শব্দের

স্রোত দুপাশের কাশবন আর কাঁকরভর্তি উঁচু পাড় দিয়ে যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। এই শব্দটাই দূর থেকে শুনলে কেমন একটা চাপা মেঘগর্জনের মত শোনাত। কাছে এলে শব্দটাকে বড় বেশী উৎকট মনে হত। কিন্তু তবুও সেই নির্জন বিকালে ধূসর এক আকাশের নীচে শব্দের এই বিরাট প্রস্রবণে একটি অসহায় শিশু নিজেকে হারিয়ে ফেলত। মনে হ'ত যেন কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, যেন ঘরবাড়ী-মা-বাবা-ভাইবোন-স্লেট-পেন্সিল-খাতা-বিছানা সব ছাড়িয়ে আমি কোন্ এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছি, যে লক্ষ্যের জগতে কেউ নেই, শুধু আছি আমি আর একটা বিরাট প্রকৃতি। সেটা এত বিরাট যে আমার শিশুমনে তার কূলকিনারা পেতাম না।

শৈশবের সঙ্গী বলতে আমার কাজলকেই মনে পড়ে। আমাদের পাশের বাড়ী থাকত। বাপমার একমাত্র মেয়ে। আমার চেয়ে বোধ হয় বয়সে বছর দুয়েকের বড় ছিল। রোজ ভোরবেলা ও আমাদের বাগানে ফুল তুলতে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগাত। ঘুম-ঘুম চোখে আমরা বাগানে ফুল তুলতে যেতাম। জবাগাছের উঁচু ডালের ফুলগুলি পাড়বার ভার ছিল আমার উপর। শিউলিগাছে আমি ঝাঁকুনি দিতাম, কাজল নীচু হ'য়ে ফুল তুলত। শিউলি ফুলের গন্ধে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে। তেমনি আর এক মাদকতা ভোরের শিশিরে ভিজে কাজলের কালো কালো টানা চোখে যেন দীঘির জলের মত টলটল করত। কাজলের চোখদু'টো আমার আজও মনে আছে।

আর মনে আছে কাজলের মৃত্যুর কথা। জলে ডুবে মারা গিয়েছিল কাজল। সেদিন বিকালে আমাকে খবরটা কেউ দেয় নি। পাড়ায় হৈ চৈ, ছুটোছুটি, ব্যস্ততা আর থেকে থেকে কেমন একটা চাপা নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে আমি বাড়ীতে ব'সে নিজেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি, কিন্তু উত্তর মেলে নি। কাজলদের বাড়ীর সামনে ভীষণ ভিড়, কিন্তু অদ্ভুত নিস্তব্ধ। মা এসে আমাকে বাড়ী থেকে বাইরে যেতে বারণ করলেন, কিন্তু কেউ আমাকে বলল না, কাজলের ঠিক কি হয়েছে। তারপর কাজলদের বাড়ীর দিক থেকে যখন কান্নার রোল উঠল, আমার জানালার পাশ দিয়ে যখন পাড়ার লোকেরা চাপা স্বরে কথা বলতে বলতে চলে গেল, আমি তখন আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম কি বিশ্রী কালো সীসের মত এই আকাশ! বোবা অন্ধকারের গুমোটে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

লুকিয়ে আমি কাজলকে দেখতে গিয়েছিলাম। ওকে নুন চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার ফাঁকে আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম ওর সমস্ত শরীরটা কেমন নীল হয়ে গেছে। রাত্রির অন্ধকারে ওদের একতলা বাড়ীটা তখন শোকক্লান্তিতে থমথম করছিল আর তারই মাঝখানে আমার জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর উপলব্ধি এল—মৃত্যু, যার রং নীল। কিন্তু একটা জিনিস ভেবে আজও অবাক হই যে সেদিন

কাজলের মৃত্যুতে আমার কাজলের জন্য কষ্ট হচ্ছিল না, কাজলকে যে চিরতরে হারালুম এই স্থূল অভাববোধটুকু আমার মনে কঠিন হয়ে বাজে নি—বরং মৃত্যুর একটা স্থনীল বিরাট রূপ দেখে আমি স্তব্ধ হয়েছিলাম, যে মৃত্যু আমার মনে কান্নার স্পর্শকাতর তারগুলিতে নরম ক'রে হাত বোলাচ্ছিল তাকে দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সেই রাত্রিতে আমার ঘুম আসে নি, অন্ধকারে চোখ বুঁজে আমার ভাবনার খাতায় অনেক আঁকিবুঁকির মধ্যে যে কথাটা নীল হরফে জ্বলজ্বল করছিল তা থেকে আমি শিখলাম যে জীবনে মৃত্যুটাই চরম সত্য।

সেইদিন থেকে আমার চিন্তার জগতে মৃত্যু এসে প্রবেশ করল। আর এর নরম নীলচে আলোয় আমার ছোটখাট অসংখ্য চিন্তাকণিকাগুলিতে কেমন একটা পাতলা বিষাদের আভা এসে পড়ল। মনে আছে, ক্যানাল ছাড়িয়ে রেললাইন ধ'রে আরও দূর এগিয়ে গেলে দেখতাম দুপাশে দিগন্তবিস্তৃত খোয়াই, দু-একটা তালগাছ, খেজুরগাছ, কাঁটাবন আর ধূধূ বিস্তার। সুমিতা, তোমাকে আমি লিখে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি অনুভব করেছি নিস্তব্ধতারও কেমন একটা নিজস্ব শব্দ আছে। হাওয়ায় হাওয়ায় সেই শব্দ এসে আমার মনের গহনে ভাবনার দরজায় এসে আঘাত করত আর আমি সেই ভাবনাকে তখন এক অপার মুক্তির মধ্যে ছেড়ে দিতাম। দেখতাম, ভাবনাটা আস্তে আস্তে চারদিকের বিরাট নিস্তব্ধতার সঙ্গে কেমন মিশে গিয়ে নিজেও বিরাট হয়ে উঠত। নীল আকাশের বিস্তৃতির মধ্যে আমি নিজেকে ছড়িয়ে দিতাম। আমি নীল আকাশ হয়ে যেতাম। তারপর, তারপর আমি নীল মৃত্যু হতাম। মৃত্যু এসে আমার আকাশ-সমান ভাবনায় কান্নার শিশির বুলিয়ে দিত, একটা বেদনার বুদ্বুদ উঠে আমার গলায় আটকে আসত, আর তারপর আমি কাঁদতাম।

এর পর আমি কলকাতায় ফিরে আসি। এখানে এসে দেখলাম একটা অসুস্থ শহর কেমন ক'রে ইঁট-কাঠ-পাথরের খাঁচায় সভ্যতার বোঝা বয়ে ধুঁকছে। শীতের সন্ধ্যায় কলকাতাকে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, সুমিতা। তুমি কি লক্ষ্য কর নি কেমন একটা ধোঁয়ার পুরু আবরণ এই শহরের জীর্ণ আত্মাকে গলা চেপে ধরে আর খাঁচায় বদ্ধ মানুষগুলি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ধূসর আর বিবর্ণ হয়ে যায়। সঙ্কীর্ণ গলির একতলা বাড়ীর স্বল্পপরিসর উঠানে সধূম উনুনের সামনে বসে আইবুড়ো মেয়ে সজল চোখে পাখায় হাওয়া করে, কালো কালো বিষাক্ত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে ওঠে, নির্বাতায়ন রান্নাঘরের তেলচিটে দেয়ালে কালো হরফে কলকাতার ইতিহাস লেখে।

কলকাতাকে আমি কোনদিন ভালবাসতে পারি নি। সভ্যতার এক অসুস্থ বিকার-গ্রস্ত রূপকেই দিনে দিনে প্রত্যক্ষ করেছি আমি। এখানে সকাল হয়। পাড়ার রোয়াকে ব'সে মাফলার-জড়ানো বৃদ্ধ শব্দ ক'রে থুথু ফেলে। চায়ের দোকানে বিস্বাদ কড়া চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কেউ একটা অশ্লীল রসিকতা করে আর ময়লা দাঁত বার

তাই থেকে আমি কেমন একটা উদ্ভট আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম। আমার যেন মনে হত অনেক অনেক উঁচুতে পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে দেখলে হয়ত জীবনকে ঠিক পার্সপেক্টিভে দেখা যায়। কলকাতায় পূজোর সময় আমি আমাদের তিনতলা বাড়ীর ছাদ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখেছি। দেখেছি কী বিপুল কোলাহলে মত্ত এই জনতা, কোন্ এক অন্ধ উত্তেজনার বশে পিলপিল ক'রে পালে পালে ছুটে চলেছে, সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতের অনেক উঁচু থেকে আমি দেখেছি পৃথিবীর এক অর্থহীন কর্মব্যস্ততাকে। সুমিতা, আমি ওদের করুণা করতাম। একটা নিষ্ফল শূন্যতার আবর্তে ঘূর্ণমান পৃথিবীকে আমি করুণা করতাম।

তোমার সঙ্গে কবে কিভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল, তুমি জান। প্রথম দর্শনেই প্রেম ব'লে যে একটি কথা সাহিত্যে বহুদিন ধ'রে প্রচলিত হয়ে আসছে, আমি ওটাতে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি। প্রথম দেখায়ই কেউ কাউকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারে না, আমার মত অল্পদর্শী লোক ত নয়ই। এক ঝলকের দেখায় যেটা মিলতে পারে সেটা নিতান্তই অতিভঙ্গুর একটা দুর্বল মোহ, পথের বন্ধনহীন গ্রন্থি নয়। তবুও আজ স্বীকার করতে দোষ নেই, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগত। এই ভাল লাগাটুকুকে কম্পিত চিত্তে যখনই আমি বিচার ক'রে দেখতে চেষ্টা করেছি, নভেলে-পড়া সিনেমায়-দেখা অতি সস্তা প্রেমের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি তখনই এক অনিশ্চয়ের কুয়াসা এসে আমার মনপ্রাণ ছেয়ে ফেলত। আমি দিশাহারা হয়ে যেতাম।

তুমি যখন কথা বলতে, আমি তোমার চোখে চোখ রাখতাম। দেখতাম দুটো কালো পাথরের গোলক আমার কাছে কেমন একটা শীতল আশ্রয়ের সন্ধান নিয়ে আসত। দিনের শেষে ক্লান্ত শিশু যেমন ক'রে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আমার ক্লান্ত পথিক মন তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টির সুখশয্যায় তেমনি বিশ্রাম করতে চাইত। আমি সবই বুঝতুম, অথচ পূর্বরাগ থেকে অন্তরাগ পর্যন্ত প্রেমের যেসব প্রথাসিদ্ধ পর্যায় তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে গেলেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যেত।

এর কিছুদিন পরে একদিন বিকালে তোমাকে দেখলাম। তুমি আমাকে দেখতে পাও নি। পার্কের একটা বেঞ্চির হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে তুমি একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলে, আমি পিছন দিয়ে তোমায় পাশ কাটিয়ে গেলাম। আমি ছেলেটিকে চিনতাম এবং এও জানতাম যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার কোন ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও যখন দেখলাম তুমি ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলছ—যে অধিকারটুকুকে আমি একান্তই আমার ব'লে মনে করতাম—তখন আমার কেমন যেন হ'য়ে গেল। আজ ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু মনে আছে, সেদিন হঠাৎ যেন আমার মনের একটা নির্বোধ অথচ স্পর্শকাতর তার অতি নির্দয়ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল, আমার কানের

দু'পাশটা কেমন গরম হয়ে উঠেছিল, তোমার শীতল চোখের স্মৃতি আমাকে উত্তেজিত ক'রে তুলল, স্থমিতা, ঈর্ষ্যাকাতরতায় আমি পশুর চেয়ে নীচ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঈর্ষ্যার দংশনে আমার সেই প্রথম উপলব্ধি হ'ল যে প্রেম আর ঈর্ষ্যা একই পৃথিবীর দিন ও রাত্রি, ঈর্ষ্যাহীন প্রেম অসম্ভব। স্থমিতা, সেদিন সেই প্রথম স্পষ্ট ক'রে বুঝলাম আমি তোমাকে ভালবাসি।

সাহিত্যে পড়েছি, দার্শনিকের লেখায় দেখেছি, প্রেম যে কি বস্তু তাঁরা নাকি আজও বুঝে উঠতে পারেন নি। আমার অভিজ্ঞতার পরিধি সীমায়িত, আমার মনের দৃষ্টি স্বল্পগামী, তাই ওঁদের মতের উপর মন্তব্য করা আমার সাজে না। কিন্তু আমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রেম কী আমি তা জানতুম। আমি বিচার ক'রে দেখেছি আমার প্রেম আমার সহজাত ইগোইজম, ম্যাসোকিজম আর কামনাপ্রবৃত্তির মিশ্র উৎসার। আমার ইগো আমাকে সমাজ থেকে পলায়নের কোন্ পথে নিয়ে গিয়েছিল তা আমি বলেছি। বস্তুতঃ, গভীর প্রেমের মধ্যেই আমি আমার সেই পলায়নের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। তোমাকে যে আমি ভালবাসতাম, তার একটা বড় কারণ পৃথিবীকে আমি ভালবাসতে পারি নি। (কথাটা হয়ত খুব নাটকীয় শোনাচ্ছে, কিন্তু আমার মনকে আমি আর অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারলাম না)। মনে আছে প্রথম চাকরীর সন্ধানে যেবার দিল্লী যাই, এক নিভৃত দুপুরে আমি হুমায়ুনের সমাধি দেখতে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ নিরাড়ম্বর পরিবেশ, চারদিক জনমানবশূন্য (ফটকের কাছে ইতিহাসের ফসিল অন্ধ ভিখিরিটা ছাড়া)। একটার পর একটা চত্বর পেরিয়ে আমি সমাধিভবনের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যখন চূড়ায় পৌঁছলাম, দেখলাম সবার উপরে একটা বাঁধানো পাথরের বেদীর উপর নিবিড় হয়ে বসে আছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বাতাসের ঝাপটায় ছেলেটির চুল কপালের উপর নাচছিল, মেয়েটির পাতলা ওড়নাটা বারবার বুকের উপর থেকে খসে পড়ছিল। কোনদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই, চারদিকের নিস্তব্ধ আকাশের সঙ্গে ওরা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ওখান থেকে দিল্লী শহরটাকে কত ছোট মনে হয়, নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক জটিলতাকে কত তুচ্ছ মনে হয়, আর সবার ঊর্ধ্বে ঐ দিগ্বিজয়ী প্রেমের ছবিটি দেখে আমি সেই নির্জন দুপুরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সমাজজীবনের কোলাহল থেকে অনেক দূরে ছায়াস্থনিবিড় বলিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে আমি আমার ইগোচরিতার্থতার সবচেয়ে বড় অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলাম।

আমার ম্যাসোকিস্ট বা দুঃখবিলাসী মনের কথা আগেই বলেছি। ছোটবেলা থেকেই একটা বিবর্ণ বিষণ্ণতা আমার নিত্যসহচর হয়ে থাকত। এর পর কাজলের মৃত্যু আমার মনে একটা নীল কান্নার অস্পষ্ট জলতরঙ্গ বাজাতে শুরু করেছিল। সবশেষে প্রেম আমার ভিতর একটা পাতলা বিষাদের গম্ভীর সুরসংযোজন করল। আমার ভালবাসার কথা আমি গভীরভাবে ভাববার চেষ্টা করতাম, এক সংজ্ঞাহীন বেদনার বাষ্পে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসত। আমি কাঁদতাম।

আর কামনা? আমার প্রেমে প্ল্যাটোনিক নিকষিত-হেমের পরিমাণ কতটুকু ছিল তা যদি জানতে চাও তবে বলি, তোমার নারীদেহটা সম্বন্ধে আমি যে উদাসীন ছিলুম না তা তুমি জান।

তবু আমার প্রেমে কামনাটা কোনদিনই খুব একটা বড় হয়ে উঠতে পারে নি। কামনার ইন্ধন আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অপ্রচুর নয়। টেবিলের সামনে অর্ধনগ্ন ফিল্মস্টারের ছবি টানিয়ে রেখে পড়তে বসা ক্লাস নাইনের ছেলে থেকে শুরু ক'রে বেপাড়ার নিয়মিত গ্রাহক পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন উপায়ে নিজের কামনা লালসা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছে। প্রেমকে আমি অনেক উঁচুতে স্থান দিই। (আমার হালফ্যাসানের বন্ধুরা আমার এই মনোভাবকে ভিক্টোরিয়ান প্রুডারি ব'লে উড়িয়ে দিতেন)! আমি দেখেছি, আমি যখন তোমার কথা ভাবতুম তখন একটা জিনিস প্রায়ই আশ্চর্য লাগত যে অনেক চেষ্টা ক'রেও তোমার চেহারাটাকে কিছুতেই মনে ধরে রাখতে পারতুম না। সব কেমন অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যেত, তোমার মুখটা, এমনকি তোমার চোখদুটো পর্যন্ত কেমন হাল্কা কুয়াসা হয়ে যেত, শুধু থাকত একটি নির্মল অনুভূতি: আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি। এই অনুভূতির নরম পাপড়িতে আমি অতি সন্তর্পণে হাত দিতাম, অনুভূতিটা সেই রূপকথার গল্পের পদ্মফুলের মত কেমন সরে সরে যেত, আমার প্রেমকে নিয়ে আমি নিজের মধ্যেই লুকোচুরি খেলতাম, একটা ছুঁই-ছুঁই রোমাঞ্চ আর অনুভূতির স্নিগ্ধ সৌরভে আমি আনন্দ পেতাম। আমি কাঁদতাম।

তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতাম। তুমি আমার চোখে চোখ রাখতে। আমার ভিতর অনুভূতির সেই পদ্মফুলটা ডুবত আর ভাসত। কী এক অনির্বচনীয় কৌতুকে ও নিজেকে নিয়ে খেলত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল আমি তোমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। শুনতে হয়ত অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু তোমার সান্নিধ্যের চেয়ে তোমার স্মৃতির রোমন্থন আমাকে বেশী আরাম দিত। আমার প্রেমের ঐশ্বর্যটুকু নিয়ে আমি ক্রমশঃই নিজের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করছিলাম, আমার যত স্নিগ্ধ ভাবনা আর চিন্তাকল্পনা দিয়ে আমি নিজের মধ্যেই একটা ছায়াসুনিবিড় আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিলাম যেখান থেকে বেরিয়ে এসে তোমার সান্নিধ্যের বাস্তবতাটাকে বড় স্থূল আর অস্বস্তিকর মনে হত। পারিপার্শ্বিকের কঠিন রূঢ় আবহাওয়ায় তোমাকে ভীষণ পার্থিব ব'লে মনে হ'ত, আমার স্বরচিত কল্পলোকের অপার্থিব অনুভূতিটা হারিয়ে যেত। তাই তোমাকে আমি এড়িয়ে চলতাম। সুমিতা, আমি তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসতাম, আর সেইজন্যই তোমাকে আমার জীবনসঙ্গী করার কথা ভাবতে পারি নি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। তোমার বিয়ের পর বহুদিন তোমার দেখা পাই নি। দেখা পাবার চেষ্টাও করি নি। আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির আবর্তে পৃথিবী অনেক পাক খেয়েছে, দিন এসেছে, রাত্রি গেছে, শতাব্দী আরও অসুস্থ হয়েছে, মানুষ

আরও ক্লান্ত হয়েছে, আমার মনসিজ পদ্মফুলটা আস্তে আস্তে ডুবে গেছে, আমার মনে কান্নার উৎসটাও শুকিয়ে এসেছে।

কাল সন্ধ্যায় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল।

তোমার কপালে সিঁদূরের টিপ, কোলে তোমার ছোট ছেলে। তুমিই আমাকে প্রথম দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালে। আমি তাকালুম। সুমিতা, তুমি আমার চোখে চোখ রাখলে।

হেসে হেসে অনেক কথা বলেছিলাম। তুমিও পুরোনো স্মৃতির রোমন্থনে কেমন উচ্ছল হয়ে উঠেছিলে। আমি আগে সিগারেট খেতাম না, কিন্তু এখন একটু বেশী খাচ্ছি এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তুমি শিশুর মত খিলখিল ক'রে হেসে উঠলে। আমার খুব ভাল লাগছিল।

বিদায় নেবার সময় তুমি আমাকে তোমাদের বাড়ী যাবার নিমন্ত্রণ করলে। বললে: 'বৌকে নিয়ে এস কিন্তু।'

'বৌ? বৌ কোথায় পাব?' আমি অবাক।

তুমি গম্ভীর হ'য়ে গেলে, তোমার চোখের সেই শীতল দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে তুমি বললে: 'তুমি বিয়ে কর নি?'

'না।' আমি হাসবার চেষ্টা করলাম।

তোমার মুখ থেকে প্রশ্নটা পিছলে এল: 'কেন?'

সুমিতা, এই 'কেন'র উত্তরে আমি শুধু হেসেছিলাম, কারণ আমার কান্না ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি তোমার ছেলেকে আদর করবার ভান ক'রে নিজেকে ঢাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু তোমার চোখের দর্পণে আমার প্রতিচ্ছায়া দেখে বুঝলুম যে আমার মুখে দেহের সমস্ত রক্ত ছুটে এসেছে। আমি পালিয়ে এসেছি।

সুমিতা, আমি জানি তুমি বিরক্ত হচ্ছ। সোফা ছেড়ে উঠে তুমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালে। তোমার স্বামী এখনও ফেরে নি। বাইরে চাপ চাপ অন্ধকার জমাট হয়ে আছে, তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলে। এখানেও অন্ধকার। আমার চারপাশে নিতল বোবা অন্ধকার।

না সুমিতা, তুমি তোমার কাজ ক'রে যাও। জীবনের সুতোকে দু'টো সোজা আর একটা উল্টোর জটিল পথে চালিয়ে নতুন এক সুখের কারুকার্যকে ফুটিয়ে তোল তুমি, আর সেই সুখের আবেশে তোমার কোলে উলের বলটা মৃদু নাচুক, আমি তোমাকে আর কোন-দিন বাধা দেব না।

হ্যাঁ সুমিতা, আমি আত্মহত্যা করলুম।

অভিলাষ

জেম্‌স্ ষ্টিফেন্স্

অনুবাদ : এষা মুখোপাধ্যায়—পঞ্চম বর্ষ, কলা

সে তখন উত্তেজিত। চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর কাছে এই কাহিনীটি বলতে বলতে এমন বিশ্বাসপ্রবণতা প্রকাশ করছিল যা তার স্ত্রীর মতে তার পক্ষে কোনদিন সম্ভব নয়।

সে ছিল ঠাণ্ডা মাথার লোক, নিজের ব্যাপার-স্যাপার বৈষয়িক নিয়মেই চালাতে অভ্যস্ত। পূর্বরাগের ব্যাপার, বিবাহসংক্রান্ত এবং গার্হস্থ্য বিষয়গুলি সে এমন ভাবে চালিয়ে এসেছে যাতে তার স্ত্রী তাকে কোনমতেই বেপরোয়া বা রোম্যান্টিক বলে অভিহিত করতে পারে নি। সুতরাং যখন তার স্ত্রী তাকে উত্তেজিত দেখলে, এবং তা এমন একটি গল্প সম্পর্কে, সে ভদ্রমহিলা ভেবেই পেলে না বিষয়টিকে কিভাবে গ্রহণ করতে হবে।

একমত হয়ে স্ত্রী আপস করল; তার বিচারবোধ তৃপ্ত হয়েছিল, এমন কি তাতে বিন্দুমাত্র রেখাপাতও ঘটেছিল, সেজন্য নয়; কিন্তু তার স্বামী তখন উত্তেজিত এবং যে কোন নারীই তার একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনতে পারে এমন কোন কিছুকেই সাদর অভ্যর্থনা জানায়, এবং সুযোগ পেলেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

তার স্বামী তাকে এই বলেছিল।

সে যখন দুপুরবেলা খেতে চলেছে এমন সময় একটা মোটরগাড়ী এমন জোরে রাস্তা দিয়ে ছুটে এল যা এইরকম সরু আর ঘিঞ্জি লোকচলাচলের রাস্তার পক্ষে বড় বেশি বিপজ্জনক। একটি লোক তার সামনে দিয়ে হাঁটছিল; যেই গাড়ীটা পিছনে এসেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সে রাস্তাটা পার হতে উদ্যত হ'ল, একবার পিছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না। গাড়ীটা উচ্চ কর্কশস্বরে ঘস্‌ঘস্ করে এসে পড়ার ঠিক এক মুহূর্ত আগে তার স্বামী হাত বাড়িয়ে লোকটিকে ফুটপাতে ঠেলে দিলে। "যদি আমি না থাকতাম তো আপনি এতক্ষণে মুরগির মত জবাই হয়ে যেতেন," বললে স্বামীটি; চল্‌তি ইতর ভাষা ব্যবহারে তার বিশেষ অনুরাগ।

পরস্পর দাঁত বের করে হেসে উঠল; স্বামীর হাসি মৃদু ও সৌভ্রাত্রসূচক; আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অপর লোকটির মুখের পেশী কুঞ্চিত হ'ল।

একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে এবং এই সাহসিক কার্যের সূত্রে মধ্যাহ্ন-ভোজনটাও একসঙ্গে সারলে।

খাওয়ার পর তারা দুজনে অনেকক্ষণ বসে রইল। অনেক সিগারেট পুড়ল,

অনেক পরিচয় আদানপ্রদান হ'ল এবং এমন ধরনের আলাপ-আলোচনা চলল যাতে তার পক্ষে দশ মিনিটের বেশি অংশ গ্রহণ করা সম্ভব বলে তার স্ত্রী কোন দিনই বিশ্বাস করতে পারে নি। যখন তাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হ'ল, স্বামী ইচ্ছা প্রকাশ করলে পরদিন আবার মিলিত হবে; অপর লোকটি নির্বাক হাসি হাসলে শুধু, এই ব্যবস্থা অনুমোদন বা নাকচ কিছুই করলে না।

"আশা করছি সে এসে হাজির হবে," বললে স্বামী। এ আলাপ স্বামীটিকে উত্তেজিত করেছে, কারণ এটা তাকে এমন এক আবহাওয়ায় টেনে নিয়ে গেছে যেখানে সে সম্পূর্ণ অচেনা, এবং সেখানে এমন আনন্দ অনুভব করেছে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ বোধ করছে।

স্ত্রীর কাছে সে ব্যাখ্যা করল, সংক্ষেপে আলোচনার ধারাটা ধর্মবিষয়ক ছিল; যদিও তা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য, যে ধরনের আবেগপ্রবণ ধর্মে সে এতকাল অভ্যস্ত, এবং যা থেকে সে নিঃশব্দে দূরে সরে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো এবং অনেক বেশি উত্তেজক।

সঙ্গীর একটা বিবরণ দিতে সে চেষ্টা করল; কিন্তু তাতে এমন ব্যর্থ হ'ল যে স্ত্রী পরে মনেই রাখতে পারলে না, লোকটা বেঁটে না লম্বা, মোটা না রোগা, ফর্সা না ময়লা।

শুধু লোকটির চোখদুটোর বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হ'ল। বোঝা গেল জীবনে কখনো সে এমন মানুষের চোখ দেখে নি।

এ প্রসঙ্গেও সে ভুল সংশোধন করে বোঝাল যে বক্তব্যটি ঠিকভাবে প্রকাশ করা হয় নি। কারণ তার চোখদুটি ঠিক অন্য যে কোন মানুষেরই মত। শুধু তাকানোর ভঙ্গিতেই যা পার্থক্য। স্থির, উৎসুক, শান্ত ও গভীর সেই দৃষ্টি কি যেন সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এমন ব্যাপক মধুর দৃষ্টিতে কেউ কখনো তার দিকে তাকায় নি।

"তুমি প্রেমে পড়ে গেছ," হেসে বলল স্ত্রী।

এর পর তার স্বামীর ব্যাখ্যানা আরও বেড়ে গেল, বক্তব্যের বিশৃঙ্খলা আগের মতই থেকে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী আবিষ্কার করলে তারা দুজনেই এক বিচিত্র বেহুঁশ অবস্থায় এক রূপকথার মাঝখানে এসে পড়েছে।

"সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল," বললে স্বামী, "সব কিছু পেরিয়ে কি আমি চাই!"

"জীবনে এত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন আমি হই নি," সে বলে চলল, "আর প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমরা এটা নিয়ে মাথা ঘামালাম, বিপুল সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলাম।"

"সব রকম আটপৌরে ভাবনা আমার মাথায় এল; আর, বলা বাহুল্য, তার মধ্যে প্রথম হ'ল ঐশ্বর্য। লৌকিক প্রবাদগুলো আমাদের ওপর কল্পনাতীত প্রভাব

বিস্তার করে এবং প্রসঙ্গ যখন উঠেছে 'স্বাস্থ্যবান, ধনবান, প্রজ্ঞাবান'—এই কথাগুলো আপনা থেকেই যেন উত্তর যুগিয়ে দেয়। বেঁচে থাকা মানেই অর্জন করা, সেই জন্যই আমি পরীক্ষামূলকভাবে সম্ভাব্য হিসেবে ঐশ্বর্যের উল্লেখ করলাম; সঙ্গী সায় দিলেন যে বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু অল্প পরেই আমি বুঝতে পারলাম টাকা আমি চাই না।"

"সব সময়ই লোকের টাকার দরকার," বললে স্ত্রী।

"একদিক দিয়ে কথাটা সত্যি," সে জবাব করল, "কিন্তু এভাবে নয়; কারণ যখন আমি এটা নিয়ে চিন্তা করলাম, আমার মনে পড়ল যে আমাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই; এবং আমাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সাধ-আহ্লাদ অথবা কল্পনা, তা আমাদের যা টাকা আছে তাতেই অনায়াসে মেটানো যায়। তা ছাড়া, আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভালোই; যদি আমি ব্যবসা ছেড়েও দিই,—অবশ্য তা দিচ্ছি না—তা হ'লেও জীবনের শেষ পর্যন্ত চালাবার মত যথেষ্ট সঞ্চয় আমাদের আছে। এককথায় আমি আবিষ্কার করেছি যে টাকা অথবা তার ক্রয়-ক্ষমতা—কোনটাই বিশেষ সুবিধা দিতে পারে না।"

"একই কথা!" স্ত্রী অস্ফুট স্বরে বলে উঠল; স্থান ও কালের সুদূর ব্যবধানে যা কিছু কেনা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থেমে গেল।

"একই কথা!" মৃদু হেসে স্বামী সায় দিল।

"চাইবার মত কোন জিনিসই আমার মনে এল না," স্বামী বলে চলল, "আমি স্বাস্থ্য আর জ্ঞানের কথা বলেছিলাম; সেগুলোর কথাও ভেবে দেখলাম। কিন্তু যে পৃথিবীতে আমরা চলাফেরা করি তার মান অনুযায়ী নিজেকে বিচার করে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে আমার স্বাস্থ্য ও জ্ঞান দুই-ই অপর যে কোন মানুষের চেয়ে কম নয়; আমি এও ভাবলাম যে আমি যদি আমার সমসাময়িকদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হ'তে চাই, তবে জীবনের বাকী দিনগুলো আমার ভারি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ার আশঙ্কা।"

"ঠিক কথা।" চিন্তিতভাবে স্ত্রী বলল। "যে পর্যন্ত না তুমি আমাদের দুজনের জন্যই এ কামনা করছ, ততক্ষণ আমি খুশি যে তুমি একা জ্ঞানী হ'তে চাও নি।"

"শেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে আমাকে কি কামনা করার উপদেশ দেয়। কিন্তু সে জানাল কোন উপদেশই সে আদৌ আমাকে দিতে পারে না। 'সব কিছুর পেছনে আছে অভিলাষ,' সে বলল, 'এবং তোমাকে তোমার অভিলাষ খুঁজে বার করতেই হবে।'

"তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি অবস্থাটা বিপরীত হ'ত, এবং আমার বদলে তার কাছে এই সুযোগ আসত, তো সে কি চাইত; আমি তাকে বোঝালাম শুধু অবিমিশ্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তাকে আমি এই প্রশ্ন করছি, তার ইচ্ছাকে

নকল করবার জন্য নয়। সে উত্তর দিল যে সে কিছুই চাইত না। এই উত্তরে বিস্ময় বোধ করলাম, প্রথমে কিছুটা ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন এটা নিয়ে ভাবলাম, তার উত্তর আমাকে অদ্ভুতভাবে তৃপ্তি দিলে, এবং আমি প্রায় তার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম—"

"ওঃ," বলে উঠল স্ত্রী।

"এমন সময়ে একটা চিন্তা মাথায় এল। এই যে আমি,—মনে মনে ভাবলাম, আটচল্লিশ বছর বয়স; অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল, দেহে-মনে অনবদ্য স্বাস্থ্য; যতটা মানায়, জ্ঞানবুদ্ধিও ততটা আছে। এমন কি জিনিস আছে আমার অধিকারে, যা সম্পূর্ণভাবেই আমার, কিন্তু যা আমাকে ছাড়তেই হবে, অথচ আমি ধরে রাখতে চাই। জিনিসটি আমি দেখতে পেলাম, যা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে দিন দিন, পলে পলে, যা ফিরাবার নয়, যা অবশ্যম্ভাবী—তা হ'ল আমার আটচল্লিশতম বছর। আমি ভাবলাম আমার দিন ফুরোনো পর্যন্ত যদি এই আটচল্লিশ বছর বয়সটা চলতে থাকে তা হলেই আমি খুশি হই।

"চিরকাল বেঁচে থাকা বা এ ধরনের কোন অর্থহীন কামনা আমার নেই, কারণ আমি দেখলাম, চিরকাল বেঁচে থাকা মানেই এমন ভয়াবহ একঘেয়েমির যন্ত্রণায় দণ্ডিত হওয়া যা কল্পনাতীত। কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে আছি, সক্ষম হয়ে বাঁচতে চাই, এবং তাই আমি আমার বর্তমান অবস্থায় সব কিছু উপাদান অক্ষত রেখে এই আটচল্লিশ বছর বয়সটায় থেমে থাকার কামনা বোধ করলাম।"

"এমন ইচ্ছা করা তোমার উচিত হয় নি," ঈষৎ রাগতভাবে বলল স্ত্রী। "এটা আমার প্রতি ন্যায়বিচার নয়।" বিশদ ব্যাখ্যা করে সে বুঝিয়ে দিল, "আজ তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু এই ইচ্ছার অর্থ হচ্ছে কয়েকবছরের মধ্যে আমি অকারণ তোমার চেয়ে বড় হয়ে যাব। আমি মনে করি এটা তোমার পক্ষে মোটেই অনুগত স্বামীসুলভ ইচ্ছা হয় নি।"

"এই আপত্তির কথাটা আমি ভেবেছিলাম," স্বামী বলল, "আর এও ভাবলাম যে কোন নির্দিষ্ট জিনিসে কিছু এসে যাবে এমন বয়স আমার পেরিয়ে গেছে; এও, যে স্বভাবে এবং বয়সে—দুটোতেই আমি ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত বা অনুরূপ কোন আকর্ষণ পার হয়ে গেছি। এটাই আমার কাছে ন্যায়সংগত বলে বোধ হ'ল; তাই তার কাছে আমি আমার ঐ ইচ্ছা ব্যক্ত করে ফেললাম।"

"সে কি বলল?" জানতে চাইল স্ত্রী।

"সে কিছুই বলল না; শুধু মাথা নাড়ল; অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করল—ধর্ম, জীবন, মৃত্যু, মন; আরও অনেক কিছু, যখন হিসেব করে দেখলাম সেগুলো বিভিন্ন বোধ হ'লেও আসলে একটি মাত্র মূল বিষয়।"

"সবচেয়ে আজ আমি নিজেকে সুখী বলে অনুভব করছি," সে বলে চলল, "আর কোন অপূর্ব উপায়ে মনে হচ্ছে কাল আমি যে মানুষ ছিলাম আজ তার থেকে আলাদা।"

এইখানে তার স্ত্রী কথাবার্তা থেকে জেগে উঠে হাসতে আরম্ভ করল।

"তুমি একটি আস্ত বুদ্ধু," সে বললে, "আর আমিও সমান। কেউ যদি আমাদের এই আলোচনা শুনতে পেত, আমাদের মূঢ়তা নিয়ে তার তামাসা করবার অধিকার ছিল।"

তার স্বামী তার সঙ্গে প্রাণ খুলে হাসল ; স্বল্প নৈশ ভোজনের পর তারা শুতে গেল।

রাত্রে তার স্ত্রী একটা স্বপ্ন দেখল।

স্বপ্নে সে দেখল যে একটা জাহাজ মেরুসাগর অভিমুখে এমন এক অভিযানে যাত্রা করেছে, যার উদ্দেশ্য খুঁজে বার করবার মত ঔৎসুক্য তার নেই। তাকে ওপরে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। শুধু এটুকুই সে জানত যে তার যত মাথাব্যথা সবই ছিল মালপত্র নিয়ে, মেরু আবহাওয়ার উপযোগী যে সমস্ত জামাকাপড় সে এনেছে সেগুলো গুণে আর পরীক্ষা ক'রে।

তার আছে পশমের পুরু মোজা। আছে ভিতরটা লোম-লোম ওঠা, বাইরেটা নমনীয় চুনাট করা চামড়ার বুটজুতো। আছে কাঁধের ওপর পিঠের চাদরে লাগানো শিরস্ত্রাণের মতন মস্ত চামড়ার টুপি। আছে—সে দেখে মোটেই অবাক হ'ল না—একজোড়া থলথলে ফারের পাজামা। আছে ঘুমোবার ঢোলা জামা।

প্রচুর জিনিসপত্র ছিল তার সঙ্গে ; আর অভিযানের প্রত্যেকটি যাত্রীই, ঠিক সেই জিনিসগুলো না হোক, অন্ততঃ একই ধরনের আসবাবপত্রে বোঝাই।

এই সাজসজ্জাগুলো জাহাজে আলোচনার নিরবচ্ছিন্ন বিষয় ছিল, এবং যদিও দিন কাটল, সপ্তাহ চলে গেল, জাহাজের কথাবার্তা ঘুরে ফিরে সেই গরম জামাকাপড়েই লেগে রইল।

তারপর এক দিন আস্‌ল যখন আবহাওয়া প্রত্যক্ষভাবে বেশি ঠাণ্ডা ; এত ঠাণ্ডা যে তার আগ্রহ হ'ল সেই অদ্ভুত প্যাণ্টালুনগুলো টেনে বার করে, সেই আরামের টুপিটা মাথায় লাগায়। কিন্তু সেরকম কিছুই সে করল না, কারণ জাহাজের প্রত্যেকে তাকে বোঝাল যে এই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত ; তাকে আরও আশ্বাস দেওয়া হ'ল, শিগ্‌গিরি যে জমে-যাওয়া ঠাণ্ডা সহ্য করতে হবে তার কাছে এই গুরগুরে শীত কিছুই নয়।

মনে হ'ল এটা বেশ ভাল উপদেশ, তাই সে ঠিক করল যতক্ষণ সে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবে, ততক্ষণ সে সয়ে যাবে, অতিরিক্ত কোন জামা চড়াবে না ; এইভাবে যখন ঠাণ্ডা সত্যি প্রচণ্ড হবে, সে কিছু পরিমাণে অভ্যাস দ্বারা শক্ত হয়ে যাবে, আর ততটা কষ্ট ভোগ করবে না।

কিন্তু দিনে দিনে আবহাওয়াটা আরও ঠাণ্ডাই রয়ে গেল।

কারণ তারা এখন দুরন্ত ঘূর্ণমান সমুদ্রের মধ্যে, যেখানে হরিৎ ও শুভ্র তুষার-শৈল ভেসে চলেছে ; জাহাজের আশেপাশে ছোট ছোট বরফের পাহাড় দুলে উঠছে, উত্তাল হয়ে উঠছে ; কখনো নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার ওপরে ভেসে উঠছে ; আর এই ছোট ছোট পাহাড়গুলোর গায়ে মাথায় ধাক্কা দিচ্ছে ক্রুদ্ধ ধূসর জলরাশি।

তার হাতদুটো এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে সে তাদের বাহুমূলে ঢুকিয়ে রেখেছে গরম করার জন্য ; তার পায়ের অবস্থা আরও সঙ্গীন। সেগুলো তাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে ; কাজেই সে ঠিক করল পরদিন তার শীতের পোশাক বার করবেই, প্রতিকূলে কেউ কিছু বললেও তাতে কান দেবে না। "বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে," বললে সে, "আমার মেরুদেশীয় পাজামা পরবার মত, আমার নরম গরম বুট জুতো পরবার মত, আর আমার মস্ত লোমশ দস্তানা পরবার মত।"

শুতে গেল ; কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে সে সেখানে শুয়ে রইল। পরদিন সকালে তার আরও শীত করতে লাগল ; উঠেই সে রাত্রে বাংকের পাশে প্রস্তুত রাখা শীতের পোশাকগুলো খুঁজতে লাগল ; কিন্তু সেগুলো খুঁজে পেল না। বাধ্য হয়ে আটপৌরে পাতলা পোশাকই পরতে হ'ল ; তাই পরে সে গেল ডেকের ওপর।

যখন সে জাহাজের ধারে গিয়ে হাজির হ'ল, সে আবিষ্কার করল তার চারিধারের জগৎ পাল্টে গেছে।

সমুদ্র কোথায় মুছে গেছে। দূরে যতদূর চোখ যায় শুধু বরফের সমতলভূমি—সাদা নয়, এক দীপ্তিহীন ধূসরতা ; তার ওপর ঝুঁকে আছে এক আকাশ, তার মতই পাংশু, প্রায় তার মতই বিষণ্ণ।

এই জনশূন্য পরিত্যক্ত বিস্তৃতির ওপর দিয়ে বয়ে গেল এক নিষ্ঠুর মর্মভেদী বাতাস যার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে উঠল তার চোখদুটো, করকর করে হুল ফুটলো তার কানে।

একটি প্রাণীও নড়াচড়া করছে না জাহাজের ওপর ; যে দুর্বহ মৃত স্তব্ধতা বরফের ওপর বসে আছে, তা যেন ঘন, মূর্ত হয়ে উঠেছে জাহাজে।

অপর দিকে দৌড়ে গেল সে, দেখল গোটা জাহাজের যাত্রীসম্প্রদায় মাটিতে নেমে গেছে, জাহাজ থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। জমাট-বাঁধা বাতাসের মত, জমে-যাওয়া জাহাজের মত নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে লোকগুলো। তার দিকে চেয়ে রইল তারা ; একচুলও নড়ল না, টুঁ শব্দটিও করল না।

সে লক্ষ্য করল তারা সকলে তাদের শীতবস্ত্রে সজ্জিত ; আর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার শিরা-উপশিরার মধ্যে বরফ গুঁড়িগুঁড়ি করে প্রবেশ করতে শুরু করল।

জাহাজের সঙ্গীদের মধ্যে একজন লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এগিয়ে এল। দস্তানা-পরা হাতে তুলে ধরল একটা গাঁঠরি। প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে দেখল এই বোঁচকার মধ্যেই রয়েছে তার জামাকাপড়, তার ফারের চওড়া পাজামা, তার আরামের মস্ত টুপিটা, তার দস্তানা।

জাহাজ থেকে মাটিতে নামা কষ্টকর হলেও অসম্ভব ছিল না। পাশ দিয়ে একটা দড়ির মই ঝুলছিল, তা দিয়ে সে নেমে এল। মইয়ের ধাপগুলো লোহার মত শক্ত ঠেকল, জমে কঠিন হয়ে গেছে; সেগুলোর মসৃণ গা তার কোমল হাতকে আগুনের মত দংশন করতে লাগল। কিন্তু সে নেমে পড়ল বরফের ওপর, সঙ্গীদের দিকে চলতে শুরু করল।

তারপর সে সভয়ে দেখলে, হঠাৎ সকলে এক অব্যক্ত ঐক্যে ফিরে দাঁড়াল, এবং তার কাছ থেকে দৌড়তে আরম্ভ করল; ধক্ করে উঠল তার হৃদয়, স্পন্দন হ'ল স্তম্ভিত। তাদের পেছন পেছন সে দৌড়তে শুরু করল।

কয়েক পা পরে পরেই সে পড়ে যেতে লাগল, কারণ তার জুতো শক্ত করে বরফ ধরতে পারছিল না; আর প্রত্যেক বার যেই সে পড়ে যাচ্ছিল, বিকট জীবগুলো থেমে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, তাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। আর সেই লোকটা যার কাছে তার জামা-কাপড়, বোঁচকাটাকে তার দিকে দোলাতে থাকল, আর কিম্ভূতকিমাকারভাবে নাচতে লাগল।

সে দৌড়িয়েই চলল, পা পিছলিয়ে, পড়ে গিয়ে, কোনরকমে নিজেকে তুলে, যতক্ষণে না সে হাঁপিয়ে উঠল। যখন সে থামল কোন অঙ্গ এতটুকু নড়াবার ক্ষমতাও তার নেই, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

তারা দৌড়চ্ছে, দৌড়চ্ছে, আরও অনেক বেশি জোরে, পাগলের মত গতিতে; সে দেখল তাদের সাদা সুদূরে কাল কাল ফুট্‌কি হয়ে যেতে; দেখল তাদের সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে; আর দেখল যে সে যেদিকে তাকিয়ে রয়েছে সেখানে কিছু নেই শুধু ফ্যাকাশে মাইলের পর মাইল, আর ভয়ঙ্কর নীরবতা, আর ঠাণ্ডা।

কি ঠাণ্ডা!

তার সঙ্গে উঠল এক শব্দহীন বাতাস, ক্ষুরের মত ধারালো। তার মুখে এসে বিঁধলো; চাবুকের মত পাক খেয়ে গেল তার গোড়ালিতে; ছোরার মত খোঁচা মারল তার বাহুমূলের তলায়।

"কি শীত!" মৃদু বিড়বিড় ক'রে উঠল।

পেছন ফিরে যেখান থেকে এসেছে সেদিকে চাইল। কিন্তু জাহাজ আর দৃষ্টির সীমার মধ্যে নেই, তার মনে পড়ল না কোন দিক থেকে সে এসেছে।

দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটতে শুরু করল।

জাহাজটার খোঁজ পাওয়ার জন্য সত্যি সে প্রত্যেক দিকে ছুটেছিল; কারণ যখন সে একটা পথে শ'খানেক পা এগিয়েছে, পাগলের মত তার মনে হ'ল, "এ রাস্তা তো নয়", আর তৎক্ষণাৎ উল্টো রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু দৌড়োনো সত্ত্বেও এতটুকু গরম হ'তে পারল না; বরং আরও ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। আর তখন, ইস্পাতমসৃণ ধূসর সমতলে তার পা বারবার পিছলিয়ে পিছলিয়ে যেতে লাগল; পা হড়কে দ্রুত থেকে দ্রুততর

গতিতে নেমে যেতে লাগল গর্তে ; একটা ফাটলের কিনারায় এসে পড়ল ; হুস করে ঘুরে গিয়ে পড়ল একটা তুষার-রন্ধ্রে আর সেখানেই রইল পড়ে। "আমি মরছি!" সে বললে, "এখানে আমি ঘুমিয়ে পড়ব আর মরে যাব·····

তখন জেগে উঠল সে।

সোজা জানালার দিকে সে চোখ মেলল, দেখল অন্ধকারের পিশাচের সঙ্গে সংগ্রামরত প্রত্যুষের প্রেতাত্মা। জানালার বাইরের কাঠামোটায় এক পাংশু অনুভূতি। কিন্তু তা ভেতরের অস্পষ্টতাকে দমিয়ে দিতে পারে নি ; বিকট অ্যাডভেঞ্চারে ভীষণ ভয় পেয়ে সে এক মুহূর্ত বিছানায় পড়ে রইল, এটা যে শুধুমাত্র স্বপ্ন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

পরমুহূর্তে তার মনে হ'ল যেন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। চাদরগুলোকে সে আরও নিবিড়ভাবে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, স্বামীর সঙ্গে কথা কয়ে উঠল।

"কি বিশ্রীরকম ঠাণ্ডা বল তো!" বললে স্ত্রী।

বিছানায় পাশ ফিরে তাপ পাওয়ার জন্য সে স্বামীর কাছ ঘেঁষে শুতে গেল ; হঠাৎ সে অনুভব করল শীতলতার ভয়ানক আতিশয্য আসছে তার স্বামীরই কাছ থেকে।

বরফের মত সে।

চীৎকার করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল স্ত্রী। আলোর সুইচটা টিপে দিয়ে স্বামীর দিকে ঝুঁকে পড়ল—তার স্বামী মৃত, পাথরের মত ; ঠাণ্ডা পাথরের মত। স্ত্রী তার পাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল, আর ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ব্যর্থ সন্ধ্যা

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়—প্রথম বর্ষ, কলা

আমি যখন ঘরে ঢুকলাম, তখন ডাক্তার চৌধুরী একটি বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তার পেটটা টিপে দেখছিলেন তিনি ; আর ছেলেটির বোধ হয় সুড়সুড়ি লাগছিলো, সে ছটফট করছিলো।

"ছটফট ক'রো না খোকা, তা হলে যন্ত্রপাতি বার করতে হবে আমাকে।···আরে, তুমি যে হঠাৎ, কি খবর?"

"হাতের কাজটা সেরে নিন, বলছি।" বলে একটা চেয়ারে বসি। মনে পড়ে যায়, ডাক্তার চৌধুরীর বরাবরের অভ্যেস,—ছোট ছেলেদের যন্ত্রপাতির ভয় দেখানো। বাবলুকেও দেখান আমাদের বাড়ীতে যখন যান।···বাবলু তাঁকে জ্যাঠামশাই বলে।

মনে পড়তেই তাঁরই টেবিল থেকে টেনে নিলাম একটা কাগজ আর পেন্সিল। তিনি তখন প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখছেন। আমিও লিখতে থাকি—

দাদা, বিশেষ দরকারে আসতে হলো আপনার কাছে। বড়ো দুরবস্থা। সকাল থেকে আপনার ভাইপো-ভাইঝিদের পেটে কিছু পড়ে নি। দয়া করে যদি কিছু সাহায্য করেন। অবশ্য ধার হিসেবে চাইবার মুখ নেই আমার। চাকরি নেই, শোধ করবো কি করে। জানি, আপনাকে অন্যায়ভাবে চাপ দিচ্ছি। কিন্তু আপনার ওপর আমার এমন একটা আস্থা দাঁড়িয়ে গেছে যে আপনি নিজে সে-বিশ্বাস ভেঙে না দিলে তা ভাঙবে না। ইতি।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম, ডাক্তার চৌধুরী ছেলেটির বাবাকে ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন। এই অবসরে চিঠিটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।··· শেষ লাইনটা একটা চাল। ডাক্তার চৌধুরী নিজের 'পরিত্রাতা' রূপটা বড় পছন্দ করেন।

ছেলেটি তার বাবার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ডাক্তার চৌধুরী ফি-এর টাকাটা গুণে নিয়ে পকেটে রাখলেন। তারপরে আমার দিকে চাইতে চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। পুরো চিঠিটা না পড়েই তিনি আমার দিকে তাকালেন। "এমনভাবে কতদিন চালাবে আর?" গলার স্বরটা বিশ্রী রকমের ঠাণ্ডা।

কোন জবাব দেওয়া উচিত হবে না এ সময়ে। আমি তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে তাকালাম, যেখানে একটি সোনার শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তির সামনে হাত জোড় করে মীরাবাই বসে আছেন।

"এই নাও, ধর।" ফি-এর সদ্যোপ্রাপ্ত টাকার থেকে একটা দু-টাকার নোট এগিয়ে দেন ডাক্তার চৌধুরী। "আর শোন··· ।"

ঠিক এই সময়ে আর একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে আমাকে এক দীর্ঘ বক্তৃতার হাত থেকে রক্ষা করলেন। একটা মামুলী কুশল-প্রশ্ন সেরে উঠে পড়লাম।

"এই যে, এত দেরী করলে কেন চাঁদ?" আড্ডায় ঢুকতেই নিমাই প্রথমে সংবর্ধনা জানালো। "মালকড়ি যোগাড় হয়েছে? বসে যাও। বৌদি শাসিয়ে রেখেছেন, আজ দশটার পরেই সকলকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।" এই বলে বৌদি অর্থাৎ বঙ্কিমের বৌ-এর দিকে তাকিয়ে হাসে। বঙ্কিমের বৌ হাসে না। আমাকে বলে, "চা খাবেন?" আমি ঘাড় নাড়ি। সে পাশের ঘরে যায় চা আনতে।

বঙ্কিমের বাড়ীতেই আমাদের তিন-তাসের আসরটা বসে। ওর বৌ আমাদের চা যোগায়, নয় বসে থাকে জানলার ধারে। আমাদের আসরের বিষয়ে একেবারেই যেন নিরুৎসুক।

ফিরে এসে আমার হাতে চায়ের কাপটা দেয় সে। তারপর মুখটা নামিয়ে নীচু

গলায় বলে, "আজ আর তাস খেলবেন না। যা যোগাড় করেছেন, তাই নিয়ে বাড়ী যান। বাড়ীর লোকের উপকার হবে।" আমি হেসে বলি, "এই দু-টাকাটা যদি পাঁচ টাকা করে নিয়ে যাই, তা হলে কি আরো বেশী উপকার হবে না?" বলে মুখ ফেরাই অন্য দিকে, যেদিকে তাস বিলি করা হচ্ছে। বঙ্কিমের বৌ-এর দীর্ঘশ্বাস কানে আসে। ফিরে তাকাই না। পুরোনো তাসগুলো কি ঔজ্জ্বল্যবিহীন, আর পাশের টাকাপয়সার স্তূপটা কি চক্‌চকে!

নাঃ, মাথা গরম হয়ে গেছে। বাড়ী ফেরবার আগে পার্কটায় বসে মাথা ঠাণ্ডা করে যাই একটু। বাড়ীর কাছেই পার্কটা।.....

ঘাসের ওপর বসলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। আচ্ছা, বঙ্কিম এই ছোকরাগুলোকে আড্ডায় ঢুকিয়েছে কোথা থেকে? ওদেরই এখন প্রাধান্য। বুড়োদের মধ্যে শুধু আমি, নিমাই আর বঙ্কিম নিজে। ছোকরাগুলোর সঙ্গে খেলতে আমরা রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করি, হেরেও যাই। এই তো আজকে.....যাক্ গে!

আচ্ছা, বঙ্কিমের বৌ-ও তো ছোকরাগুলোকে ভালো চোখে দেখে না। তবুও বঙ্কিম ওদের সরায় না কেন? অবশ্য তার কারণও আছে। পুলিশের আজকাল বড় বেশী নজর এদিকে। ছোকরাগুলো যতটা আঁটঘাট জানে, আমরা ততটা জানি না। অথচ আমরা আড্ডায় অনেকদিন আছি—আর যখন ঢুকেছিলাম তখন এদের থেকে বেশী বয়স ছিলো।

উঠে বসলাম। জুয়ো ছেড়ে দিতে হবে। না দিয়ে উপায় নেই। চাকরীটা থাকতে খরচ পুষিয়ে যেতো। চাকরীটা যাওয়ার পর আর চলে না। ছেড়ে দিয়েও-ছিলাম একবার কিছুদিন আগে। এক হপ্তা জুয়োয় বসি নি। পুরো সাত দিন। তারপরে আবার গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে আর নয়।.....

গতবারেও তো এইকথাই ভেবেছিলাম! তা যা-ই ভেবে থাকি না কেন, এবারে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ধার করা পয়সায় জুয়ো খেলা—

"কিন্তু কি করবো?"

আমি নয়। আমি বলি নি কথাটা। কয়েক গজ দূরে একটা বেঞ্চির থেকে কথাটা আমার কানে এলো। চমকাতাম না, কিন্তু গলাটা নিজের মেয়ের বলে মনে হওয়ায় চমকে উঠলাম। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঠাহর করে দেখলাম, বেঞ্চিতে বসে আছে—হ্যাঁ, মঞ্জুই বটে; সঙ্গের ছেলেটিকে ঠিক চিনতে পারছি না।

"তা তো ঠিকই।" ছেলেটি বলছিলো, "তবে,—তবে,—আচ্ছা, ও তোমাকেই বা সেক্রেটারী করলো কেন? আর লোক পেলো না ওই মাইনেয়?"

সেক্রেটারী করলো মঞ্জুকে? কে?

"তা পাবে না কেন?" মঞ্জু উত্তর দেয়, "শুনলাম একটি বি এ পাশ ছেলেও ছিলো। কিন্তু রজতবাবু আমাকে বললেন, 'তুমি আই. এ. পর্যন্ত পড়েছ, ওতেই হবে। ওই কয়েকটা চিঠির উত্তর দেওয়া আর কি! অধিকাংশই নেমন্তন্নর জবাবে 'রিগ্রেট' কিংবা 'থ্যাংক ইউ' লেখা। পারবে না?' আমি আর না বলি কেন। মাস গেলে সত্তরটা টাকা তো কম কথা নয়।"

এইবার বুঝেছি। পাড়ার সেই তুখোড় বজ্জাত রজত সেন মঞ্জুকে তার প্রাইভেট সেক্রেটারী করেছে। রজত সেন, যার বুইক গাড়ীর গর্জনে আজকাল সকালে আমার ঘুম ভাঙে……

"কিন্তু আমার যেন কেমন ঠেকছে। কিছু মনে ক'রো না মঞ্জু, তুমি ও লোকটার কাছে চাকরী নিও না।"

"কিছু মনে ক'রো না অসিত-দা, টাকাটা কি তুমি দেবে?"

ছেলেটি চুপ করে গেল। আহত হয়েছে।

"রাগ করলে?"

"না, রাগবো কেন?"

"তবে কিছু বলছো না যে?"

অসিত আস্তে আস্তে বললো, "দেখো মঞ্জু, একটা চাকরী আমি পাবোই। নিরঞ্জনকে দিয়ে ওর কাকাকে বলিয়েছি তাঁর অফিসে একটা চাকরীর জন্যে। শনিবারে দেখা করতে বলেছেন তিনি। চাকরী একটা পাবোই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো তুমি।"

"বিশ্বাস আছে বলেই তো এই চাকরীটা নিলাম।"

"তার মানে?"

"মানে, তুমি চাকরী পেয়ে গেলে আর এটা করতে হবে না।"

"হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার বাবার চাকরীর কি হ'ল?"

"বাবা চাকরীর চেষ্টা করছেন বলেও তো মনে হয় না আমার।"

"তোমার পিতৃদেবই ঝোলালেন।"

সাহস কম নয় তো? আর মঞ্জুই বা সন্ধ্যেবেলায় ও ছোকরার সঙ্গে আড্ডা মারছে কেন, বাড়ীতে না থেকে?

"দেখো, আমার বাবার নামে আজেবাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।"

"অবশ্য। তিনিই তো আমার ভরসা।"

"কেন?"

"চাকরী পেলেই তাঁর কাছে গিয়ে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একটা নিবেদন করতে হবে কিনা।" দুজনেই হাসে।

মঞ্জু বলে, "আসি এবার। দেরী হয়ে গেল।"

"চল, তোমায় বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিই।"

"না, থাক।"

"আচ্ছা। আর শোন, রজতটাকে বেচাল দেখলেই বলবে আমাকে; বঙ্কু আর নিখিলকে বলে বেটাকে তুড়ুম ঠুকে দেবো।"

"থাক, আর বীরত্বে কাজ নেই। আমি তাকে বেচাল হতে দেবো কেন?"

"তা বটে।" দুজনে চলে যায় দু-দিকে। আমি ওদের বেঞ্চির পেছনে ছিলাম বলে ওরা আমায় দেখে নি। সামনে থাকলেও দেখত পেতো কিনা সন্দেহ!

ব্যাটা বেকার ভ্যাগাবণ্ড···

স্ত্রী বললেন, "রজতবাবু মঞ্জুকে চাকরী দিয়েছেন।"

"জানি।"

"কি করে জানলে?"

সত্যিই আমার জানবার কথা নয়। ভুলটা শুধরে নিয়ে বললাম, "এই যে, তুমি বললে।"

"ইয়ার্কি হচ্ছে। তা, রজতবাবু লোকটি বড় ভালো।"

"হুঁঃ।"

"পাড়ার দুঃস্থ মেয়ে দেখেই চাকরী দিয়েছেন। মাইনের কিছু অ্যাড্‌ভান্স্ দিয়েছেন। মুদীর দোকানের ধারটা শোধ করা যাবে। তুমি যে বলেছিলে ডাক্তার চৌধুরীর কাছে যাবে টাকার যোগাড়ে?"

"দেখা হয় নি। বাবলু কোথায়?"

"সারা দিন টো টো করে ঘুরে এসে এখন ঘুমোচ্ছে। মঞ্জু বলছিলো ওকে আবার স্কুলে ভর্তি করাবে।"

"মঞ্জু বিকেলে ছিলো?"

"না, বেরিয়েছিলো। আহা, সারাদিন বাড়ী বসে হাঁফ ধরে যায় যেন। একটু বেড়িয়ে আসা ভালো।"

বুঝলাম, রজত সেন আর মঞ্জুর ওপর আমার স্ত্রী এখন খুবই প্রীত। কিছু বলা ঠিক হবে না। সোজাসুজি মঞ্জুকে বলাই ভালো।

রাত্রে ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়া আমার বরাবরের অভ্যাস। রোজ আমি শোবার আগে মঞ্জু জলটা আমার ঘরে রেখে যায়। আজও এলো।

"মঞ্জু, রজত সেনের ওখানে চাকরীটা নিস নি।" ভূমিকা না করেই বললাম।

কেন?"

প্রস্তুত ছিলাম না। কি উত্তর দেবো? এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "ও সত্তর টাকায় কি-ই বা হবে সংসারের। এই দেখ না,—কিছুদিনের মধ্যেই আমি একটা কাজ পাবো, —তুই আর কেন মিছিমিছি—"

নিজের কানেই কথাগুলো কিরকম বাজে প্রলাপের মতো শোনালো। মঞ্জুর কঠিন মুখ দেখেই বুঝলাম কোন ফল হয় নি। সে চলে যাবার জন্যে পেছন ফিরতেই তবুও বললাম, "কি হলো, কাল থেকে যাবি না তো?"

"যাবো।" বেরিয়ে গেলো সে ঘর থেকে।

দরজার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম, আবার ফিরে এলাম। হাত দুটো মুঠো করলাম। গেলাসের জলটা রাত্রের জন্যে না রেখে ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেললাম। ওরকম করলো কেন মঞ্জু? বলতে পারতো, যতদিন আমি চাকরী না পাই, শুধু ততদিনই ও কাজ করবে। পার্কের সেই ভ্যাগাবণ্ড্ ছোকরাটাকে তো বলতে পেরেছিলো। আমার ওপর আস্থা নেই। নিজের বাবার ওপর আস্থা নেই! কেন?

জামাটা খোলবার আগে অভ্যাসবশতঃ পকেটে একবার হাত চালালাম। প্রায় ফাঁকা; তিনটে নয়া পয়সা বেরুলো শুধু। ডাক্তার চৌধুরীর নোটটার অবশিষ্ট।

হঠাৎ পাথর হয়ে গেলাম। আমি জুয়ো খেলি। তাও তো মঞ্জু জানে না আমি জুয়ো খেলি। সত্যিই আমার ওপর আস্থা রাখার কিছু নেই। হয়তো পার্কের সেই ছোকরাটা শেষ পর্যন্ত কাজ যোগাড় করবে, আর আমি—

রাগ পড়ে গিয়ে কিরকম নিঃসঙ্গ বোধ করলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে অনুভব করলাম, ছোকরাদের কাছে শুধু জুয়োতেই হারি নি।···

পরের দিন সন্ধ্যেয় আবার বঙ্কিমের বাড়ীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম।

বীরেশ্বর রায়

মণীশ নন্দী—পঞ্চম বর্ষ, কলা

বীরেশ্বর রায়ের কথা লিখছি।

বীরেশ্বর রায় আমার বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলতে এখানে আমি বয়স্যই বোঝাতে চাই। বয়সে কিন্তু মিঃ রায়ের সঙ্গে আমার যথেষ্ট তফাত ছিল। আমার আন্দাজ— এ ব্যাপারে আমি কখনও তাঁকে প্রশ্ন করিনি—তিনি আমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বর্ষীয়ান ছিলেন। আসলে এইজন্যেই আমি তাঁকে মিঃ রায় বলে সম্বোধন করতাম।

অবশ্য সম্বোধনের রীতিটা ছিল শুধু আমাদের বয়সের পার্থক্যের একটা সামাজিক স্বীকৃতি। মনে মনে আমি তাঁকে বন্ধু বলে মনে করতাম, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস—যদিও বিশ্বাসটা ভবিষ্যতেও, অতীতের মতই, কোনদিন যাচাই করে নেওয়া যাবে না—তিনিও আমাকে একই চোখে দেখতেন। আমাদের সম্পর্কই ছিল এ-বিশ্বাসের নীরব সমর্থন।

লিখতে লিখতে বুঝতে পারছি না কথাগুলো অন্যের কানে কেমন শোনাবে। বয়সের প্রভেদ সত্ত্বেও যে আমরা মনের অভেদ গড়ে তুলতে পেরেছিলাম এটা কারো কারো কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু এতে আশ্চর্যেরই বা আছে কি? বন্ধুত্ব কেবল এক অর্থেই বয়স-নির্ভর; এক এক বয়সের সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে বাঁধা এক এক রকম মনের গড়ন। আর এ-সম্পর্কেও আমার দুটো কথা বলার আছে। প্রথম, দেহের ও মনের বয়স একসঙ্গে বাড়ে না; এটা অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। দ্বিতীয়, যাদের মনের গড়ন একরকম তারাই বন্ধু হয় এ-ধারণা শুধু অংশত সত্য। বন্ধুত্বের জন্যে হয়ত কিছুটা মনের মিল দরকার, কিন্তু তার পরিমাণ বেশী নয়।

ভেবে দেখলে মনে পড়ে মিঃ রায়ের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আমি দ্বিমত ছিলাম। একটা ছোট উদাহরণ নেওয়া যাক। ম্যাকবেথের 'প্লাক ফ্রম দ্য মেমারি এ রুটেড সরো' কথাটা উনি তেমন পছন্দ করতেন না। বলতেন, ওটা কাব্যের চিত্রধর্মী হবার ব্যর্থ চেষ্টার একটা নমুনা। অংশটি আমার প্রিয়। আমি বলতাম, সরো-র সঙ্গে অ্যারো-র ধ্বনিগত সাদৃশ্য এত বেশী যে এখানে দৃঢ়নিবদ্ধ তীরের ইমেজারি অত্যন্ত স্পষ্ট। এটাকে উনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুদর্শন আখ্যা দিতেন (যদিও মিঃ রায়ের সপক্ষে এটা বলা দরকার যে অনুপ্রাসের মত স্থূল অলঙ্কার সচরাচর তিনি এড়িয়ে চলতেন), এবং আমি আমার দৃষ্টিশক্তির স্বাভাবিক দৌর্বল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে যেতে বাধ্য হতাম। আসলে, আমি জানতাম, ম্যাকবেথ নাটকটারই প্রতি উনি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু কেন বিরূপ ছিলেন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

আমাদের মতদ্বৈধের এই উদাহরণটির উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে এতে মিঃ রায় সম্বন্ধে আমার ধারণার আর একটা দিক বোঝা যাবে—ধারণাহীনতার দিক। মিঃ রায় সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমি জানতাম না, অনেক কিছুই আমি বুঝতাম না। এর মানে নয় যে তিনি রহস্যময় লোক ছিলেন। এ-কথা কেউ তাঁকে বললে তিনি নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হতেন। বরং, এটা আমারই অক্ষমতার স্বীকারোক্তি। মানবচরিত্রের আঁকাবাঁকা পথের নিশানা দিতে অনেকে আশ্চর্যরকম দক্ষ থাকেন, কারোর সঙ্গে তিরিশ মিনিট কথা বলার পর তাঁরা তার অন্তরের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারেন। এদিক দিয়ে আমার সামর্থ্য নিতান্তই পরিমিত। মিঃ রায় সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, তার মাঝে মাঝে অজানার বহু ফাঁক রয়ে গিয়েছে। নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অশালীনতা বলেই নিশ্চয় তিনি তা করতেন না। এবং যখন করতেন না, তখন

নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শ্রুতি দিয়ে আহৃত তথ্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করে নিতে আমি পারতাম না। রহস্য যদি কিছু থাকে, তার জন্ম আমার অক্ষমতাতেই।

অসংখ্য আলোচনায় আমার দ্বিমত ও অজস্র ব্যাপারে মিঃ রায়ের নীরবতা—এতে কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কোন অসুবিধা হত না। তার কারণ, যদিও আমি ভালো তার্কিক ছিলাম না, মিঃ রায় ভালো বক্তা ছিলেন। নিজের বক্তব্য তিনি ততটুকু স্পষ্ট করে বলতে পারতেন যাতে অন্যের বুঝতে কষ্ট না হয় এবং ততটুকু ঢেকে বলতে পারতেন যাতে অন্যের অপ্রীতির কারণ না হয়। ডেল কার্নেগীর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল, কেননা ভুল উদ্ধৃতি দিলে তিনি আমাকে শুধরে দিতে কখনও দ্বিধা করতেন না এবং নিজের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আলোচনাতেও আমি তাঁকে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী বলে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এও লক্ষ্য করেছি যে তাঁর স্পষ্টবাদিতা খুব অল্প লোকেরই বিরক্তির কারণ হয়েছে। শব্দচয়নে মিঃ রায় অসাধারণ কুশলী ছিলেন, এটা আংশিক ব্যাখ্যা হতে পারে। আমার বিশ্বাস, এর মূলে ছিল তাঁর কথা বলার স্বাভাবিক ধরন। তিনি কথা বলতেন ধীরে ধীরে, মৃদু নিরাবেগ স্বরে। কোন কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইলে বড় জোর উচ্চারণ আর একটু স্পষ্ট করতেন, কদাচিৎ তর্জনী দিয়ে টেবিলে টোকা দিতেন। কারোর সমালোচনা করতে হলে মনে হত যেন তিনি নিজেই কোন বিপদে পড়েছেন। সামনের বইয়ের প্রচ্ছদে সংখ্যাহীন জ্যামিতিক নক্‌শা আঁকতে আঁকতে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতেন (অত্যন্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে)। তাতে যার সমালোচনা করা হচ্ছে সে বুঝতে পারত যে আঘাত দেবার কোন ইচ্ছা বক্তার নেই। ব্যক্তিগতভাবে, মিঃ রায়ের বাচনভঙ্গীর আর একটি গুণ আমায় আকর্ষণ করত। যেহেতু উনি খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন, আমার কোন কথার প্রতিবাদে যুক্তি বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলে আমি, ওঁর আগেই, ওঁর যুক্তির কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাতে পারতাম। মনে হত না উনি আমার ভুল দেখাচ্ছেন; বরং মনে হত ওঁর নিরপেক্ষ আলোচনা শুনতে শুনতে আমিই নিজের ভুল খুঁজে বার করছি। নিজের যুক্তির ভুল নিজেই আবিষ্কার করা, নির্ভুল যুক্তি আবিষ্কারে অক্ষমতার অযোগ্য ক্ষতিপূরণ নয়।

শুধু বলার ধরন নয়, তিনি যা বলতেন সেদিক দিয়েও মিঃ রায় অসাধারণ বক্তা ছিলেন। আমি তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলছি না। যদিও তাঁর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের কথা আমি ভালোভাবেই জানি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিগ্রী নিয়েছিলেন গণিতে, কিন্তু দর্শন সাহিত্য অর্থনীতি ইত্যাদি আরো একাধিক বিষয়ের তিনি উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে শুনেছি তাঁর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, এবং ফেডারেল ফাইনান্সের উপর তাঁর লেখা একটি সুখপাঠ্য মনোগ্রাফ আমি নিজেই পড়েছি। এসব সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। তিনি যা জানতেন তার অল্পই লিখে গেছেন, যা লিখে গেছেন তার অল্পই বেঁচে থাকবে।

আমি বলতে চাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টির কথা। অন্য শব্দের অভাবে আমি 'অন্তর্দৃষ্টি' ব্যবহার করছি, যদিও জানি যে আমি যা বোঝাতে চাই ওতে তা স্পষ্ট হবে না। আমার পরিচিতদের মধ্যে যাঁদের আমি সত্যিই বিদ্বান মনে করি, তাঁদের আমি সহজেই দু ভাগে ভাগ করতে পারি: এক শ্রেণীতে আছেন তাঁরা যাঁরা নানা বিষয় সম্বন্ধে জানেন এবং নিজের বিচারশক্তির প্রয়োগে নিজস্ব অভিমতে পৌঁছানোর সাহস ও শক্তি রাখেন, অন্য শ্রেণীতে আছেন তাঁরা যাঁরা, শুধু ওইটুকুই নয়, উপরন্তু নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজেদের চিন্তা ও অভিমত ক্রম-অনুসারে যোগ করে জীবন সম্বন্ধেই একটা অ্যাটিট্যুড বা মনোভঙ্গী গড়ে তোলার স্থৈর্য ও ক্ষমতা রাখেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর এত অল্প লোক আমি জানি যে সবার আগে মিঃ রায়ের নাম মনে পড়ে। নিতান্ত-তুচ্ছ-নয় কোনও সমস্যা সম্পর্কে যখনই তিনি আলোচনা করতেন, আমার মনে হত যেন কোন গভীরভাবে প্রোথিত ক্রীডোর গায়ে ঘষে ঘষে নিজের ধারণাগুলি তিনি ব্যক্ত করছেন। এ শুধু স্বভাব-বক্তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত চতুরতা নয়, এ শুধু চমকপ্রদ কথা বলার অধ্যয়ন-সূক্ষ্ম কৌশল নয়। দিনের পর দিন দেখা শোনা ও জানার স্রোত মনের উপর ধীরে ধীরে যে পলি সঞ্চয় করেছে, এ হল তাতে আঙুল ঢুকিয়ে বিশ্বাস ও নম্রতার সঙ্গে প্রত্যেক নতুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

বিশ্বাসের পাশাপাশি আমি নম্রতার উল্লেখ করেছি। জীবনদর্শনও এক ধরনের বিশ্বাস, আর বিশ্বাসমাত্রেই, ফর্স্টারের ভাষায়, মেণ্টাল স্টার্চ। কিন্তু, মিঃ রায়কে কি আমার কখনও অযথা অনমনীয় মনে হয়েছে? কোনও বিতর্কে বিশ্বাসের দুর্গরক্ষায় যুক্তির প্রতি পরাঙ্মুখ মনে হয়েছে? এর উল্টোটাই সত্যি। নিজের গভীর বিশ্বাসগুলোর প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত নির্বোধ শৌর্যের সঙ্গে নয়। তাঁর স্বভাবের এই দিকটিকেই আমি চিন্তাগত নম্রতা বলছি। আমি যদি আর একটু ভাল তর্কবিদ হতাম—বলা বাহুল্য, আমি যখন নিজের অক্ষমতার কথা বলছিলাম, আমি অত্যুক্তি করছিলাম না—মতভেদের ক্ষেত্রে, আমার বিশ্বাস, আমি তাঁর কাছে আমার মতগুলো আর একটু বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করতে পারতাম। আমি নিশ্চিত, যুক্তির দাবি ও অভিজ্ঞতার অধিকার তিনি স্বীকার করতেন তাঁর গভীরতম ধারণাগুলো পরিশোধন, ও অংশত পরিবর্জন, করে।

এই পর্যন্ত লিখে বুঝতে পারছি যে বাংলা গল্পের নায়ক-বর্ণনার একটা প্রধান অংশ আমি অন্যায়ভাবে বাদ দিয়ে এসেছি। এবার ভুলটা শোধরানো প্রয়োজন। মিঃ রায়ের চেহারা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের চেহারার গুণ ছিল (রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন) তাঁকে দশজনের মধ্যে, এমনকি একশোজনের মধ্যে, সহজে চেনা যেত। মিঃ রায়ের চেহারার গুণ ছিল তাঁকে একশোজনের মধ্যে, এমনকি দশজনের মধ্যে, সহজে চেনা যেত না। আমি জানি যে যাঁরা তাকে দেখেছেন তাঁদের কেউ কেউ এটাকে অত্যন্ত অনুদার বর্ণনা মনে করবেন। আমি আশা করতে পারি যে তাঁদের বর্ণনার

প্রথমেই থাকবে তাঁর দৈর্ঘ্যের কথা, তাঁর গৌরবর্ণের প্রশংসাসূচক উল্লেখ। আমার ধারণাটা তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া দরকার: মিঃ রায় শুধু ততটুকুই সুপুরুষ ছিলেন, যতটুকু সুপুরুষ হলে জনতার মধ্যে অপ্রকট থাকা যায়। ব্যতিক্রমের কথা যদি বলতে হয়, আমি বলব শুধু তাঁর হাতজোড়া ও কণ্ঠস্বরের কথা—দ্বিতীয়টি অসামান্য সুন্দর বলে, প্রথমটি সুন্দর নয় বলে। তাঁর দুই হাতেই গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ছাত্রাবস্থার বন্ধু। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কলেজে অ্যাসিড নাড়াচাড়া করবার সময় একটু অসাবধান হয়েছিলেন, তার মাসুল তাঁকে বাকী জীবন বহন করতে হল। আর কণ্ঠস্বর? ইট স্টিল স্পীক্‌স।

মিঃ রায়ের চেহারা সম্বন্ধে যা বলেছি তা ব্যক্তিগত, আমি কিন্তু তা নিন্দামূলক মনে করি না। আশা করি এতক্ষণে আমি অন্তত এইটুকু পরিষ্কার করতে পেরেছি যে তাঁর উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিঃ রায় সিনেমার অভিনেতা ছিলেন না যে তাঁর চেহারাটাকে ব্যক্তিত্বের থেকে আলাদাভাবে বিচার করে দেখতে হবে। আমি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে একটা লোক হিসাবে, আমার বন্ধু হিসাবে, লক্ষ্য করেছি। সেখানে তাঁর চেহারা তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে অবিচ্ছিন্ন। সেখানে একমাত্র প্রশ্ন, প্রথমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে খাপ খায় কিনা। আমি এ-প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিইনি। তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, তাঁর ভ্রূভঙ্গী, এমনকি তাঁর নাকের দুপাশে নেমে-যাওয়া রেখা দুটি—এগুলো সবই আমার মনে আছে। মনে আছে এগুলো অসুন্দর নয় বলে, তাঁর ব্যক্তিত্বের অনতিদৃশ্য অথচ স্মরণীয় অংশ বলে।

তিনি যেখানে থাকতেন সেটার উপরেও যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা সংজ্ঞাহীন ছাপ ছিল। একটা দোতলা বাড়ির উপরের দুটো ঘর নিয়ে তিনি থাকতেন। তিনি একাই থাকতেন। কারণ তাঁর কোন আত্মীয়ের কথা কখনও শুনিনি, কেউ ছিলেন কিনা জানি না। কাজেই দুটো ঘর তাঁর পক্ষে পর্যাপ্তই ছিল। একটা লাইব্রেরী ও খাবার ঘরের কাজ করত, অন্যটা ছিল শোবার ঘর। এ ছাড়া বড় রাস্তার উপর তাঁর ফ্ল্যাটের যে অংশটা চওড়া বারান্দার আকারে বেরিয়ে ছিল, সেখানে থাকত দু-তিনটে বেতের চেয়ার আর একটা ছোট গোল টেবিল। ওটাই ছিল আমাদের বসার জায়গা। টেবিলটা উপরে-কাঁচ-লাগানো দামী জিনিস ছিল, কিন্তু এত ছোট যে চায়ের পেয়ালা-পিরিচ রাখতে হলে পেপার-ওয়েট সুদ্ধু খবর-কাগজটাকে অন্য চেয়ারে রপ্তানী দিতে হত। চেয়ারগুলো সব হাল্কা হলুদ রঙের ছিল, কেবল একটার রঙ ছিল হাল্কা ব্রাউন। সেইটাতে আমি বসতাম। ডানদিকে তাকালে নীচে দেখতে পেতাম দীর্ঘ রাজপথ, লোকে বেড়াতে বেরিয়েছে, মোটরগুলো নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে, ওধারের ছোট পার্কে পাড়ার বাচ্চারা খেলা করছে। আর বাঁদিকে তাকালে চোখে পড়ত লাইব্রেরীর সাদা দেওয়াল, ওদিকের কোণে আরাম-কেদারার হাতলের উপর দুটো বই, দক্ষিণের জানালার পাশে

ঝোলানো মিঃ রায়ের কোন মৃত চিত্রকর বন্ধুর আঁকা পুরনো অয়েলপেন্টিং। আর, সবার আগে ও পরে মিঃ রায়ের ঘরে যাবার কাঠের সিঁড়ি, যার শেষে ছিল কালো দরজার গায়ে কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা মিঃ রায়ের নাম।

তাঁর ঘরে আমি প্রথম কবে গিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম কিভাবে আলাপ হয়েছিল, সেকথা আমার আজ মনে নেই। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা খুব সাধারণ কোন ভাবে ঘটেছিল। হয়ত বাবার কোন বন্ধুর সঙ্গে তিনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং তখন আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়। হয়ত তখনই তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানান ও এইভাবেই ওখানে আমার যাতায়াতের সুরু। সপ্তাহে তিনদিন উনি অফিস থেকে ফিরে টেনিস খেলতে যেতেন। বাকী ক'দিন ওঁকে বিকেলে ঘরে পাওয়া যেত। ওই সময়ে মাঝে মাঝে আমি ওঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম। কলিং বেল টিপতেই উনি এসে দরজা খুলে পাশে দাঁড়াতেন। তারপর আমরা গিয়ে বারান্দায় বসতাম। রোজই আমরা এই অতি সাধারণ প্রকরণ অনুসরণ করতাম। এমনকি শেষ যেদিন ও-বাড়িতে যাই সেদিনও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সেই অয়েলপেন্টিং, সেই কেদারার হাতলে বই, সেই পার্কে বাচ্চাদের হট্টগোল, ব্রাউন চেয়ারে আমি আর হলুদ চেয়ারে মিঃ রায়।

অথচ, ভেবে দেখলে, এমন হবার কোনও কারণই ছিল না। মিঃ রায়ের দিক থেকে দেখলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কোনই কারণ নেই। আমার দিক থেকে দেখলেও মিঃ রায়কে কেন আমি বন্ধু বলে মনে করতে যাব? কিন্তু এ-ধরনের প্রশ্নের বোধহয় কোন মানে হয় না। হয়ত সব বন্ধুত্বই এমন যুক্তিহীন, এমন কার্য-কারণ সূত্রভেদী। সব কথা বলার পরেও এটা তো সত্যি থাকে যে মিঃ রায়ের বাড়ি যেতাম আমি তাঁর সঙ্গে গল্প করতে—এবং তাঁর সঙ্গে গল্প করতে আমার ভালো লাগত। এই ভালো লাগাটাকে বিশ্লেষণ করতে যাওয়া ব্যর্থ প্রয়াস।

কিন্তু, আমার এই শান্ত-সহিষ্ণু বিকেলগুলো শেষ হয়ে গিয়েছে। যে-টেবিলে বসে এখন লিখছি, তারই একপাশে রয়েছে এক সপ্তাহের পুরনো একটা স্টেটস্‌ম্যান। ওতে আছে মিঃ রায়ের অনতিদীর্ঘ অবিট্যুয়ারি। বহু প্রশংসার কথা আছে ওটাতে, হয়ত তাঁর অফিসের কোন সহকর্মী লিখেছেন। দু-একটা অতিবাদ ছাড়া বিশেষ কোন ভুল নেই। কিন্তু আমি জানি বেশী লোক ওটা পড়বে না। মিঃ রায়ের চিহ্নগুলো একে একে পৃথিবী থেকে মুছে যাবে, তাঁর ভস্মীভূত দেহের মতই। তাঁকে যাঁরা চিনতেন এক একজন করে মারা যাবেন। যাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁরাও ধীরে ধীরে তাঁকে ভুলে যাবেন। আমিই বা কি দিয়ে তাঁকে মনে রাখব? দু-একটা চমকপ্রদ কথা, একটা পুরনো মনোগ্রাফ, কয়েকটা উপভোগ্য বিকেল আর সবশেষে একটা ভঙ্গুর সৌহার্দ্য। আমিও আস্তে আস্তে মিঃ রায়কে ভুলে যাব। শুধু একটা ঝাপসা স্মৃতি থাকবে : আমি একজন ভালো বন্ধুকে হারিয়েছিলাম।

কর্ণধার

গায়ত্রী চক্রবর্তী—চতুর্থ বর্ষ, কলা

"উৎকণ্ঠ আমার লাগি যদি কেহ প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।"

বাসওয়ালারা যে দিনের মধ্যে কতবার ধন্য হচ্ছে, তাই ভাবি। কল্পনা করুন, সকাল দশটার তেত্রিশ নম্বর কিংবা বিকেল পাঁচটার এসপ্লানেড। শুধু নির্জনশয়নে প্রেয়সীর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা নয়,—হাজারো মেয়েপুরুষের সকাতর দীর্ঘশ্বাস। বিম্বোষ্ঠী স্টেনোগ্রাফার থেকে নিতান্তই কোঁচা-সামলানো কেরানী অবধি সকলেই আছে এ-ভিড়ে। দু-একটা সরব খেদোক্তিও যে কানে আসে না এমন নয়। নিজেকে এ পরিবেশ থেকে সহস্রাধিক যোজন দূরে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা যখন উত্তরোত্তর প্রবল এবং পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে, ঠিক সেই মুহূর্তে—দিগন্তে যেন নীলচে-সাদাচে কিসের আভাস দেখা যাচ্ছে না? আবার ভগবানে বিশ্বাস ফিরে পেলেন আপনি। কন্ডুইয়ের কাছে যে বাচ্চাটা এতক্ষণ 'একটা পয়সা'র জন্য নিষ্ফল আবেদন জানাচ্ছিল, তাকে হয়তো এই পরম দুর্বল মুহূর্তে দুটোই দান করে ফেললেন (পরে এ নিয়ে অনুশোচনার অবকাশ অনেক, তবুও)। যতক্ষণে হাতের কাছাকাছি এসেছে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত রথ, ততক্ষণে অপেক্ষমাণ জনতার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ছোট সংস্করণ দেখা যাচ্ছে স্পষ্টই। অবশ্য রথে আরোহণ করলেই আবার মনটা খিঁচড়ে যাবে। অব্যবহিত ত্রিশঙ্কুত্ব-প্রাপ্তির পরে, কিছুক্ষণ আগের পরম বন্ধুদের আলাপনও আর কানে তেমন মধুর ঠেকবে না। তবু সেই মিলনমুহূর্তের যে প্রশান্তি, তাকে আপনি হারাবেন না। হারাবে না সেই একশো লোকের কেউই। তাই বলছিলাম, এ যুগে বাসওয়ালারাই ধন্য হবার সুযোগ পায় সবচেয়ে বেশি।

উনিশের শতকের জনমেজয় 'বাবু'-নামক জীবকে পর্যবেক্ষণ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় চমৎকারিত্বের শেষ কথা 'বাস'। স্পুটনিক তো দু-একটাই, বাস যে বহু। আর শ্লথগতি ট্রামগুলো যেন যুগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। এই গণতন্ত্রের দিনে ফার্স্টক্লাস সেকেণ্ডক্লাসের মত প্রাগৈতিহাসিক জিনিস আর কতদিন চলবে? অভিজ্ঞ পাঠক স্মরণ করবেন আগস্টের সুদীর্ঘ ট্রাম-ধর্মঘটের কথা। অসুবিধে হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তবু কিছুই আটকায় নি। এমন কি, সাহস করে এ কথাও বলি, আপনার সঙ্গে বাসের আত্মিক সম্বন্ধ যেন নিবিড়তর হয়েছিল সেই কদিনে। আর শুধু বাসের সঙ্গে কেন, পথের মানুষের সঙ্গেও। সট্রাম দিনগুলোয় যে অনাহূত আগন্তুককে বিদ্বেষে পেছনে ফেলে গেছে ধাবমান বাস, নিষ্ট্রাম অবস্থায় তাঁকেই দেখেছি পাঁচজন ঝুলন্ত যাত্রীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে সহর্ষে বাসস্থ হতে।

কোনো এক বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ বলেছেন, তেমন বস্তুই উৎকৃষ্ট, যার আবেদন সর্বজনীন। শুধু সর্বজনীনই নয়, বহুবিচিত্র। আবেদনের প্রসারেই বলুন, আর বৈচিত্র্যেই বলুন, বাসের গৌরব অপ্রতিহত। ব্যাপ্তির প্রমাণ পাবেন যে কোনো ব্যস্ত প্রহরে, যে কোনো বাসের অভ্যন্তরে। আর বৈচিত্র্যের প্রমাণ পাবেন মনে। হাতেনাতেই পাবেন। গোড়াতেই যে পরিস্থিতির অবতারণা করেছি, সেখানে আবেদনটা মধুর। সেখানে মনের প্রথম অবস্থা ব্যাকুল, শেষ পরিপূর্ণতায়। ঠিক যেমনটি হয় প্রিয়জনসমাগমে অভিসারিকার। কিন্তু এবার ঘটনাটা আরেকটু অন্যরকম করে ভাবুন। একই স্থান, একই কাল, একই পাত্র। সেই একই অপেক্ষমাণ জনতা, আর তার মধ্যে আপনি। আর ঠিক সেইরকমই, বাস এসেছে। কিন্তু এ বাস আপনার নয়। সামনের ফলকটা স্পষ্ট করেই বলছে 'হেথা নয়, অন্য কোনো বাসে।' আবেদনটা আর মধুর রইল কি? ব্যাকুলতার অবসান হল নৈরাশ্যে। শুধু বাসওয়ালার ওপর নয়, সমগ্র মানবসংসারের ওপর সক্রোধ অভিমান ঘনিয়ে উঠল মনে। চকিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন আপনি। মানসকর্ণে শুনতে পেলেন বড়বাবুর স্খলিত কণ্ঠ, অবস্থাবিশেষে মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল বহুবিশ্রুত অধ্যাপকের রোষকষায়িত দৃষ্টি।

আরেকবার কাল্পনিক কসরত করবার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধরে নিন আপনি একজন আটপৌরে পদাতিক। আপনার কাছে বাসটা একটা আধুনিক ঘটোৎকচ মাত্র। যদি কলকাতার রাস্তায় পথ চলেই চুল পাকিয়ে থাকেন, তবে সত্রাসে পাশ কাটাবেন; আর যদি (অপরাধ নেবেন না) সদ্য আমদানী হন, তবে শঙ্কাকুল নেত্রে এদিক ওদিক তাকিয়ে হয়ত চলন্ত বাসের সামনে গিয়েই দাঁড়াবেন। তখন প্রশ্ন শুধু চালকের দয়ার। সে কথা যাক। আবেদনটা নিঃসন্দেহে দু ক্ষেত্রেই সশঙ্ক।

কিংবা ধরুন বসে আছেন মোটরে। আপনার অনিরুদ্ধ গতিকে ব্যাহত করল একটা বাস। বিরক্ত হলেন প্রচুর, তবু পথ ছেড়ে দিতে হল। পুরো বাস-জাতটার ওপরেই একটা নিষ্ফল আক্রোশ জন্মাল আপনার। নিজের ঝক্‌ঝকে-চক্‌চকে ক্যাডিলাকের পাশে ঐ নিতান্ত অ-রমণীয় কিম্ভূতটার সান্নিধ্যে বিরক্তি বাড়ল বই কমল না। এক্ষেত্রে আবেদনটা ঠিক কি জাতের, তা কি আর বলে দিতে হবে?

এ তো গেল আবেদন-বৈচিত্র্যের কথা। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে বাসের অবদান যে কত মহৎ, সেটা আমি অন্ততঃ হাড়ে হাড়ে বুঝছি। যে কোনো দিন সকাল দশটা নাগাদ কলেজ স্ট্রীটগামী বাসের নীচের তলায় চোখকান খুলে দাঁড়িয়ে থাকুন। গতজন্মের সুকৃতি না থাকলে বসতে পাবেন না, কাজেই 'দাঁড়িয়ে থাকুন'ই বললাম, 'ঝুলে থাকুন' বলাটাই বোধ হয় আরো ঠিক হত। পৃথিবীতে কতরকম বিষয়েই যে একটি মানুষ অপর আর একটি মানুষকে জ্ঞানদান করতে পারে, সে অভিজ্ঞতা লাভ করে আপনি ধন্য হলেন। কয়েকটা চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

নেতাজী জীবিত কি মৃত, পকেটমারের হাত ঠিক কিভাবে এড়াতে হয়, সরকার কোন কোন বিশেষ উপায়ে আমাদের গালে চড় মেরে টাকা আদায় করছেন, নয়া পয়সার দোষ ও গুণ, কন্‌ডাক্‌টরের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশপুরুষের বর্ণাঢ্য জীবনবৃত্তান্ত, পার্সেন্টেজ 'ম্যানেজ দেওয়ার' সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী, উদ্বাস্তু সমস্যা, ক্রিকেট, মায় হালফ্যাশানের ব্লাউজের ছাঁটকাট অবধি। এর ওপরে প্রতিদিনের চমকপ্রদ খবরাখবরগুলোকে নানা অভিনব ভঙ্গীতে খণ্ডবিখণ্ড করা চলছেই। বিশ্বাস করুন, শ্রীসিদ্ধার্থ রায়-ঘটিত গোলযোগটার একটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ধারণা, বিভিন্ন যত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমি এই বাস-মারফতই পেয়েছিলাম একটা অবিস্মরণীয় সকালবেলায়। সমানেই গুরুমশাইয়েরা স্থানান্তরিত হচ্ছেন; সব বিষয়েই একসঙ্গে, অযাচিতভাবে, প্রচুর চিত্তাকর্ষক মন্তব্য এবং অঙ্গসঞ্চালন সংযোগে উচ্চকণ্ঠে শিক্ষাদান চলছে; তার সাথে কন্‌ডাক্‌টরের অনুনয়, অনুরোধ, সময়বিশেষে হুমকি, টিকিটপ্রত্যাশীদের কলকণ্ঠ আর যন্ত্রদানবের কাতরানি চলছে একনাগাড়েই। এ ঐকতান বাসের প্রাত্যহিক মজলিসে অপরিহার্য। আর জ্ঞানার্জনের এমন একটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ অঙ্গনই কি আর দুটো মেলে?

কালিদাসের যুগের দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে আলবালে জলসেচন করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চোখের সামনে কতই দেখছি, আধুনিক যত দুষ্মন্তেরা ফাইল হাতে শকুন্তলার আবির্ভাবে অভিভূত হয়ে, ঘাড় কাত করে লাফিয়ে উঠছে সিট ছেড়ে। শকুন্তলারা বসছেন; আর ঠোঁটের কোণে সলজ্জ কৃতজ্ঞ হাসিটুকু অভিভূততর করে তুলছে বেচারা দুষ্মন্তদের। এ সূত্রে আরো একটা কথা মনে হচ্ছে। আগামী দিনের কলকাতার নাগরিকেরা ফাল্গুনের-রং-লাগানো প্রাকৃতিরিশের দিনগুলোর সঙ্গে ডবল ডেকারের ওপরতলার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবেন, এ কথা অনস্বীকার্য। প্রচুর আলো, প্রচুরতর হাওয়া, ঊর্ধ্বশ্বাস গতি, আর ঈষৎ রঙীন মন—সব মিলিয়ে এক কথায় অনবদ্য। তারুণ্যের এই রাঙা আভাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে পশ্চিম বাংলা সরকার রসিকজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, সন্দেহ নেই।

মনে ভাবলাম, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—বাসবৃত্তান্ত বুঝি শেষ হল। কিন্তু হঠাৎ আমার এক বন্ধুর স্বীকারোক্তি মনে পড়ল। তিনি নাকি বিশ্বসাহিত্যের যত 'অমূল্য রতন'এর সঙ্গে মোলাকাত করেছেন বাসে বসে। সত্যি, বাসের ভেতরে তাঁকে দেখেছি কোলে-খোলা কেতাবে নিমগ্নদৃষ্টি; আর বাসের বাইরে দেখেছি তাঁর বইএর টিকিটকণ্টকিত পাতা। এ প্রসঙ্গে এক অবিশ্বাসী অরসিক বলেছিল সে নিজে নাকি সাহিত্যরসপান করেছে একমাত্র বাসের রড ধরে ঝুলন্ত অবস্থায়। অবশ্য এ দুই উক্তির একটারও যাথার্থ্য সপ্রমাণ করতে আমি অক্ষম। পরীক্ষার আগের আকুল মুহূর্তগুলো ছাড়া আর কখনো বাসে বই খুলেছি বলে মনে পড়ছে না। এমন কি সামনের ভদ্রলোকের মেলে

ধরা খবরের কাগজটার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতও করি নি সজ্ঞানে। সে দিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ।

সমানেই শুনছি, এ যুগটা গতির, এ যুগটা যন্ত্রের। বাস সর্বজন-অনুমোদিত গতিযন্ত্র, সুতরাং স্বীকার করুন, বাসটা বিশেষভাবে এ যুগের। অবশ্য গতিযন্ত্র তো আছে আরো কতই। উড়োজাহাজ আছে, আছে রেলগাড়ি। কিন্তু পথের মানুষের যাত্রার দূরত্ব আর ট্যাঁকের আয়তনের সঙ্গে বাসের চিরকেলে মিতালি। সে নাড়ির টান অগ্রাহ্য করবে কে? এহেন বিচিত্রবীর্য যে যান তার সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার সাহস ধরি না। নতুনতর বোদ্ধার পথ চেয়ে রইলাম।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প

বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায়—পঞ্চম বর্ষ, কলা

সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন লেখকদের অসংখ্য 'শ্রেষ্ঠগল্প' এবং 'সেরাগল্প' সংকলন থেকে বাংলা ছোটগল্পের প্রাচুর্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। বাংলাসাহিত্য যখন কাব্য, নাটক, উপন্যাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত। সেদিক থেকে বিচার করে বলা চলে যে ছোটগল্প আধুনিক সৃষ্টি। শুধু বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার হিসাবে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হচ্ছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ বিশী, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি। যদিও তালিকাটি বৃহৎ, তবুও আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বিচার প্রসঙ্গে এঁদের নাম অপরিহার্য। সংখ্যাপ্রাচুর্য এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষ উভয় দিক থেকেই বাংলা ছোটগল্প যে পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ছোটগল্পের সমমর্যাদাসম্পন্ন, একথা মনে করা অসমীচীন নয় এবং বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে ছোটগল্পের ধারাটিতে এখনও পর্যন্ত অগ্রগতির সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। তবে

ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনায় আমরা যে বিষয়বস্তু ও রূপাঙ্গিক লক্ষ্য করেছি, যুগবিবর্তনে পরবর্তীকালের বাংলা ছোটগল্পে তার অনেক পরিবর্তন এসেছে।

স্বাধীনতাপরবর্তী কালের ছোটগল্পগুলির গতিপ্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে যুগচেতনাকে রচনার মধ্যে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা এ যুগের লেখকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বাংলা ছোটগল্পে যুগস্বভাবের প্রতিফলন নূতন নয়। কল্লোল-গোষ্ঠীর গল্পকারদের রচনায় তার প্রথম অঙ্কুরোদ্গম এবং পূর্ণ বিকাশলাভ করেছে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালের গল্পগুলিতে। কিন্তু প্রথম দিকের অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী প্রভৃতির ছোটগল্পে এই রূপটির পরিচয় নেই, সেখানে ঘরোয়া বাঙালী জীবনের মধুর রসই প্রধান। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা যায় যে তাঁর একই সময়ের লেখা ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে, উপন্যাসে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে, তখনকার লেখা ছোটগল্পগুলি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। স্নেহমমতাময় দৈনন্দিন বাঙালী জীবনের যে রূপ, তাকেই বিকশিত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গল্পকারগণ তাঁদের ছোটগল্পে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ছোটগল্পের এইটাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা অর্থাৎ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ছোটগল্পে এক নূতন রীতির প্রবর্তন করলেন। যে অভিনব উপকরণ আমরা সাম্প্রতিককালের বাংলা ছোটগল্পে দেখি, তারই কাঠামো তৈরি হয়েছে কল্লোলগোষ্ঠীর গল্পকারদের হাতে। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের সংকটকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই নিছক ঘরোয়া জীবনের কথা তাঁদের গল্পে মুখ্য নয়; তাঁরা সেখানে স্থান দিয়েছেন মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনকে, স্বীকৃতি দিয়েছেন অবহেলিত নিপীড়িত জনসাধারণকে। তা ছাড়া মনস্তত্ত্বের যে জটিল ব্যঞ্জনাকে উপজীব্য করে অতি-আধুনিক বাংলা ছোটগল্প অগ্রসর হয়েছে তারও প্রথম ইঙ্গিত কল্লোলযুগের ছোটগল্পে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। কল্লোলযুগের লেখকদের রচনায় উপকরণের বৈচিত্র্য থাকলেও, নানা জাতীয় সমস্যা স্থান পেলেও, শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাই সেখানে প্রধান ছিল। একটি বিদ্রোহাত্মক পটভূমিকে আশ্রয় করে তাঁরা গল্পরচনা করলেও, শিল্পের যে একটি নিজস্ব রীতি আছে, সে সম্পর্কে তাঁরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাই অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকরা তাঁদের ছোটগল্পগুলিতে যে সমস্যাকে স্থান দিয়েছেন, জীবনের যে জটিল সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার একটি শিল্পগত মূল্য রয়েছে। বিশেষতঃ বুদ্ধদেব বসু সাবলীল ভাষাচেতনার মধ্য দিয়ে তীব্র সংরাগকে (passion) যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা অন্যত্র দুর্লভ। জীবনের গ্লানি, পঙ্কিলতাকে প্রাধান্য না দিয়ে পাঠকমনে সুন্দরের অনুভূতি সৃষ্টিই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি লেখকরা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যে রীতির প্রবর্তন করলেন, তাকেই অবলম্বন করে বাংলা ছোটগল্প আরও এগিয়ে গেল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হাতে। এই সময়ের বাংলাসাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায়, 'Art for art's sake'—এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে একদিকে তরল রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের সৃষ্টি হয়েছিল, আরেকদিকে রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক সমাজবোধের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসৃষ্টি করতে এসে এই রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। একদিকে অতীত জীবনের নিদর্শন, আরেকদিকে অবহেলিত মানুষের জীবনের কথা আশ্রয় করে গল্পরচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে যে অভিনবত্বের সৃষ্টি করলেন, বাংলাসাহিত্যে তা দুর্লভ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে যে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে পূর্ণভাবে গল্পে ও উপন্যাসে তিনিই প্রথম উপস্থাপিত করলেন। কল্লোলযুগের লেখকরা সার্থকভাবে যা পারেন নি, তাকেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। "মানুষ একটা গভীরতর জৈবিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক মাত্র"—এ কথা খুব স্পষ্টভাবে তিনি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড যেখানে শুধু ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি সেখানে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে সমগ্র সমাজজীবনের প্রতি। তাই তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পগুলিতে শুধু তত্ত্ব বা তার বিশ্লেষণ নেই, সেখানে রয়েছে মানুষের বাস্তব সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

কল্লোলযুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত ছোটগল্পগুলির বৈশিষ্ট্য মোটামুটি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত দু'টি যুদ্ধ বাঙালীর জীবনকে যেভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, সেই জীবনেরই নগ্ন, রিক্ত রূপকে ছোটগল্পের উপজীব্য করেছেন বিভিন্ন লেখকরা এবং তারই মধ্য দিয়ে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকেও তাঁরা নানা দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাত মানুষের অন্তরাত্মাকে যেভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করায় যুদ্ধোত্তর কালের গল্পগুলিতে এক তীব্র জ্বালা প্রকট হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতাপরবর্তী কালের বাংলা ছোটগল্পে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল। স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন এসেছে সন্দেহ নেই এবং সেইসঙ্গে বাঙালীজীবনও নানাখাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে। জীবনকে আশ্রয় করেই সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। তাই জীবনের সেই বহুবিচিত্র পথকে অবলম্বন করে বাংলা ছোটগল্পও অগ্রসর হয়েছে।

দেশবিভাগের ফলে আশ্রয়চ্যুত অগণিত নরনারীর জীবনে যে নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ

পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের ছোটগল্পগুলিতে সেই জীবনসমস্যাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। শুধু উদ্বাস্তুসমস্যা নয়, আধুনিক যুগের ব্যাপক অর্থসংকট, রাজনৈতিক সংকট, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানকে অবলম্বন করেছে এ যুগের বাংলা ছোটগল্প। কিন্তু তার পরিচয় সেইখানেই শেষ নয়। ব্যক্তিজীবনের গতি ও লক্ষ্য বাইরের ঘটনার দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও, তার যে একটা নিজস্ব গতি রয়েছে, এ কথা আধুনিক গল্পকাররা কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় বর্তমানের রূপনিরীক্ষণের আগ্রহই শুধু নেই, সেইসঙ্গে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তবে এই লক্ষণ যে স্বাধীনতাপূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্পেও ছিল, সেকথা বলা হয়েছে। বিশেষতঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট ছিল। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনে নিরন্তর যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, সেই মনের জটিল পথে চলাফেরা করে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন আধুনিক লেখকরা। সেখানে কোথাও রয়েছে সমাজের বিত্তহীন, অশিক্ষিত, অসংস্কৃত মানুষের অন্তরের গোপন বেদনার কথা, কোথাও রয়েছে আপাতসুবিন্যস্ত জীবনের অন্তরালে কোন ধনী অভিজাত জীবনের অসুস্থ, বিকৃত মনের আত্মপ্রকাশ। বাস্তবজীবনে মানুষের যে অস্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির নানা পরিচয় পাওয়া যায়, তাকেই তুলে ধরেছে আধুনিক বাংলা ছোটগল্প।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও, এখনকার শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে, যাঁরা মনস্তত্ত্বমূলক গল্পরচনার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী রায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, নবেন্দু ঘোষ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি অন্যতম। বিশেষতঃ নরেন্দ্র মিত্রে সূক্ষ্ম হাস্যরসের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের ট্র্যাজিকমিক অসঙ্গতি সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর মনস্তত্ত্বে যে গাঢ়তার স্বাদ আছে তা অনন্য।

যে কোন একটি বাস্তবসমস্যাকে কাহিনীর বহিরঙ্গে রেখে মনস্তত্ত্বের জটিল গলিতে বিচরণ করার প্রতিই এঁদের প্রবণতা। পূর্বেই বলেছি যে, কেউ নিরীক্ষণ করেছেন সমাজের উচ্চস্তরের মানুষগুলিকে, কেউ উপজীব্য করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনকে, আবার কেউ নেমে এসেছেন সমাজের নিম্নস্তরে যে মানুষগুলি থাকে, তাদের মধ্যে। নানারকম সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনকে কতখানি তিক্ত করে তোলে, কতখানি জটিলতার সৃষ্টি করে, তারই পরিচয় রয়েছে তাঁদের ছোটগল্পগুলিতে।

এইসব মনস্তাত্ত্বিক সমস্যামূলক ছোটগল্পগুলির শিল্পোৎকর্ষ কতখানি বা এগুলি

যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য কিনা, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের আলোচনায় মনে হয় সেটিই প্রধানতম বিচার্য বিষয়।

ছোটগল্পের শিল্পগুণ বিচার প্রসঙ্গে সমালোচকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। ছোটগল্প সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত হচ্ছে—"যে গল্প ছোটও হবে, গল্পও হবে।" কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। কারণ এমন অনেক বিখ্যাত উপন্যাস রয়েছে, যেগুলি আয়তনের দিক থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, গল্পের রসও সেখানে বর্তমান; কিন্তু সেগুলিকে ছোটগল্প না বলে, বলা হয় উপন্যাস।

সমগ্র জীবনের কাহিনীকে রূপায়িত করা ছোটগল্পের কাজ নয়। একটিমাত্র ভাবকে আশ্রয় করেই ছোটগল্পের সৃষ্টি। অর্থাৎ সমগ্র ঘটনা বা সমগ্র চরিত্র নয়—কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রের একটি বিশেষ রূপ বা মানবমনের একটি বিশেষ অনুভূতির প্রকাশেই ছোটগল্পের সার্থকতা। তাই কোন এক সমালোচক ছোটগল্প সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—"Singleness of aim and singleness of effect are therefore the two great canons by which we have to try the value of a short-story as a piece of art।"

ছোটগল্প হবে জীবনের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তের উপর টর্চের আলোকপাত। ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য যতটুকু কথাবস্তুর প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই থাকবে। কোনরকম বাহুল্যের স্থান নেই ছোটগল্পের মধ্যে; সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে দৃঢ়পিনদ্ধ সংহতরূপের রসনিবিড় প্রকাশই ছোটগল্পের ধর্ম। একটিমাত্র ভাববস্তু ছোটগল্পের আত্মা বলে প্রতিদিনের বস্তুসংসারের বৈচিত্র্যকে স্থান দেওয়া যায় এখানে এবং চলমান জীবনের এই রূপকে ধরে রাখার জন্য ছোটগল্পের মত উপযোগী অপর কোন সাহিত্যধারা আছে কিনা সন্দেহ।

বস্তুজগতের ঘটনা গল্পরসে পরিণত হয় ছোটগল্পে। বর্তমান পরিবেশে ব্যক্তির জীবনসংগ্রাম যত তীব্র হয়েছে, তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মানুষের এই সংগ্রাম, তার অন্তর্জীবনের নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তুচ্ছ লঘু কল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে মনোবিকলনতত্ত্বের প্রতি আধুনিক গল্পকাররা যেন একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এই জাতীয় ছোটগল্প কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে তার বিচার করতে হলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া দরকার। শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা ফ্রয়েডের মতবাদকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে, তবেই তাকে প্রয়োগ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে। সেইজন্য সেখানে নিছক বিলাসলীলা বা দেহতত্ত্বের বিকৃত বর্ণনা নেই; তার পরিবর্তে রূপায়িত হয়ে উঠেছে মানবজীবনের গভীর ভাবব্যঞ্জনা। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এই নীতির সার্থক অনুসরণ দেখা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সৃষ্টিপ্রতিভা থাকায় মনস্তত্ত্বকে উপজীব্য করা সত্ত্বেও সাহিত্যরসের অভাব ঘটে নি কোথাও; একটি চিরন্তন মানবিক আবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পগুলি সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখনকার মনস্তত্ত্বমূলক গল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন চিরন্তন জীবনসত্য স্থান পায় নি; সেখানে দেহতত্ত্ব আর প্রবৃত্তির অকুণ্ঠ বর্ণনারই প্রাধান্য। কিন্তু বস্তুজীবনে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটছে, তার যথাযথ প্রতিফলন সাহিত্যের ধর্ম নয়। কারণ সাহিত্যিক প্রচারক নন, তাঁর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা। বস্তুজগতের ঘটনা শিল্পজগতে এসে সাহিত্যিকের মার্জিত কল্পনার দ্বারা পরিস্কৃত হয়ে সাহিত্যে স্থান পায় এবং সেই শিল্পকর্মই যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য। কিন্তু এই রুচিসম্পন্ন চিন্তাধারার অভাব ঘটেছে আধুনিক ছোটগল্পকারদের মধ্যে। ডি. এইচ. লরেন্স, জেম্‌স্ জয়েস্, বা সমারসেট মম্ যে মনস্তত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশিষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন, সেই মনস্তত্ত্বকেই উপজীব্য করতে গিয়ে আধুনিক বাঙালী ছোটগল্পলেখকরা বিকৃত, অসুস্থ চিন্তার চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁদের রচনায়। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পরিবর্তে সেখানে রূপায়িত হয়েছে স্থূল বর্ণনা। এলিয়টের ভাষায় 'some human impulse'-এর অভাব তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে। জয়েস্, লরেন্স, মম্ প্রভৃতি লেখকদের গল্পে অনেক আপাতস্থূল উপাদান আছে, কিন্তু এই 'some human impulse'-এর উপস্থিতি তাঁদের রচনাকে শালীন সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করেছে। সাহিত্য যে উপাদানের রূপান্তর, একথা আধুনিক বাংলা গল্পকাররা অনেক সময়ে বিস্মৃত হন।

আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়। বর্তমানে ছোটগল্প প্রধানতঃ বিশ্লেষণমূলক হওয়ায় গল্পরসেরও অভাব ঘটেছে সেখানে। ছোটগল্পের এই ত্রুটি সম্পর্কে মন্তব্য করে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিষয়বস্তুটি সাহিত্যরসসিঞ্চিত না হইয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধির যুযুৎসু ক্রীড়ায় পর্যবসিত হইয়াছে"। লেখকের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সেখানে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা সাহিত্যিকের প্রধান অবলম্বন নয়। বিশ্লেষকের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বেশিদূর চলে না, তার জন্য প্রয়োজন গভীর অনুভূতির এবং সেই অনুভূতিকে রূপদান করার জন্য প্রয়োজন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার। এ যুগের বাংলা ছোটগল্পে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে অভিজ্ঞতা আছে, সেখানে লেখক অতিমাত্রায় বিশ্লেষণপ্রিয়, আর যেখানে অনুভূতি আছে, সেখানে তিনি অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী। মানুষ হিসেবে মানুষের যে একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, তার পরিচয় পাই না এইসব ছোটগল্পে। কোন এক সমালোচক এই জাতীয় রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন—"কৃষকমাত্রই কেবল ফসলের স্বপ্নে পাগল; শ্রমিকমাত্রই প্রচণ্ড বিপ্লবী; মধ্যবিত্তমাত্রই অবক্ষয়িত—কেউ বিশিষ্ট মানুষ নয়, সবাই এরূপ টাইপ-মানুষ, 'প্রমাণ-সাইজে' মেটেবুরুজের দর্জি-কাটা 'চরিত্র'।" এই শ্রেণীর রচনার একমাত্র কারণ জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব। পরিচয় যত সীমাবদ্ধ, বিশ্বাসের ভিত্তিও তত শিথিল।

ইংরাজীতে যাকে বলে 'vicarious experience'—সেই 'experience'কে অনুভব করার ক্ষমতার যেন অভাব হয়েছে আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে। তাই একটা দোলাচল চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁদের রচনায়।

এই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আধুনিক লেখকরা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন কলানৈপুণ্যের সাহায্যে। নানা ধরনের শব্দবিন্যাস, ভাষার সুকৌশল প্রয়োগ,—সব মিলিয়ে 'টেকনিকে'র দিক থেকে একটা চমক সৃষ্টির প্রয়াস তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে কোন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপায়ণপদ্ধতি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিবদ্ধ—একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে বড় করে দেখানোর প্রচেষ্টা সাহিত্যিকের ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। যেখানে জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর, সেখানে কথাবস্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে; টেকনিকের কৃত্রিমতা আর সেখানে কৃত্রিমতা থাকে না। আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই পাশ্চাত্য ছোটগল্পের আঙ্গিকের কলাকৌশল আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু দূরগামী দৃষ্টির অভাবে তাঁদের লেখা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে নি। গল্পের সাময়িক আবেদনই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

জনপ্রিয়তা অর্জন আধুনিক বহু লেখকদের প্রধানতম লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ফলেই যে বাংলা ছোটগল্প এরকম অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে, এ কথা সহজেই অনুমেয়। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, সেই নিষ্ঠার পরিবর্তে পাঠকের মনোরঞ্জন করার কলাকৌশলকে আয়ত্ত করার প্রতি তাঁরা অধিকতর মনোযোগী। তবে সেজন্য বাংলা ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে হতাশ হওয়া যায় না। কারণ কয়েকজন জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতি দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখলেও, সকলে সে পর্যায়ভুক্ত নন। অসংখ্য বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে কিছু উৎকৃষ্ট গল্প খুঁজে পাওয়া যায় এবং সেগুলি রুচিসম্পন্ন চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। সেই গল্পগুলিই প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

তুষারমরুর দেশে

রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[১]—তৃতীয় বর্ষ, কলা

হিমালয় থেকে রাস্তা নেমে গেছে এঁকেবেঁকে সর্পিল গতিতে, নেপালের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে তার পাইন, দেবদারু আর ঝাউগাছের সারি, মাঝখানে অসমতল পাহাড়ী পথ এসে মিশেছে ভারতের সীমান্তে। সীমান্ত প্রদেশের এ পথ বড় বিপজ্জনক; হিমালয়ের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে কত দস্যুতস্করের দল, নির্জনে নিঃসঙ্গ পথচারী দেখলে তাকে ঘায়েল করে তার অর্থসম্পত্তি লুঠের বহু ঘটনা এখানে ঘটে গেছে। দু'পাশের ঝোপঝাড় অতিক্রম করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে সামরিক বাহিনীর পঁচিশটি জীপ। আরোহীদের প্রত্যেকের হাতে টোটাভরা রাইফেল, পরনে পর্বতারোহীর পোশাক। কাবরু পর্বতশৃঙ্গ (২৪,০০০ ফিট) জয় করে তারা ফিরছে নিজের দেশে, ভারতবর্ষে। পাহাড়ী পথের একটা বিপজ্জনক বাঁক ঘুরে গাড়ী এগিয়ে চলে···দু'পাশের গভীর অরণ্যানী দূর হ'তে দূরতর, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে শেষে মিলিয়ে যায়···মাউথ-অর্গানের সুরের সাথে নৃত্যের তালে তালে মেতে উঠি সবাই। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর অবসরবিলাসী মনটা আজ মেতে উঠেছে উৎসবের আনন্দে···। হিমালয়কে বিদায় জানাবার প্রাক্‌কালে স্মরণে আসে দুর্গম পার্বত্য অভিযানের কাহিনী। মনে পড়ে···কেমন করে এতটা পথ এলাম আমি ঘুরে, কত জনহীন মরু-প্রান্তর, কত ফেলে-আসা গ্রাম ও নগর ভাসছে আমার মনে। ···দীর্ঘ দিন ধরে কত পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে, কত নদী-নির্ঝরিণী পেরিয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, কত দেশ হ'তে দেশান্তরে—কখনও নেপালের পার্বত্য পথে, তিব্বতের হিমমণ্ডিত অধিত্যকায়, কখনও আবার সিকিমের পথে-প্রান্তরে কিসের এক উন্মত্ত নেশায় ছুটে বেড়িয়েছি। এই পরিচিত জগৎ ও জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে ছুটেছি দূরে, বহু দূরে—নীল আকাশের সানুদেশে সে এক তুষারমরুর দেশ, বরফ যেথায় হয় না কভু শেষ···।

হিমালয়ের ডাক

ভারতবর্ষের উত্তরে বিরাট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী হিমালয়। সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটেছে হিমালয়ের বুকে। বহু যুগ ধরে সে অনুভব করেছে পর্বতের প্রতি তার আকর্ষণ। পর্বতের প্রতিটি অলঙ্ঘিত শিখর

---

১ ওয়ারেন্ট অফিসার রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে পর্বতারোহণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মনোনীত শ্রেষ্ঠ ছ'জন ক্যাডেটের মধ্যে অন্যতম। শ্রীমুখোপাধ্যায় এভারেস্টবিজয়ী তেনজিং শেরপার পরিচালনাধীনে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীতে কাবরু পর্বতশৃঙ্গে (২৪,০০০ ফিট) আরোহণ করেন এবং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

যেন তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, তার সাহস ও কৌশল পরীক্ষার জন্য সে যেন পাঠায় বারতা! মানুষ সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি, জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে সে এগিয়ে গেছে জয়লাভের জন্য। তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গগুলি বহু সাহসী আত্মার উপর তাদের মায়া বিস্তার করেছে, মানুষকে উন্মাদ করে টেনে নিয়ে গেছে তার বুকে···এই সমস্ত তুষার-প্রাচীরের অন্তরালে বহু বীরের দেহ সমাহিত হয়ে আছে। কিন্তু ব্যর্থতা মানুষকে করতে পারে নি হতোদ্যম, অসাফল্য তাকে করে নি নীরব ; করেছে উৎসাহী, করেছে দুঃসাহসী। 'দুর্গম তুষার গিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায় অশ্রুত যে গান গায়' মানুষের অন্তঃকর্ণে লেগেছে সে সুরের মূর্ছনা—দলে দলে কত অভিযাত্রী পাড়ি দিয়েছে সেই শৈলশিখরের উদ্দেশ্যে। মানুষের এই প্রচেষ্টা আর উদ্যম কিন্তু ব্যর্থ হয় নি। সমস্ত পৃথিবী আর প্রকৃতিকে অবাক করে দিয়ে মানব-সভ্যতা আর একধাপ এগিয়ে গেল বিজয়ীর সম্মান নিয়ে—১৯৫৩ সালের ঊনত্রিশে মে, যেদিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মানুষের পদানত হ'ল। এতকাল যে অভ্রভেদী এভারেস্ট উন্নত মস্তকে বলতে পেরেছিলো 'চির উন্নত মম শির', আজ সে লুণ্ঠিত হ'ল মানুষের পদতলে—

"দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে !·····
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক"।

বিশ্ব-মানব যেন এক উন্মাদনায় নেচে উঠলো, নতুন করে অনুভব করলো পর্বতের প্রতি তার আকর্ষণ।

পর্বতারোহণ শিক্ষালয়

দেশে দেশে গড়ে উঠলো পর্বতারোহণ শিক্ষালয়। ভারতবর্ষে সৃষ্টি হ'ল হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌ষ্টিটিউট। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তার সভাপতি, পশ্চিম বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সহঃ সভাপতি। ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রথম ও স্রষ্টা অধ্যক্ষ হলেন পর্বতারোহণে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার স্বর্গীয় মেজর এন. ডি. জয়াল আর এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং শেরপা তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ও পরিচালক। এর উদ্দেশ্য হ'ল পাহাড়কে জানতে শেখা, ভালবাসতে শেখা, আর আমাদের দেশের তরুণদের সত্যিকারের পাহাড়-চড়ার তালিম দেওয়া। এখানে শিক্ষার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন শিক্ষা, শাসন, সামরিক ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে আসেন বিশিষ্ট অধ্যাপকরা আর ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর থেকে প্রতিবারে ছ-সাত জন শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটকে মনোনীত করা হয় এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য। এইভাবে সমগ্র দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চিনবার আর অজেয়কে জয় করার বাসনাকে জাগিয়ে তোলা হয়। প্রাত্যহিক জীবনের গণ্ডী যত

সুখের হোক, যতই আরামের হোক, তবু সে সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র-পরিসর। গতিবেগহীন জীবনের এই স্থাণুত্বের মধ্যে মানবিক সত্তার বিকাশের অবকাশ নেই, নেই বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ, সেই বিপুল সুদূরকে আস্বাদনের আনন্দ। সেই অখণ্ড জীবনের সঙ্গে পরিচয় এখানকার শিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়।

যাত্রার প্রাক্‌কালে

গাড়ীর ঝাঁকানির সঙ্গে মনও নেচে ওঠে···জীবনের এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী 'স্মৃতির দুয়ার খুলে মন করে চঞ্চল'। আজ থেকে দেড় মাস আগে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের প্রতিনিধি হয়ে আমি এসেছিলাম দার্জিলিঙে—হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটে। পর্বত আরোহণ-শিক্ষার স্থায়িত্ব ছ' সপ্তাহ। এই সংক্ষিপ্ত সময়কে শিক্ষার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম সপ্তাহ দার্জিলিঙে, কিছু পরিমাণে Theoretical এবং Practical training হয়। তারপর চার সপ্তাহ কাটে কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে—এইখানেই হয় সত্যিকারের বাস্তব শিক্ষা এবং শেষ এক সপ্তাহ দার্জিলিঙে পরিপূর্ণ বিশ্রাম। প্রয়োজনমত কার্যসূচী পরিবর্তনও করা হয়। আমাদের প্রথম চৌদ্দদিনই কেটেছিলো দার্জিলিঙে। এই সময় আমাদের ক্লাস হয়েছিলো High altitude Botany, High altitude Geology, Star navigation, Map reading, Glaciers, Crevasse প্রভৃতি বিষয়ে। প্রত্যুষে ঘণ্টা দুয়েক করে পর্বত আরোহণের বাস্তব শিক্ষা হ'ত। তা ছাড়া সমস্ত দার্জিলিং সহর টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর রঙীন কল্পনায় মশগুল থেকে সময় কেটে যেতো। এদিকে অভিযানের দিন ঘনিয়ে এলো। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি, মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। একদিন রাজভবনে আমাদের নিমন্ত্রণ হ'ল। ইন্‌ষ্টিটিউটের গাড়ী নিয়ে অধ্যক্ষ মেজর জয়াল এলেন আমাদের নিয়ে যেতে। রাজভবনের দ্বারে পৌঁছাতেই প্রতীক্ষারত এ-ডি-সি সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানালেন আমাদের অধ্যক্ষকে; অভিবাদন জানালো পাহারারত দেহরক্ষীদল তাদের চক্‌চকে সঙ্গীন লাগানো রাইফেল দিয়ে। তারপর আমরা এসে পৌঁছালাম রাজভবনের অন্দরমহলে। এ-ডি-সি জানান রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু আসছেন। অভ্যর্থনারত অফিসার কৃত্রিম মধুর কণ্ঠে বারবার সম্ভাষণ জানান, কখনও সোনার সিগারেট-কেস এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'Do you smoke?' কখনও করমর্দন করে প্রশ্ন করেন, 'Happy?' প্রত্যেকবারই আমরা হাত তুলে একটা ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে বলি—'Thanks'—ধন্যবাদ। একটু পরে এলেন রাজ্যপাল। প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে খানিকক্ষণ ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় করেন। তারপর আলোচনা করেন পর্বতারোহণ শিক্ষার উদ্দেশ্য, ফল এবং শিক্ষার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি

সম্বন্ধে। সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজন রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সমাধা হয়। রাজ্যপালের সঙ্গে আমাদের কয়েকটি আলোকচিত্র গৃহীত হয়। অভিযানে যাত্রার প্রাক্‌কালে আমাদের বিদায়-সংবর্ধনার আয়োজন এখানেই শেষ হয় নি। যাত্রার ঠিক আগের দিন ইউরোপীয়ানদের জীমখানা ক্লাবে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। জীমখানা ক্লাবের বিরাট আঙিনায় প্রবেশ করার পর থেকে মেপে চলা আর মেপে কথা বলার এক অপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের বিদায়সংবর্ধনা শেষ হয়।

যাত্রাপথে

সেদিন হ'ল ৬ই মে, সকাল ন'টা। আমরা তখন পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বোঝা ঘাড়ে ক'রে যাত্রা করলাম অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং থেকে সোজাসুজি আমরা মাইল পনের অবতরণ করলাম। ক্রমাগত চলার ফলে পা হয়ে ওঠে ক্ষত-বিক্ষত। অবশেষে এসে পৌছালাম সিমলা বাজারে। ভারত আর সিকিমের সীমারেখা এখানে। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ধূ-ধূ করছে বালি···কোথাও পাথরের নুড়ি···বড় বড় পাথরের চাঁই, তারই পাশে বয়ে চলেছে এক স্রোতস্বিনী ঝরনা। পাথরের নুড়ির উপর সঙ্গীতরত ঝরনা তার অবিশ্রান্ত গতির এক অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি করে। ঝরনার মিষ্টি গান মন থেকে সমস্ত অবসাদ আর ক্লান্তি দূর করে। সেদিনের মত ঝরনার পাশেই আমাদের ছাউনি পড়লো। ছোট ছোট তাঁবুতে দুজন করে থাকার নিয়ম। জলের শব্দ, দুপুরবেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ ঝাঁ, দূরে পাহাড়ের উপর থেকে গাঙ্গচিলের চিঁই করে ডাক, সবসুদ্ধ মিলে কেমন একটা স্বপ্নাবিষ্ট ভাব, একটা গৃহবিবাগী উদাস মনোভাবের সৃষ্টি করে। এদিকে অপরাহ্ণ শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সূর্য ক্রমে রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিছুদূরে নদীর কোল ঘেঁষে চলে গেছে পাহাড়ের সারি। ছোট নদী এঁকেবেঁকে খুব অল্প দূরেই, দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মুমূর্ষুর হাসির মত তখনও লেগে থাকে নদীর বুকে, তারপর মিলিয়ে যায় সব। বিরাট প্রান্তর জুড়ে নেমে আসে প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা। রাত্রিতে তাঁবুতে বসে শুনি ঝরনার কলধ্বনি। ক্ষীণালোক-দীপ্ত বিরাট পর্বতশ্রেণী আর এই প্রস্তরময় প্রান্তর বড় ভয়ঙ্কর দেখায়। মনে হয় যেন আমরা কোন যাযাবর বা বেদুইনের দল; মরুভূমির পর মরুভূমি পেরিয়ে চলেছি দূরে বহুদূরে এক স্বপ্নময় দেশে।

সিকিম অভিমুখে

রাত কাটে, ভোর হয়। সকাল চারটায় বিউগিল ধ্বনির সাথে সাথে জেগে ওঠে অভিযাত্রীদল। তারপর বোঝা কাঁধে নিয়ে আবার সুরু হয় চলা। চলার আর শেষ

নেই, চলেছি তো চলেছিই। কত অরণ্য, কত মাঠ, কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলেছে অভিযাত্রীদল। কখনো খাড়া পার্বত্য পথে……কখনও প্রস্তরগাত্রে সাপের মত পাকে পাকে উঠে চলেছি, কখনও বা নেমে আসছি সমতলভূমিতে। সিকিম আর ভারতের মাঝখানে সীমারেখাস্বরূপ হিমালয়ের বরফগলা জলের যে নির্ঝরিণীটি বয়ে চলেছে, তার উপর দোদুল্যমান এক পুল পেরিয়ে ধরলাম সিকিমের পাহাড়ী পথ। সিকিমের প্রান্তদেশে যে কর্তব্যময় রক্ষী ছিল সে এগিয়ে এলো বাধা দিতে। অনুমতি-পত্র প্রদর্শন করে প্রথম পদক্ষেপ করলাম সিকিমের অভ্যন্তরে। সিকিম যেন একটা প্রস্তরময় মরুভূমি। চারিদিকে ধূ-ধূ করছে পাথর। কোথায়ও নেই একটু শ্যামলিমা, একটুখানি সবুজ ঘাসের স্পর্শ! বহু পথ অতিক্রম করে অভিযাত্রীদল হয়ে পড়ে শ্রান্ত,…পা আর চলে না, মন আর টলে না, দেহ যেন নড়ে না। হঠাৎ দেখা যায় পাষাণের বুক ফেটে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বনস্পতি, তারই পাশে তর্‌তর্‌ করে বয়ে চলেছে কলহাস্য-মুখরিত এক ঝরনা। হিমালয়ের বরফ গলে তার সৃষ্টি, হিমের পরশে তার পুষ্টি, পাথর কেটে, পাহাড় ভেঙ্গে নিজেই সে তার চলার পথ করে নিয়েছে। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিই সেই ছায়াশীতল স্থানটিতে। মধ্যাহ্নের এই অলস মুহূর্তটিতে কর্মক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দেই নরম ঘাসের কোলে। বিরাট হিমালয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে…একদিকে তার চিরতুষারাবৃত মৌলিমালা, আর একদিকে তার অরণ্যরাজিতে ভরা…মাঝে মাঝে দু-একটা পাহাড়ী কুটির। যতদূর যায় দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিলাম।…বিশাল হিমালয়, তার আরম্ভও নেই, শেষও নেই…দূরে অরণ্যে-ঢাকা পর্বতগাত্রে অপরাহ্নের ম্লান আলো পড়ে সবুজ মখমলের মত চিক্‌চিক্‌ করছে আর এক চূড়ায় লেগে রয়েছে তুলোর মত নরম ভিজে মেঘ, আলো পড়ে হয়ে উঠেছে রৌপ্যশুভ্র।

দিনের পর দিন গত হয়, রাতের পর রাত। সিকিমের পাহাড়ী বনপথে, কখনো ছায়া-ঢাকা গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে অভিযাত্রীদল। দু'ধারে বাঁশবনের সারি, এপাশে ওপাশে কতরকমের লতা। বর্ষাসতেজ ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় রোদ্দুর প'ড়ে চিক্‌মিক্‌ করে, রডোডেনড্রন্‌ বৃক্ষের সারি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘনবনের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে কোন্‌ অজানা পাখী ডেকে ওঠে। কি বিচিত্র! কি অদ্ভুত! পাখী গান গায়, পাতা ঝুর্‌ঝুর্‌ করে ঝরে—সে যেন স্বপ্ন। দূর থেকে দেখা যায় সরু ন্যাকড়ার ফালির মত দীর্ঘ ছিন্নভিন্ন কতকগুলি পতাকা উড়ছে। হিজিবিজি কি সব তাতে লেখা। সিকিমী লামাদের এই পতাকাগুলি যখন ফুর্‌ফুর্‌ করে উড়তে থাকে, দূর থেকে মনে হয় যেন 'ফুলে ফুলে কাশবন সাদা'। চলতে চলতে পা আসে ভেঙ্গে, শরীর বলে আর যে পারি না, মন বলে, 'ও কিছু নয়, এগিয়ে চলো'। এগিয়ে তো চলি, কিন্তু কোথায়, কত দূরে? এইভাবে একাদিক্রমে পাঁচদিন চলার পর ধরি তিব্বতের পথ।

রাজভবনে সংবর্ধনা

রাজ্যপালের ডান পাশে কালো কোট-পরিহিত লেখক

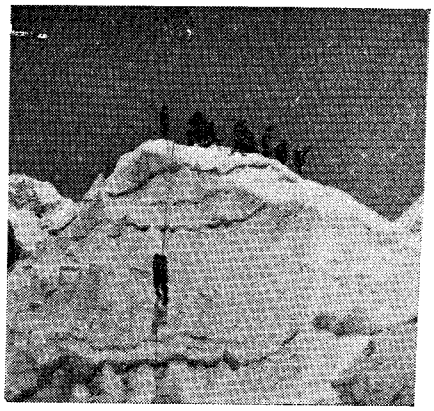

তুষারশৃঙ্গে আরোহণ—২৪,০০০ ফিট উপরে

দড়ির সাহায্যে তুষারশৃঙ্গ থেকে অবতরণ

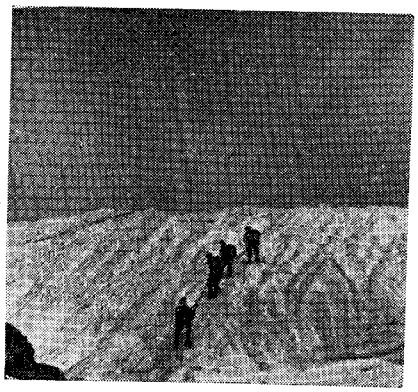

হিমবাহের উপরে—২১,০০০ ফিট উপরে

চলার পথে বিশ্রাম—২১,০০০ ফিট উপরে

স্বপ্নময় তিব্বতে

ভোর তখন চারটা। পৃথিবী তখনও জেগে ওঠে নি, পূবের আকাশটা সবে রক্তিম। তাঁবু খাটিয়ে, জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা তখন চলতে শুরু করেছি। ধীরে ধীরে নির্মেঘ আকাশে সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়, শালতরুর কোমল শ্যামল পল্লবদল শিশিরার্দ্র বাতাসে মৃদু প্রকম্পিত হয়, বৌদ্ধমান (মন্দির) থেকে ভেসে আসে তিব্বতী লামার ভক্তিনম্র কণ্ঠের প্রভাতী আরাধনার সুর, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" তিব্বত অতিক্রম করে অবশেষে আবার আসি সিকিমে। সিকিমের শেষ লোকালয় হল ইয়কসুমে। রাত্তিরে হয় ক্যাম্প-ফায়ার বা অগ্নি-সভা। আগুন জ্বালিয়ে তার চারিধারে ব'সে নৃত্য-গীতের আসর। মাউথ-অর্গানের তালে তালে নৃত্য ওঠে জমে। অফিসার, ইন্‌স্ট্রাক্টর, ক্যাডেট সবাই নাচে, তালে তালে ঠুকে আমরা বলি কেয়াবৎ কেয়াবৎ। সারাদিনের অবিরাম পরিশ্রমের পর উপবাসী মনের এই ছিল সবচেয়ে বড় আনন্দের খোরাক।

ইয়কসুমের পর দারুণ নোংরা জায়গা। বড় জোঁকের উৎপাত, মশা ও একরকম বিশ্রী পোকার আক্রমণে মুখচোখ ফুলে ওঠে। তার উপর সাপ, হায়না ও নানারকম হিংস্র জন্তুর উৎপাত। দশ হাজার ফিটের উপর জনমানবহীন পর্বতচূড়ার এই গহন অরণ্যে কারুকে বাঘে নিয়ে গেলে বা সাপে খেলে তার চীৎকার কারুর কানে পৌঁছাবে না। তের হাজার ফিটের উপর বরফ পড়তে শুরু করলো। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হতে লাগলো।

রণবীর কর্নেল পুরীর সমাধিতলে

চোদ্দ হাজার ফিটের উপর প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে রণবীর কর্নেল পুরী নীরব সমাধি-মগ্ন। পুরী ছিলেন সামরিক বিভাগের মহাসমর-বিজয়ী এক সেনানী। ভারতীয় সেনাবিভাগের তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ কর্নেল। পর্বতারোহণ শিক্ষালয়ের অষ্টম অভিযানে তিনি সেনাবিভাগের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রচণ্ড তুষারপাত এবং শৈত্যের ফলে এখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়েও বিজয়ী বীর বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন, মুহূর্তের জন্যও নিজের অক্ষমতা বা দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। অভ্রভেদী শৈলশিখর তাঁকে যে আহ্বান জানিয়েছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তা তিনি রক্ষা করেছেন। 'দিনের আলো নিবে এলো, সুয্যি ডোবে ডোবে'.....বিরাট আকাশের কোন আদি-অন্ত নেই, জনহীন পর্বতশৃঙ্গ দিগ্-দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা-হা করছে, গোধূলির বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে চারিদিক কেমন বিষাদময় হয়ে উঠেছে। মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে, ম্লান নেত্রে অভিযাত্রীদল এসে দাঁড়ায় সমাধির পাশে। দিন-শেষের শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে আমরা প্রণতি জানাই এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রীকে। সবাকার মুখ ছিল নির্বাক, মন ছিল ভার।

কেন্দ্রীয় শিবির

সেদিনই আমরা এসে পৌছাই পনের হাজার ফিট উপরে—Base camp-এ। সেদিন ছিল সবচেয়ে দুর্গম পথ, কেবল চড়াই। প্রায় কুড়ি মাইল পর্বতারোহণের পর Base camp-এর নির্দিষ্ট জায়গার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। টিপ্‌টিপ্ করে তুষারপাত হচ্ছে, সকলের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। Altitude sickness-এ প্রায় সবাই আক্রান্ত। কারুর মাথা ঘুরছে, কারুর হচ্ছে বমি, কেউ হতাশ, কেউ উদ্যমহীন। পনের হাজার ফিট উপরে সেই নিস্তব্ধ গিরি-প্রান্তরে সমতলের মানুষরা যেন তাদের সহজাত চেতনা হারিয়ে ফেলে উন্মাদ হয়ে উঠলো। কেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করেছে, কেউ দু'হাতে বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ বা ক্ষোভে, হতাশায় চুল ছিঁড়ছে।……কেমন একটা অবসাদ-বিজড়িত বমি-বমি ভাব। অক্সিজেনের বড় অভাব। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, প্রতি পদে হাঁপিয়ে উঠি। এইখানে আমাদের সত্যিকারের শিক্ষা-শিবির। আশেপাশে বিরাট পাথরের চাঁই, চারিদিকে পাহাড় আর একপাশে দেখা যাচ্ছে অনেক তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ—আজও তাদের অনেকে অজেয়। কয়েকদিন এই পাথর আর বরফের রাজ্যে চলাফেরার বাস্তব শিক্ষা হবে—কেমন করে বরফ আর পাথরের উপর চড়তে হয়, কেমন করে নামতে হয়, আত্মরক্ষা ও বিপদাপন্নকে রক্ষা, তুষার-প্রাচীরের উপর চলাফেরার বিভিন্ন পদ্ধতি, কারুকে দড়ির সাহায্যে টেনে তোলা এবং দড়ির বিভিন্ন রকম ব্যবহার, Crevasse, Glaciersকে চেনা, তার থেকে আত্মরক্ষার কৌশল—এইসবের বাস্তব শিক্ষা সর্বাগ্রে এইখানে হ'ল। পর্বতারোহণের এই সমস্ত শিক্ষা এবং পদ্ধতির প্রধান হাতিয়ার ছিল আইস্-এক্স্ (Ice-axe)। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান অস্ত্র যেমন রাইফেল, পর্বতারোহীর বিপদসঙ্কুল অভিযানের পথে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু ও হাতিয়ার তেমনি আইস্-এক্স্ (Ice-axe)। তারপর কাবরু-ডোমের দিকে আমাদের অভিযান সুরু হ'ল। Base camp শুধু পর্বতারোহণ শিক্ষার কেন্দ্রই নয়, খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি সরবরাহেরও কেন্দ্রস্থল।

তুষারমণ্ডিত কাবরু-পথ

কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীতে উচ্চতায় কাঞ্চনজঙ্ঘার পরবর্ত্তী শৃঙ্গ কাবরুডোম (২৪,০০০ ফিট উচ্চতা)। কেন্দ্রীয় শিবির (Base camp) থেকে কাবরুর পথে আর একটি ক্যাম্প হ'ল আঠার হাজার ফিট উপরে, কাবরুর পদতলে—সিকিমের পবিত্র দুধপুকরীর ধারে। পরদিন সকালে আমরা কাবরুর পথে চলতে সুরু করলাম।……এক নতুন জগৎ, নতুন পৃথিবী। অসীম আকাশ জুড়ে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব, একটা প্রশান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করছে। লাজনম্রা পৃথিবী শুভ্র বসনে সজ্জিতা হয়ে তার সঙ্গে মৌন আলাপে রত, যেন "দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী"। চারিদিক বরফে আচ্ছাদিত……বিরাট বরফের

চাঁই, কোথায়ও তুলোর মত নরম বরফ, কোথায়ও লোহার মত শক্ত। পিচ্ছিল পথে বারবার পা পিছলে যায়। কাঁটাওয়ালা বুটজুতো আর Ice-axe-এর সাহায্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি উপরে। নরম বরফে কখনও পা ডোবে হাঁটু পর্যন্ত, কখনও ডুবি কোমর পর্যন্ত। কোথায়ও আছে Glaciers, যেখানে সতর্ক হয়ে না চলতে পারলে প্রতি মুহূর্তে বিপদ। কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে পায়ের তলাকার মাটি হিড়্ হিড়্ করে নেমে আসবে কোন অতল খাদে বা গহ্বরে। কখনও পথে পড়ে Crevasse—বিরাট তুষার-ফাটল, উপরে বরফের কঠিন আচ্ছাদন, নীচে সব ফাঁকা—কেবল বরফ-গলা জল, তার উপর একবার পা পড়লে ডুবে যেতে হবে কোন্ অতলে, নিভৃত এক পাতালপুরীতে। তা ছাড়া হিমালয়ের এই বরফের রাজ্যে দৈত্যের মত মাঝে মাঝে পথ আগলে ধরে বিরাট বিরাট Avalanche। তাদের সামনে কেউ একবার পড়লে তাকে আর জীবন্ত ফিরে যেতে হবে না। রক্ত-মাংস-হাড় সুদ্ধ Avalanche-এর দেহভারে দলিত পিষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাবে সে। হিমালয়ের দুর্গম পথে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি ও আবহাওয়ার দুর্যোগ সত্ত্বেও সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হল এই Avalanche। তুষারবেষ্টিত পর্বতশৃঙ্গগুলিকে অজেয় করে রাখার এরাই হ'ল সবচেয়ে বড় প্রহরী। হিমালয়ের তুষারশুভ্র পথে অকস্মাৎ কামান গর্জন করে একরাশ বরফের ধূম উদ্গিরণ করে প্রচণ্ড বেগে, রুদ্রের মূর্তিতে এগিয়ে আসছে বিরাট তুষার-পিণ্ড (Avalanche)—এ দৃশ্য আমার চোখে খুব কম পড়ে নি। এ এক অপরূপ মায়াময় দেশ। কেবল সাদা আর সাদা। বিরাট তুষার-শৃঙ্গের দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়, মাথা ঘোরে।

মৃত্যুর মুখোমুখি

হঠাৎ কিসের পতনের শব্দ আমাদের সচকিত করে দেয়। বোধ হয় মৃত্যুরূপী কোন তুষারস্তূপ তার মুক্তপক্ষ বিস্তার করে এগিয়ে আসছে আমাদের গ্রাস করতে। উপর থেকে ইনস্ট্রাক্টর-গাইডের সাবধান-ধ্বনি ঘোষিত হ'ল, "হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।" কিন্তু হায়! পরমুহূর্তেই আমরা ব্যথাহত মনে উপলব্ধি করলাম যে পতনমুখী সেই বস্তুটি কোন তুষারস্তূপ নয়, আমাদেরই সহকর্মী দেবপ্রসাদ সরকার গড়াতে গড়াতে নেমে চলেছে হিমালয়ের কোন এক অতল খাদে। চারপাশের সেই বিরাট তুষার-প্রাচীরের মধ্যে নিজেকে অদ্ভুত অসহায় মনে হয়। যে-ঘটনা অতর্কিতে ঘটে গেল তা যে কোন মুহূর্তে যে কোন অভিযাত্রীর ভাগ্যে ঘটতে পারে। অথচ নিরুপায় নির্মমভাবে সহ্য করতে হয় সেই ভয়ানক দৃশ্য। কিন্তু শীঘ্রই আমরা এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হলাম। আমাদের ওস্তাদ ইনস্ট্রাক্টররা অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে পাকানো নাইলনের দড়ির দুটো প্রান্ত ধরে বাকি সমস্তটা ছুঁড়ে দিল নীচের দিকে এবং ভোজবাজির মত ক্ষিপ্রভাবে সু-নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করলো আমাদের

সহকর্মীকে। ঠিক এরকম দুর্ঘটনা আমার ভাগ্যেও একবার ঘটেছিল। খাড়া পার্বত্য পথে পরস্পরের সঙ্গে দড়িবদ্ধ অবস্থায় চারজনের একটা ছোট্ট দলে আমরা উপরে উঠছিলাম। খাড়া পার্বত্য পথে চলবার এই ছিল পদ্ধতি। আমাদের দলের সামনে থেকে প্রথম বা নেতা ছিল একজন ইনস্ট্রাক্টর, আমি ছিলাম তৃতীয়। কঠিন পিচ্ছিল পথে হঠাৎ পা পিছলে গিয়ে গড়াতে সুরু করলেন দলের চতুর্থজন। ঘটনাটা এত অকস্মাৎ ঘটে গেল যে টাল সামলাতে না পেরে বাকি তিনজনও পা ফসকে গিয়ে হিড়্ হিড়্ করে নেমে চললাম তুষারস্তূপের অন্তরালে। ঠিক কতটা পথ নেমেছিলাম জানি না, ঠিক সজ্ঞানে ছিলাম কিনা স্মরণে নেই, তবে মনে পড়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার প্রাক্‌কালে মানসিক প্রস্তুতির কথা। শেষবারের মত স্মরণে এসেছিল স্নেহের আর প্রীতির যত সম্পর্ক, সম্মুখে দেখেছিলাম এক বিরাট শুভ্রতাকে আমাকে আহ্বান করতে···পৃথিবীটা যেন আমার কাছে হঠাৎ কি অপরূপ রূপে দেখা দিল···পর্বতশিখরগুলি কেমন যেন অট্টহাস্য করে উঠলো···। দীর্ঘ অতীতের বহু পরিবর্তন ও সৃষ্টির নীরব সাক্ষী সমুদ্রস্নাত হিমশীতল হিমালয় তার তৃষ্ণার্ত বক্ষ এগিয়ে দিল আমাদের গ্রহণ করবার জন্য। আশ্চর্য সর্বশক্তিমানের শক্তি! সেই মহাসমাধির সম্মুখে কে যেন আমার গতিরোধ করে দেয়!—বরফের এক অসমান খাঁজে আটকে গিয়ে আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি, ইতিমধ্যে আমাদের ওস্তাদ ইনস্ট্রাক্টরও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, বহু দূরে আমাদের অন্য দলগুলি তখন আমাদের রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট। উপর থেকে পাক খুলতে খুলতে নেমে আসে নাইলনের দড়ি—পর্বতারোহণে বিপদাপন্নকে রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার। তারই উপর হাতপায়ের ভর দিয়ে টেনেহেঁচড়ে যখন উপরে উঠে এলাম, দেহ তখন ক্ষত-বিক্ষত, প্রায় জ্ঞানহীন। উপরে তখন সুরু হয়েছে উৎসবের সাড়া, আলিঙ্গনের আতিশয্য আর আনন্দাশ্রুর বন্যা।

এক বেদনাবিধুর কাহিনী

প্রতি পদে বিপদের সম্মুখীন হয়েও চলবার নেশা যেন আরও বেড়ে যায়। ইনস্ট্রাক্টরদের কাছে গল্প শুনি এই বিপদসঙ্কুল বরফের দেশে কবে একদল সুইস্ অভিযাত্রী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে 'Snow-bite'-এ ক্ষত-বিক্ষত পা দেখছিলেন দু'জন অভিযাত্রী। একটু পরে দেখা গেল তাঁদের দেহ নিথর, নিষ্প্রাণ। শৈত্যের ফলে এইভাবে জীবন শেষ হয়েছিল দু'জন অভিযাত্রীর। হিমালয়ের পথে Crevasse আর Glaciers-এর ফাঁদে পড়ে কত প্রাণের স্পন্দন গেছে থেমে, বিরাট পার্বত্য প্রাচীরের অন্তরালে কত বীর শুয়েছে মহানিদ্রায়, কত অশ্রুসজল বেদনাবিধুর নাট্য অভিনীত হয়েছে এই হিমালয়ের বুকে। আজও তাদের হতাশ্বাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কাবরুর বুকে, মর্মরধ্বনি ওঠে পার্বত্য অলিন্দে।

সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে কোথায় আমার মন যে চলে যায়, তা আমিই জানি না। সেই জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের পদতলে কে যেন আমায় স্তব্ধ করে দাঁড় করিয়ে দেয়। সেই অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে আমি আবিষ্কার করি এই নির্জন গিরিশিখর আর আমার অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। পর্বতশ্রেণীর সেই নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে, দিক্‌চক্রবালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে কেমন যেন একটা মায়াময় ভাব অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে। পনের হাজার ফিট উপরে Base camp-এ তাঁবুতে শুয়ে কতদিন নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখেছি। যে কাবরুপথের দুর্গমতাকে ঘিরে কত কল্পনার জাল বুনেছি, আজ অপরাহ্ণবেলায় বহুপ্রতীক্ষিত সেই পর্বতশৃঙ্গের শ্রান্ত দেহে ভীরু পদক্ষেপে, শঙ্কিত হৃদয়ে এসে বললেম, "ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।" সেই নিস্তব্ধ তুষারশুভ্রতার মধ্যে আমরা এসে দাঁড়ালাম দশম কোর্সের শিক্ষার্থিবৃন্দ। এর আগে ন'টি Training course হয়ে গেছে, প্রত্যেকবারই চেষ্টা হয়েছে পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছাবার, কিন্তু চেষ্টা পর্যবসিত হয়েছে ব্যর্থতায়। দশম কোর্সের মুষ্টিমেয় ছাত্রবৃন্দ পরিচালক তেনজিং শেরপার নেতৃত্বে Basic training-এ এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলো—এর আগে পর্বতারোহণ শিক্ষালয়ের কোন ছাত্র এত উপরে ওঠে নি। সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাবার পর সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করেন অভিযানের নায়ক এভারেস্টবিজয়ী তেনজিং। অভিযানসমাপ্তির পর ফিরে এলাম কাবরুর পদতলে।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো, মনটা তখন খুশিতে ভরপুর। আঠার হাজার ফিট উপরে কাবরুডোমের পদতলে, সিকিমের পবিত্র দুধপুকুরীর ধারে তাঁবুতে বসে দেখলাম প্রথম সূর্যোদয়। সকাল বেলার সূর্য তার সাত-রঙা রশ্মিছটা ছড়িয়ে দিল কাবরুডোম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে। সাতটা রঙে নিজেকে বিকশিত করে ঝল্‌মল্ করে ওঠে কাঞ্চন-কন্যা কাবরু, চোখে নেমে আসে প্রশান্তি। সকাল বেলার বরফ-ভেজানো কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দেহে আনলো আনন্দের শিহরণ, মন বললো, 'আমি ধন্য, আমি ধন্য'। অভিযান শেষ করে ফিরে চললাম Base camp-এর দিকে। এখানে পর্বতারোহণের নিয়মকানুন আর কায়দা প্রয়োগের কয়েকটি বাস্তব পরীক্ষার পর শেষ হ'ল আমাদের শিক্ষা। এবার ফিরবো ভারতে নেপালের মধ্য দিয়ে।

অগ্নিসভা

Base camp-এর শেষ রাতটি স্মরণীয়। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রস্তরময় প্রান্তরে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে বসলো অগ্নিসভা। বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সম্ভাষণ জানাতে আয়োজিত হয়েছিল এই উৎসব। এ উৎসবের শঙ্খধ্বনিতে কেউ সাড়া না দিয়ে পারে নি,

যে যেখানে ছিল—রোমান্টিক অভিযাত্রী আর কর্মক্লান্ত কুলী সবাই ছুটে আসে উৎসবের বেদীতলে। সেখানে কেউ এল দিতে, কেউ নিতে। কেউ বা বয়ে আনে নৈবেদ্যের ডালি, কেউ বা তার অন্তরপ্রদীপখানি। এসে জড় হল কিন্তু সবাই—সরল অনাড়ম্বর শেরপা নরনারী, কলেজের তরুণ ছাত্র, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সবাই মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে বললো, 'উৎসব করো, উৎসব করো'। সে উৎসবে না ছিল ঐশ্বর্যের চমক, না ছিল যান্ত্রিকতার সরব ঘোষণা। সেখানে ভূমিকালিপি ছিল না, অতিথি-অভ্যাগত ছিল না, পুরোহিত ছিল না। সবাই শ্রোতা, সবাই বক্তা। যারাই দর্শক, তারাই সক্রিয় কর্মী। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে, কেউ বাজাচ্ছে—এককভাবে নয়, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, দলগত-ভাবে। যৌথমনের সম্মিলিত প্রকাশ সেটা। কিসের প্রকাশ? না, আনন্দের, জীবনের আর যৌবনের।

কেমন করে দিন কাটতো

আমাদের শিক্ষার কঠোরতম অধ্যায় এবার শেষ হল। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই দীর্ঘ দেড় মাস কোন জলস্পর্শ না ঘটা। সাধারণ ব্যবহারের জন্য গরম চা, কফি, কোকো এবং কদাচিৎ গরম জলও পাওয়া যেত। দিনের বেলায় আহার্য স্বরূপ শুকনো খাবার নিজস্ব ঝোলায় থাকতো, রাত্তিরে সাধারণতঃ রান্না-করা বা ঝল্‌সানো খাদ্যের ব্যবস্থা হ'ত। রাত্তিরে আমাদের কর্মক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিতাম ছোট্ট ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে। পাম্প-করা Air-mattress-এর উপর, ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে ঢাকা হাঁসের পালক দিয়ে তৈরী বিরাট বিরাট দু'টি থলের মধ্যে শরীরটা ঢুকিয়ে দিয়ে নাক পর্যন্ত লম্বা 'চেন্' টেনে হত নিদ্রার আরাধনা। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম তাঁবুর উপর পড়েছে পুরু বরফের আস্তরণ। তাই দিনের প্রথম কাজ ছিল সেই তুষার-সমাধি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুষারস্তূপের অপসারণ।

ফিরে যাবার পথের ধারে

সকালবেলায় শেষবারের মত দেখে নিলাম বরফের দেশকে, তারপর আবার সুরু হ'ল যাত্রা। পাথর বেয়ে নেমে চললাম নীচের দিকে। এইভাবে কত পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, কত ঝরনা পিছনে রেখে এগিয়ে চলি সামনে। তখনো লোকালয়ের স্বাক্ষর পাই নি, তৃণলতার সাক্ষাৎও নয়। যতই অবতরণ করি, হিমালয়ের অরণ্যরাজি ততই ঘনীভূত হয়ে দেখা দেয়। প্রথমে দেখি তৃণলতা আর গুল্মদল, তারপরে ছোট ছোট নাম-না-জানা কত রকমের গাছ, বর্ষাসতেজ বনভূমি, চিরহরিৎ অরণ্য-অঞ্চল। সারাদিন চলবার পর একদিন বিকেলে এসে তাঁবু ফেলেছি এক বিরাট বনের পাশে আর একপাশে একটা ছোট্ট নদী কলতান করে বয়ে চলেছে। তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়,

নদীর তরঙ্গ-প্রবাহের উপর আলো পড়ে চিক্‌মিক্ করছে। নদীতীরে বসে দেখছি সে দৃশ্য। এমন সময় পূর্ব দিগন্ত হতে তমালতালীবনরাজিনীলার নীলতম প্রান্ত হতে ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে উপস্থিত হল কালিদাসের মেঘ। উজ্জয়িনীর কথা মনে পড়ে গেল। উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর থেকে মহাকবি কালিদাস যে মেঘকে দেখে বলেছেন বিচ্ছেদকাতর যক্ষের গান উড়ে চললো আকাশে, প্রেমের বারতা নিয়ে শিপ্রাতীরের কুঞ্জবন থেকে সুদূর অলকায় যেখানে তার বিরহিণী প্রিয়া একাকিনী শয্যাপ্রান্তে শায়িতা মুক্ত-কেশে, ম্লান-বেশে, সজল-নয়নে। বহু যুগ পরে আজ সে মেঘকে দেখলাম হিমালয়ের পথে। .....সতৃষ্ণ ধরণীর বুকে নামলো করুণাধারা। বহু দূরের অসীম আকাশ আজ পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়লো, চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চির-বিরহ। বেণু-বনের অন্ধকার থরথর করে কেঁপে উঠলো, মেঘের গুরুগুরু শব্দ নিঃসীম নিস্তব্ধতাকে আরও গভীরভাবে ঘনিয়ে তুললো। বৃষ্টি-পতনের ঝরঝর কলতান বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনলো···। নেপালের গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এসে পৌছাই মাকালু পর্বতের কাছে, ঠিক তারই পিছনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট আর একপাশে রাস্তা চলে গেছে সোজা—রাজধানী কাটমাণ্ডুর দিকে। তখন আকাশ ছিল নির্মেঘ। সেদিন ঊনত্রিশে মে। ১৯৫৩ সালের এই দিনটিতেই এভারেস্ট বিজিত হয়। এই স্মরণীয় দিনটিতেই প্রথম এভারেস্ট দর্শন করলাম বিজয়ী তেনজিঙের পাশে দাঁড়িয়ে, শুনলাম তাঁর এভারেস্ট অভিযানের অপূর্ব কাহিনী। কখনও নেপাল, কখনও সিকিমের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এসে পৌছাই প্রায় ভারতের সীমান্তে। কুড়ি মাইল টাট্টুর পিঠে চড়ে এসে পৌছাই ভারতের দ্বারে। নীচে দেখা যাচ্ছে সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রতীক্ষায়। নেমে আসতেই সহাস্যে অভিনন্দন জানান মেজর এন. ডি. জয়াল (স্বর্গত), আমাদের অধ্যক্ষ। ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর 'Call of Himalayas' বা 'হিমালয়ের ডাক' নাম দিয়ে Documentary film তুললো Mountaineering trainingকে কেন্দ্র করে। পর্বতারোহণ শিক্ষালয়ের একজন শিক্ষার্থীর জীবন কাটে কেমন করে তারই একটা জীবন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে এর মধ্যে। গাড়ী এগোচ্ছে দার্জিলিঙের মধ্যে দিয়ে পিছনে রেখে সিকিম, নেপাল, রহস্যময় তিব্বত আর সাধারণের অগম্য সেই তুষারমরুর দেশ। দীর্ঘ প্রবাসের পর শিক্ষার্থীরা মেতে উঠেছে আনন্দে। বহুদিনের পর আবার দেখা হ'ল ভিড়ের মানুষের সঙ্গে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী চলেছে পাঠে, বাইরে থেকে আসছে নবাগত দেশভ্রমণকারী। পিচ-বাঁধানো মসৃণ পথে হেঁটে চলেছে প্রৌঢ়ের দল। পাহাড়ের গা বেয়ে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে সুসজ্জিত তরুণ-তরুণী। দূরে দেখা যায় ফেলে-আসা পর্বতশৃঙ্গগুলি—যেখানে কেবলই নেমে আসছে তুষারপিণ্ড আর হিমবাহের দল। এক একটি মুহূর্ত কেটে যায়, তাকিয়ে থাকি সেই অপরূপের দিকে। মাঝে মাঝে নিজের

অজান্তেই মন উধাও হয়ে যায় দূর-দূরান্তের দেশে—যেখানে পাহাড়ের মাথায় সোনালী রোদে রূপালী বরফের আস্তরণ, পার্বত্য অলিন্দে ওঠে বরফ-ভেজানো কন্‌কনে হাওয়ার মর্মরধ্বনি আর তুষারপাতের টিপ্‌টিপ্ শব্দ।

.....সে দেশ থেকে বিদায় নিলেম আমি, সে দেশ বহু দূর।

জলপাইগুড়ির বন্য জীবন

সমীর চট্টোপাধ্যায়—প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

দার্জিলিঙ্-এর সীমান্ত প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে সোজা জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ডুয়ার্সের বনভূমি-অঞ্চল। এই বনভূমির কোল বেয়ে নেমে এসেছে তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না, তোরষা, কালজানি ও রায়ডাক নদী। এর তীরে ভিড় করে আছে শাল, শিশু, খয়ের ও আরও নানাপ্রকার গাছ। কোনটি বা উঁচু, কোনটি বা নীচু। যেন পরস্পর এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কে আগে সূর্যের কাছে পৌঁছোবে। কোথাও গাছপালা এত পাতলা যেন মনে হয় সূর্যদেব শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে লতাগুল্মের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। আবার কোথাও দেখা যায় বন অতিশয় ঘন। বনতল সেখানে স্যাঁত্‌সেঁতে। এই বনভূমিতে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে হিংস্র বাঘ, হাতী, ভালুক, শুয়োর ও বিষাক্ত সাপ। এ ছাড়া আছে দু'একটা গণ্ডার। আর অনেক সম্বর।

সরকার কাজের সুবিধের জন্য বনভূমিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি আবার সংরক্ষিত। গরুমারা এরূপ একটি সংরক্ষিত বনখণ্ড। লাটাগুড়ি থেকে একটা রাস্তা গরুমারাতে বনবিভাগের ডাকবাংলোয় এসে মিশে গেছে। পথের দু'পাশে বনানীর ফাঁকে ফাঁকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহ। বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জলঢাকার এক উপনদী। একদিকে একটা Observatory। এখান থেকে নদী প্রায় দেড়শ' ফিট্ নীচে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে Observatory থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন সমগ্র বনভূমি এক অলীক মায়াপুরী। নীচে কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে নদীটি। আর মাঝে মাঝে দু'একটা গণ্ডার, বাঘ, হরিণ আসছে জল খেতে। আবার কখনও দেখা যায় শিকারের লোভে বাঘ বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শান্ত নিরীহ হরিণের উপর। তারপর তাকে কাঁধে ফেলে বিজয়গৌরবে হেলে দুলে চলে যাচ্ছে। কখনও দেখা যায় বড় বড় ময়াল, অজগর বা শঙ্খচূড় সাপ রাস্তার উপর শুয়ে আছে। যেন স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক প্রাণ ভ'রে উপভোগ করছে।

এই বনভূমির মধ্য দিয়ে চার মাইল পূবে এবং পশ্চিমে গেলে পাওয়া যায় পান-বাড়ী, রামসাই, যাদবপুর, বড়দীঘি, বাতাবাড়ি প্রভৃতি লোকালয়। পূবদিকে সাধারণতঃ জলপাইগুড়ির আদিবাসী রাজবংশী ও মেচ আর পশ্চিমদিকে সাঁওতাল, ওঁরাওঁ এবং মুণ্ডাদের বাসস্থান। বনভূমির ধারে ধারে, নদীর তীরে তীরে এদের ছোট ছোট পল্লী। সব সময়ই হিংস্র জন্তুর ভয়। বন্য জন্তুর সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করতে হয় বলে এরাও বুনো হয়ে উঠেছে। কোন কোন রাত্রে হাতীর পাল এসে তাদের শস্যক্ষেত্র দলিত করে অগ্রসর হয়ে যায়। রাতের পর রাত জেগে মশাল জেলে তখন এদের দিতে হয় পাহারা। তাদের একমাত্র অস্ত্র মনের সাহস আর তীরধনুক। এরা ভয় করে না জীবনকে। এরা জানে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। চিত্ত এদের ভাবনাহীন।

নাম-না-জানা পাখীর ডাকে সব সময় ভ'রে আছে জলঢাকা ও তিস্তার বন। যখন সন্ধ্যা নামে, আকাশের বুকে বকের সারি উড়ে যায়। লাটাগুড়ি বনভূমি ধ'রে উত্তর দিকে এগিয়ে এলে পাওয়া যায় গোসাইহাট, খুটিমারী প্রভৃতি বনখণ্ড। দিনেদুপুরে গোসাইহাট ও তার আশেপাশে বাঘের বড় উপদ্রব। কখনও কখনও দেখা যায় কৃষকের গোয়ালঘর থেকেই বাঘ বড় বড় গরু বা মোষকে ধরে অনায়াসে পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে। এর পর ডায়না নদীর তীরভূমি ধরে এগোতে থাকলে পাওয়া যাবে ডায়না বনভূমি। বিষাক্ত বিবিধ সাপ আর হাতী এই বনের বিভীষিকা। প্রতি বছর বনে কাঠ কাটতে আসার আগে বন্য প্রাণীর হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে কুলীরা তাদের প্রথামত বনদেবতাকে পূজো দিয়ে নেয়।

জলপাইগুড়ির উত্তর-পশ্চিমে তিস্তার তীর ধরে, পাহাড়ের গা বেয়ে যে বনভূমি চলে গেছে তার প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম। এখানে আছে প্রচুর কলাগাছ। গাছপালার ডালে ডালে প্রায়ই বসে বানরসভা। অদূরে সাঁওতাল পল্লী। জ্যোৎস্না রাতে তারা বনপ্রকৃতিকে আহ্বান জানায় মাদলের ধিতাং ধিতাং বোলে। মনে হয় এরাই যেন প্রকৃতির প্রকৃত সাধক ; এরাই কবি।

জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্বে লঙ্কাপাড়া চা-বাগিচার প্রায় দু'-তিন মাইল দূরে টোটো জাতির বাস। সভ্যতার আলোক এদের মনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। বনই এদের আপনার, বনই এদের সংসার। বনের সঙ্গে, গাছের সঙ্গে কি গভীর এদের প্রাণের যোগাযোগ। গাছের ডালে বাসা বেঁধে এবং মাটির উপর ছোট ছোট কুটীর নির্মাণ ক'রে গড়ে উঠেছে এক একটা টোটো বস্তি। নিজেদের লজ্জা-নিবারণ বিষয়ে এরা খুব উদাসীন। এ বিষয়ে এরা একেবারেই আদিম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের উন্নয়নকল্পে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

এরও পূবে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে বিস্তৃত রয়েছে রাজাভাতখাওয়ার বনভূমি। উত্তরে সিঞ্চুলা গিরিশৃঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত এই বনভূমি। আজও এর বনপথ ধরে চলতে

চলতে মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে সেই কোচরাজ ও ভোটরাজের প্রীতিভোজের দৃশ্য। তাই সার্থক এর নাম রাজাভাতখাওয়া। একের পর এক ইতিহাসের পাতা চলেছে উল্টে। কত বনভূমি পরিণত হয়েছে জনপদে। কিন্তু রাজাভাতখাওয়ার প্রাচীন বৃক্ষগুলি এখনও অতীতের সাক্ষীরূপে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে এই বনে হাতীর প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যূথপতিদের রাজত্বের এখনও অবসান হয়নি। রাত্রে ট্রেনের আলোয় দেখা যায় দলে দলে হাতীরা লাইন পার হচ্ছে। হাতী ব্যতীত এখানে আছে অসংখ্য সাপ আর বাঘ। বনের আশেপাশে যেসব মুণ্ডা আর সাঁওতালদের বাস, তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে এই সব হিংস্র জন্তু। সমস্ত জীবন সংগ্রামের পর সংগ্রাম, সমস্যার পর সমস্যার সম্মুখীন হ'লেও এদের প্রাণোচ্ছল আনন্দে কখনও ভাঁটা পড়ে না। এক বাটি হাঁড়িয়া ভুলিয়ে দেয় এদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট। এমনই এরা আপনভোলা।

তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁষে চলে গেছে বৈকুণ্ঠপুর বনভূমি। আগে এই বন খুবই গভীর ছিল। এখন অবশ্য বন আর তত ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। এই বনের ভয়াবহতার উল্লেখ পাই "দেবী চৌধুরানী"তে। এই বনই ছিল ভবানী পাঠকের শক্তির মূল উৎস। আজও তাদের স্মৃতি বহন করে চলেছে কয়েকটি মন্দির ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ।

তিস্তা, তোরষা প্রভৃতি নদীগুলির প্রত্যেকটি যেন শাখাপ্রশাখা মেলে বনখণ্ডগুলিকে একটি গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই সব নদী একাধারে সৃষ্টিশীলা ও প্রলয়ঙ্করী। কুমারীর বন্ধনহীন কেশরাশির মত আলুলায়িত তাদের কৃষ্ণ প্রবাহ। বর্ষায় স্ফীত তিস্তা ও তোরষার জলরাশি যখন দুই কূল ছাপিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তখন শত শত নরনারীর চোখের জলের খবর সংবাদপত্রের শিরোনামা হয়।

গিরিতটে যে নদী ছিল শান্ত, ক্ষুদ্র ঝরনা, সমতলক্ষেত্রে সে হয়েছে বিশাল। বড় বড় গাছ বুকে আঁকড়ে ধরে সে ছুটতে থাকে। গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গীকে উপেক্ষা করে সে আপন কাজ করে যায়। শীতকালে সে শীর্ণকায়। কিন্তু বর্ষায় সে বন্য। বন্য এর প্রকৃতি; অবাধ এর গতি; অসংকোচ এর বিচরণ। বন্যের মতই সে নগ্ন ও অশান্ত। সে সরল অথচ দুর্বিনীত ও ভীতিহীন।

বস্তুতঃ, জলপাইগুড়ির প্রত্যেক অণুপরমাণুর সঙ্গেই এক বন্য প্রকৃতি জড়িত হয়ে আছে। বন্য এখানকার জীবন; বন্য এর অধিবাসীদের ভাব, ভাষা, আচার-ব্যবহার। জলপাইগুড়ির পোষ-না-মানা অরণ্য তার সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ রাখুক।

চাকলাদার মশায়ের ফুলবাগান

জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রধান সহকারী

ফুল আমি ভালবাসি। কে না ভালবাসে ফুল? নিজে হাতে জমি কুপিয়ে বাগান করেছি—মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা।

যুগ-যুগান্তর চ'লে গেছে তারপর। দু'-দু'টো মহাযুদ্ধ গেছে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে। দুনিয়ার অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। কত চলেছে হানাহানি, রক্তপাত, ধ্বংসলীলা; কত রাষ্ট্রের হয়েছে ভাঙ্গাগড়া, উত্থান-পতন। কত দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছে, কত দেশ হয়েছে স্বাধীন। বিজ্ঞানের চলেছে নব নব আবিষ্কার—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। অভিনেতার কণ্ঠ সারা দুনিয়া ছুটে বেড়ায় সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে। শব্দকে অনুসরণ করছে দৃশ্য। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে বিলেত ও আমেরিকার ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ দেখছি। মহাকাশে ঘুরছে স্পুটনিক। চন্দ্রলোক কি মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া এখন আর কল্পনাবিলাস নয়। অদূর-ভবিষ্যতে হয়তো আমরা টিকিট কাটব পাড়ি জমাবার।

প্রগতি শুধু বিজ্ঞানেই নয়। প্রগতির কল্যাণে ভাঙ্গন ধরেছে সনাতন সমাজ-ব্যবস্থায়। নারীরাও পর্দা ছিঁড়ে দলে দলে বেরিয়েছে স্কুলে, কলেজে, সিনেমা-রেস্তোরাঁয়, খেলার মাঠে। হেঁশেলের হাতা-বেড়ি, উঠানের ঝাঁটা, পতি-দেবতার পদসেবা ছেড়ে ধরেছে অফিসের কলম, মোটরের ষ্টিয়ারিং, মায় পুলিসের লাঠি।

আমরাও এখন স্বাধীন। স্বাধীনতার মূল্য দিতে কত লোক হারিয়েছে বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষের ভিটে, এমন কি মান, সম্মান, জীবন। কারুর আশ্রয় আকাশের চন্দ্রাতপ-তলে, সরকারী তাঁবুতে, ফুটপাথে, কি শিয়ালদহ স্টেশনে বে-ওয়ারিশ মালের মত। কেউ দিয়েছে পাড়ি আন্দামানে। দণ্ডকারণ্যে যাত্রাও সুরু হ'য়ে গেছে।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি ভাবছেন হয়তো। তা নয়। কালের খরস্রোতে, জীবনের ঘূর্ণিপাকে ভেসে বেড়িয়েছি ঘাটে ঘাটে, দেশ-দেশান্তরে। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি, কোন অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল আমার ফুল! এবার বুঝি ফুল আমার কূল পেয়েছে। তাই এত কথা।

কোথা হ'তে ছিটকে এসে কোথায় পড়েছি। বড় রাস্তার ধারে আমার ছোট বাড়ি। হোক না ছোট, তবু তো নিজের বাড়ি—মাথা গোঁজার পক্ষে যথেষ্ট। নাই বা হ'ল শান-বাঁধানো পুকুর, নাই বা হ'ল ফলের বাগান। ফুলের বাগান তো আছে।

সামনের একফালি জমিতে আমার ফুলবাগান—নিতান্ত অগোছাল, এলোমেলো। কাঁচা হাতের ছাপ আগাগোড়া। ফুলগাছগুলি বেড়ে ওঠে আমারই প্রাণ-ঢালা যত্নে। নিজের হাতে ফুলের চারা বসাই, জমিতে সার দেই, ঘাস বাছি ছুটির দিনে। কারও অপেক্ষা রাখি না।

গাছ বাড়ে, মুকুল ধরে, ফুল ফোটে। ফোটে কত রকমের ফুল—কত বর্ণের, কত গন্ধের—গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে, বসন্তে। বাগান আলো করে থাকে জবা, স্থলপদ্ম, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, কস্‌মস্‌। গন্ধ বিলায় জুঁই, বেলী, শিউলি, গোলাপ, গন্ধরাজ। আবার ফিরে পেয়েছি আমার হারিয়ে-যাওয়া ফুলবাগান। কী আনন্দ আমার!

পাড়ার ছেলে, বুড়ো, বউ, ঝি, গিন্নীরা বেড়াতে এসে তারিফ করে ফুলের। বড় রাস্তায় চলে অগুনতি লোক। কত লোক পথ চলে ফুলের দিকে চেয়ে; কেউ বা দু-দণ্ড দাঁড়ায়। আনন্দ শুধু আমার একলার নয়, অংশীদার অনেক। টাট্‌কা, তাজা ফুল শোভা পায় আমার ফুলদানিতে; প্রিয়জনকে উপহার দেই আমার ফুলে, অর্ঘ্য হ'য়ে লুটিয়ে পড়ে আমার ফুল দেবতার পায়। খুশিতে মনটা ভ'রে ওঠে।

ফুলের নেশায় মশগুল হ'য়ে থাকে মন। ফুল দেখে দেখে আমার সাধ মেটে না। ঘুম থেকে চোখ মেলে সোনালি প্রভাতে দেখি ফুলের হাসি। কর্ম-ক্লান্ত দিনের শেষে চেয়ে থাকি আমারই মত ক্লান্ত ফুলের দিকে। নিঝুম রাতের অন্ধকারে সুইচ টিপে দেখি আধ-জাগা, আধ-ঘুমান, আধ-ফোটা ফুলেদের। জোছনায়, আবছা আলোয় ফুলগুলি কী যেন কানাকানি করে। বর্ষার হিমেল হাওয়ায় দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসে হাসনাহানা আর রজনীগন্ধার সুবাস; ভেসে আসে শরতের শিশির-ভেজা শিউলির গন্ধ।

দুঃখও পাই অনেক। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা লুকিয়ে ফুল ছেঁড়ে। কোনও দিন বা ঘুম থেকে উঠে দেখি চুরি হয়ে গেছে রাশি রাশি ফুল। ফুল শুকিয়ে আসে, ঝরে শিউলি, গোলাপ, ডালিয়ার পাপড়ি। আনন্দ মিলিয়ে যায় বুদ্‌বুদের মত বড় তাড়াতাড়ি। মনের কোণে ব্যথা ঘনিয়ে আসে। ভাবি, 'দুত্তোর, আর নয়।' কিন্তু পারি না। আবার ভাবি জগতের কীই বা চিরস্থায়ী?

বছর ঘুরে আসে। আবার রথের মেলায় ঘুরে, কলেজের মালীর কাছ থেকে চারা নিয়ে আসি। ছুটির দিনে লেগে যাই বাগানের কাজে। ফুলের নেশা মাতিয়ে তোলে মনকে।

শনিবার বিকেলবেলা একটু অবসর পেয়ে ব্যস্ত আছি বাগানের কাজে। ভাই-বোনে এসে হাজির। ছোট ছেলেটা বলে এক জাহাজ লজেন্স চাই তার। বড় মেয়েটার চাই এবার পূজায় হাল-ফ্যাশনের একছড়া নেকলেস্‌; সাথে মানান-সই একটা নাইলনের শাড়ী। গৃহিণীরও আবির্ভাব হয়েছে কোন ফাঁকে। সে এসব চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে।

তবে ঘরকন্নার যা না হ'লে নয়। বলে, 'আর সের দশেক চাল হ'লে মাসটা পাড়ি দিতে পারি।' তিড়িং করে খুরপি হাতে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে ফেললাম—

"বজ্রসম তব বাণী, পড়ে শিরে মম!
দিব আনি, চাল ছাড়া, আর যাহা চাই।"

প্রশ্ন ঃ—'কি গিলিবে গোষ্ঠী তব?'

উত্তর ঃ—'খাও আটা যত পার দিবসে নিশীথে।'

এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

দু' সপ্তাহ পরে। রবিবার সকালে চা-মুড়ি খেয়ে ফুলগাছে জল দিচ্ছি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গৃহিণী আরজি পেশ করলে—

"ছেলেপিলেদের পরীক্ষা সামনে। ওদের পড়ায় মন নেই। মাস্টারের ঘড়ি-ধরা পড়ানোতে আর কতটুকু কি হয়? অকাজে বাগানে সময় নষ্ট না ক'রে মাসখানেক ওদের দেখলে এ যাত্রার মত ওরা পরীক্ষা-সমুদ্রটা পার হ'তে পারে।"

সামনেই আমার সিজন-ফ্লাওয়ারের সময়। বলে কি? দশটা-পাঁচটার ওপর আবার ডেলী প্যাসেঞ্জারী। আমার সময় কোথায়? ছেলেপিলেদের বিদ্যার বহর দেখে মেজাজ তিরিক্ষি হ'য়ে ওঠে—ও পথ মাড়াই না। তা ছাড়া আমার মাস্টারিতে ওরা হয়ে উঠবে লম্বকর্ণ; চোখের জলের মন্দাকিনীতে ভেসে যাবে বইপত্র, খাতা, পেন্সিল; মগজে সৃষ্টি হবে মরুভূমি। পড়াবার জন্য রয়েছে স্কুল-ভরা মাস্টার, বাড়ির মাস্টার। মাসে মাসে মাইনে গুনছি। আবার আমি কেন?

এই তো দু' দিন আগে চালের জটিল সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান ক'রে দিয়েছি। একটা সমস্যার সমাধান হ'তে না হ'তে পাঁচটা নতুন সমস্যা গজায়। নিত্য-নতুন সমস্যার অন্ত নেই! ভুলে থাকতে চাই সব। ফুলের সঙ্গে আমার মিতালি চিরদিনের। কাজ-ভুলানো, মন-ভুলানো ফুলই আমার ভাল।

তাই ফুল আমি ভালবাসি।

সমালোচনা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি-জীবনী—অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত; প্রথম সংস্করণ; ক্যালকাটা বুক হাউস; পৃঃ ৸৵০+৫২+৪৮৯; মূল্য বারো টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় আলোচনা নিতান্ত কম হয়নি। কিন্তু এক হিসাবে বলা যেতে পারে তার প্রায় সবগুলিই খণ্ডিত। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দোবদ্ধ রচনা ও তাঁর তথাকথিত 'কবিপ্রতিভা'! তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন, এ কথাটা তাঁর প্রসঙ্গে উল্লিখিত হ'তে দেখেছি বটে, কিন্তু 'সংবাদ-প্রভাকর' এবং 'সংবাদ-সাধুরঞ্জনের' পৃষ্ঠায় তাঁর যে গদ্যরচনাসম্ভার আত্মগোপন করে রয়েছে তার পুনরুদ্ধার ও মূল্যনিরূপণের চেষ্টায় অতি অল্পসংখ্যক গবেষকই ব্রতী হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকের সক্ষম বাঙলা গদ্যলেখকতালিকায় ঈশ্বর গুপ্তের নাম সংযোজন করতে আজও আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই। কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতি সম্পর্কে শতবিধ উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও একথা জোর করেই বলা যায় যে সমগ্রভাবে তাঁর পদ্যরচনা কাব্যপদবাচ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গদ্যশিল্পী ও সাংবাদিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বৃহত্তর, যদিও দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রচ্ছন্ন থাকার জন্যই সর্বসাধারণের নিকট তার পরিচয় অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুশিক্ষিত বা প্রতিভাশালী না হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র যে সমকালীন সাহিত্যে ও সামাজিক ইতিহাসে নিজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার জন্য দায়ী প্রধানতঃ তৎসম্পাদিত সাময়িকপত্র 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনা। 'সাংবাদিক' ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন মধ্য ঊনিশ শতকের বাঙলা দেশে একটি 'প্রতিষ্ঠান' বিশেষ।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের একটি উল্লেখযোগ্য দান প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের লুপ্তপ্রায় জীবনবৃত্তান্ত এবং অপ্রকাশিত রচনা সংকলন। সংবাদ-প্রভাকরের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর এই বিষয়ক গবেষণা ও সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে স্পষ্টতঃ দু'টি ভাগ আছে। যাঁদের জীবনসংক্রান্ত তথ্য এবং রচনার নিদর্শন ঈশ্বরচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুকে কবিপর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। 'কবিওয়ালা' বা 'কবির গানের গায়ক' বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা কেউ প্রচলিত অর্থে কবি বা কাব্যরচয়িতা নন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলিকাতা সহরে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে যে একপ্রকার লোকরঞ্জক প্রতিযোগিতামূলক গায়ন-পদ্ধতি বহুল-প্রচলিত হয়েছিল তার কুশলী শিল্পিগণই সাধারণতঃ "কবিওয়ালা" নামে পরিচিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতচন্দ্রের জন্ম থেকে ঈশ্বর গুপ্ত-বর্ণিত কবিদের

ইতিহাস আরম্ভ এবং রামনিধি গুপ্তকে (মৃত্যুবৎসর ১৮৩৯) দিয়ে এই ইতিহাস শেষ। কবিওয়ালাদের ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত আরম্ভ করেছেন অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে, রাসু নৃসিংহের জীবনী ও রচনা দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাম বসুর মৃত্যু এবং লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের কাহিনীতে এর উপসংহার। সুতরাং সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্যে বিপ্লবী রূপান্তর ঘটবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দেড়শ' বৎসরের বাঙলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস তাঁর পর্যালোচনার বিষয় ছিল। উল্লিখিত কবি এবং কবিওয়ালাদের জীবনী এবং রচনা ঈশ্বর গুপ্তের কালেই প্রায় দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র এবং রামনিধি গুপ্ত ব্যতীত অন্যদের রচিত পদ বা গানের মুদ্রিত সংস্করণ দূরে থাক, নির্ভরযোগ্য হস্তলিখিত পুঁথিও ছিল না। শিষ্যপরম্পরায় বা সাধারণ লোকের মধ্যে গানগুলি মুখে মুখে ফিরত। এ অবস্থায় পাঠবিকৃতি বা অর্থবিকৃতি অনিবার্য। তাই এটুকু সহজেই বোঝা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র যদি গবেষণা ও পরিশ্রম করে উক্ত রচয়িতাদের জীবনকাহিনী ও রচনা সংগ্রহ না করতেন তা হ'লে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রায় দেড়শ' বৎসরের উপাদান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেত। এই সংগ্রহের কাজে তিনি প্রধানতঃ তিনটি উপায় অবলম্বন করেন; যথা আলোচ্য লেখকের জীবন ও রচনার সঙ্গে জড়িত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় তথ্য আহরণ; সমসাময়িক দলিলপত্রাদি পরীক্ষা; এবং প্রচলিত কিংবদন্তী সংরক্ষণ। অবশ্য তিনি যে সর্বত্র এই কাজে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সাফল্যের পরিমাণ বিপুল। সাহিত্যের এবং সামাজিক ইতিহাসের ছাত্ররা এর জন্য চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। ভারতচন্দ্রসংক্রান্ত রচনাটি ছাড়া সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্রের এই সুদীর্ঘ আলোচনার অন্য কোনও অংশ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের এই বিশেষ যুগটির আলোচনার জন্য উক্ত রচনাটিই এখন পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রধান অবলম্বন। অধুনাদুষ্প্রাপ্য সংবাদ-প্রভাকরের ফাইল থেকে এটিকে উদ্ধার এবং নির্ভরযোগ্যভাবে সম্পাদন ক'রে অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত বাঙালী বিদগ্ধসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বাঙলার মধ্যযুগীয় কাব্যধারার বহিরঙ্গ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ভারতচন্দ্রের হাতে। রামপ্রসাদরচিত গীতিনিচয়ের অকৃত্রিম ব্যাকুলতা, ভাবগভীরতা ও বিশিষ্ট গায়কী, গানগুলিকে সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক মর্যাদায় দীপ্যমান করেছে। রামনিধি গুপ্তের গানের একান্ত পার্থিব ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতি, সহজ কৌতুকরসের সিঞ্চনে এবং একটি বিশিষ্ট আঙ্গিকের আশ্রয়ে বাঙলা গীতিকাব্যের রাজ্যে স্থায়ী আসন দখল করেছে। কিন্তু উপরিউক্ত তিনজনকে বাদ দিলে ঈশ্বর গুপ্ত-আলোচিত অধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। যাঁদের আমরা 'কবিওয়ালা' বলি সমগ্রভাবে (বিচ্ছিন্নভাবে দু'-চারটি গান বাদ দিলে) তাঁদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই, তা লুপ্ত হ'য়ে গেলেও বাঙলা

সাহিত্যের কোনও ক্ষতি হ'ত না। এই দেড়শ' বছরের মধ্যে তিনজন কবির স্বল্পপরিসর সৃষ্টি ছাড়া, বাঙলায় সাহিত্যপদবাচ্য রচনা প্রায় কিছুই নেই। এ যুগের সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের মৌলিক সৃষ্টি কেন হ'ল না তা সহজেই অনুমেয়। নূতন-পুরাতনের সংঘর্ষে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, অথচ নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যে জনসাধারণের চিত্ত তখন দিশাহারা; প্রাচীন মূল্যবোধগুলিকে কোনও ক্রমেই পর্যাপ্ত মনে হচ্ছে না, নূতন মূল্যজ্ঞানের আবির্ভাবেরও কোনও লক্ষণ নেই। জাতির মানসজীবনে গভীর অনিশ্চয়তা ও ব্যর্থতাবোধ প্রকট হ'য়ে উঠেছে। এই পরিবেশে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং কবিওয়ালাদের উদ্ভব। তাই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ প্রাচীন ঐতিহ্যের জের টেনে চললেন; এবং সমাজের চিত্তশূন্যতা ও অনিশ্চয়তার পটভূমিকায় আবির্ভূত হলেন কবিওয়ালার দল। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যধারা অথবা বৈষ্ণব কি শাক্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের যোগ ছিল না। অন্যপক্ষে শিক্ষা ও পরিবেশ হেতু সাহিত্যে নূতন প্রগতিশীল আদর্শ সৃষ্টির ক্ষমতা এঁরা অর্জন করতে পারেননি। তাই এঁদের কণ্ঠকুর্দন দেড়শ' বছর ধরে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্থূল রুচির খোরাক যুগিয়েই নিঃশেষিত হ'ল; প্রাচীন বা নবীন কোনও ধারাতেই এঁরা স্থায়ী সৃষ্টি করতে পারলেন না। কেবলমাত্র ইংরাজী-শিক্ষিত দীর্ঘজীবী রামনিধিকেই সম্ভবতঃ দুই যুগের মধ্যে সেতুস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। কেননা যদিও তাঁর কবিপ্রতিভা নিতান্ত সীমাবদ্ধ, তবু তার মধ্যে এমন দুটি বৈশিষ্ট্য আছে যা ক্ষীণভাবে হ'লেও নবযুগের লক্ষণমণ্ডিত: প্রথমতঃ তাঁর প্রেমসঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে ধর্মপ্রভাবহীন; দ্বিতীয়তঃ তা একান্ত আত্মমগ্ন। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাবেশ বিরল।

বাঙলা সাহিত্যের এমন একটি অধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র আলোচনার জন্য কেন বেছে নিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর জীবনের পরিবেশের মধ্যে। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন না, ইংরাজী বা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। সামান্য বাঙলা লেখাপড়াই তাঁর সম্বল ছিল। সুতরাং রক্ষণশীলতার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকবে সে কিছু বিচিত্র নয়। তার উপর কবিগান, আখড়াই গান প্রভৃতির সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। সহজাত পদ্যরচনা-শক্তির জন্য মাঝে মাঝে কবির দলে বাঁধনদারের কাজ করবার জন্য তাঁর ডাক পড়ত। তাই গোড়া থেকেই মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় তাঁর সাহিত্যিক রুচি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন কবিসঙ্গীতের প্রতি তিনি একটি গভীর মমত্ববোধ অনুভব করতেন। কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরেও তিনি তৎকালীন প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে সক্রিয়ভাবে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন প্রগতিবাদিগণের বৃহত্তম

সংঘ তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তিনি যুক্ত হলেন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি নানা দিক দিয়ে নবজাগৃতির নূতন আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতির পক্ষসমর্থনের মধ্য দিয়ে তাঁর এই পরিবর্তিত মূল্যবোধ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ব্যক্তিগত মানস-বিপ্লবের পরেও সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ধারাগুলির প্রতি প্রীতি ও মমত্ববোধ তিনি বিসর্জন দিতে পারেননি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেও স্বয়ং কবির গানের বাঁধনদারের কাজ করেছেন। নবীন ও প্রাচীনের সংঘাত-জনিত দ্বিধা সে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিজীবনে যেমন বিচিত্র ও সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছিল এমন আর কারও জীবনে নয়। ঈশ্বর গুপ্ত যেন যুগসন্ধিক্ষণের বাঙালীর দোলায়মান চিত্তবৃত্তির প্রতীক। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই আমাদের সাহিত্যে এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের অবসান।

আলোচ্য গ্রন্থখানির সম্পাদনার কাজে অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত যে পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি ও মার্জিত সাহিত্যিক রুচির পরিচয় দিয়েছেন, এক কথায় বলা চলে তা অনন্যসাধারণ। অবতারণা-অংশে ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাঙলা কাব্যধারার বিবর্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ আছে, তা বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগকে সমৃদ্ধ করবে। এ যুগে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি কেন সম্ভব হ'ল না উপরিউক্ত আলোচনার মধ্যে তার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। রামনিধি গুপ্ত সম্পর্কে তাঁর আলোচনা নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। রামনিধিকে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলে স্বীকার করেছেন; তাঁর প্রেমসঙ্গীতের আত্মমগ্নতার মধ্যে নবযুগের 'মানবীয়তা'র আদর্শের ক্ষীণ আভাস দেখতে পেয়েছেন। এ কথা কতকাংশে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। রামনিধি ছিলেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতিতে সুশিক্ষিত। হিন্দী গান বাণীসম্পদে বাঙলা গানের সঙ্গে তুলনীয় না হ'লেও, একান্ত দরিদ্র যে নয় তা যাঁরা মন দিয়ে সে গান শুনেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। নিধুবাবুরচিত গানের অনুরূপ (উৎকর্ষের মাত্রাভেদ অবশ্যই আছে) প্রেমসঙ্গীত হিন্দুস্থানীতে যে একেবারে নেই তা নয়। মনে রাখতে হবে নিধুবাবুর কোনও কোনও গান রবীন্দ্রনাথের যেমন প্রিয় ছিল, তেমনি কিছু কিছু হিন্দুস্থানী প্রেমসঙ্গীতেরও তিনি ভক্ত ছিলেন, যথা "জন ছুঁয়ো মোরি বৈঁয়া নাগরওয়া", "কৈসে কাটোঙ্গি রয়না সো পিয়া বিন" অথবা "বল্‌মারে মোরি চুনরিয়া" (হিন্দুস্থানী গান ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় অনেক গান রচনা করেছেন; সে সবের মূল হিন্দী রচনাগুলির কথা তুলছি না; ব্যক্তিগত-ভাবে যে হিন্দী গানগুলির তিনি অনুরাগী ছিলেন তারই দুই-একটির উল্লেখ করলাম মাত্র)। হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত এই বৈঠকী প্রেমের গানগুলির প্রভাব নিধুবাবুর রচনার উপর কতখানি? আঙ্গিকের দিক থেকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির

নিকট তিনি ঋণী ছিলেন এ কথা আমরা জানি। ভাবসম্পদের ক্ষেত্রেও কি সে ঋণ প্রসারিত হয়েছিল ?

কবিওয়ালাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদকের সূক্ষ্ম ও মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় পেয়ে বড় আনন্দ হ'ল। সম্প্রতি ঐ একই বিষয়ে আরও দু'খানি গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠের সুযোগ হয়েছে।[১] উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়ের সঙ্গে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের আলোচনা-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তের মৌলিক প্রভেদ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত অন্য দু'খানি গ্রন্থে প্রচুর পরিশ্রম সহকারে তথ্য সংগৃহীত হ'লেও গ্রন্থকারদ্বয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা মোটামুটি হ'ল এই : "কবির গান বাঙলা কাব্যসাহিত্যের এক গৌরবময় অধ্যায় ; সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব আকস্মিক নয় ; আধুনিক বাঙলা কাব্যসাহিত্য কবিওয়ালাদের দ্বারা প্রভাবিত, এমন কি আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রধানতম লক্ষণ অন্তর্মুখী ভাবচেতনা কবিওয়ালাগণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।" অর্থাৎ মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত রাম বসু, ভোলা ময়রা ও এণ্টনী ফিরিঙ্গি! ভবতোষ দত্তের পরিপ্রেক্ষিত-চৈতন্য এবং মার্জিত রসবোধ তাঁকে এই জাতীয় শোচনীয় বিচার-বিভ্রাটের হাত থেকে রক্ষা করেছে। কবিগান ও আখড়াই গানের উদ্ভব ও বিবর্তনের সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, যে যুগসন্ধিক্ষণে এর উদ্ভব, তখনকার নিরালম্ব নিরাশ্রয় জনমানসের স্থূল রুচিই এতে প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র ; কদাচিৎ দু-একজন রচয়িতার এক-আধটি গানে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ লাগলেও, সমগ্রভাবে বাঙলা সাহিত্যের এই অধ্যায়টি বন্ধ্যা। এক ক্ষয়িষ্ণু যুগের সাহিত্যসৃষ্টির অভিজ্ঞান হিসাবে সামাজিক ইতিহাসে এগুলির কিছু মূল্য থাকতে পারে, নিজস্ব সাহিত্যিক উৎকর্ষ এদের কিছুই নেই। ঘেঁটুপূজা-মনসামঙ্গল-পাঁচালীর স্তুতি-মুখরিত আমাদের সমালোচনা-জগতে এই জাতীয় সুস্থ ও মার্জিত রসবিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের তা অনেক পরিমাণে আত্মস্থ হ'তে সাহায্য করবে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মানস-বিবর্তনের স্তরগুলির তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা ক'রে সম্পাদক যে তাঁকে নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত এই মানুষটি ঊনবিংশ শতকের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তিনি স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে চুটকি ছড়া লিখেছিলেন সাধারণতঃ তাঁর সম্পর্কে আমরা এইটুকুই জানি। কিন্তু তিনি যে উত্তরকালে ইংরাজী শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতির উৎসাহী সমর্থক হয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট। তা ছাড়া গদ্যরচনায়

১ (ক) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল—প্রাচীন কবিওয়ালার গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

(খ) শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী—ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ, কলিকাতা)

তিনি যে একটি সাবলীল ও মনোরম লিখনশৈলীর অধিকারী ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অনেক ছাত্রেরও তা জানা নেই। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যরচনার এই নিদর্শনটি উদ্ধার ক'রে সম্পাদক তাঁর সাহিত্যকীর্তি আলোচনার নূতন পথ খুলে দিয়েছেন। আশা করি এ গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে গুপ্তকবির জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে গবেষণা অদূরভবিষ্যতে আরম্ভ হ'তে পারবে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়; শান্তি লাইব্রেরী; কলিকাতা-৯।

সমালোচক ওয়ালটার পেটার বলেছিলেন, গদ্যের বাঁশীতে অনেকগুলি রন্ধ্র, তাতে অনেক সুরই বাজে। আমাদের গদ্যের ইতিহাস অনতিদীর্ঘ হলেও বিচিত্র সুর বাজাবার শক্তিকে সে প্রমাণিত করেছে। কঠিন যুক্তিসিদ্ধ রচনা থেকে কল্পনাসমৃদ্ধ রসসৃষ্টি পর্যন্ত সব রকম বক্তব্যকে বহন করবার যোগ্যতা যে বাংলা গদ্যের আছে, আজ আর এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক যুক্তি-আশ্রয়ী প্রবন্ধ, যেমন রচিত হয়েছে আমাদের সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'ও তেমনি এই গদ্যকেই আশ্রয় করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' আর 'বীরবলের হালখাতা' লেখা হয়েছে বাংলা গদ্যেরই বিভিন্ন পর্যায়ে। পর্যায়গুলি সব সময় আলাদা ছিল, এ কথাও বলা চলে না। একই সময়ে একই গদ্যকে অবলম্বন করে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের রচনা।

গদ্যের যে একটা বিশিষ্ট রীতি এবং লক্ষ্য আছে এটা আধুনিক সাহিত্যেই স্বীকৃত হল। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্য ছিল, কিন্তু সে বস্তু আধুনিক গদ্য থেকে মূলতই পৃথক। বাংলা গদ্য ইংরেজি গদ্যরীতিকে অনুসরণ ক'রে গড়ে উঠেছে। আমাদের কাব্যসৃষ্টির একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাব্যরূপের সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিলেও কবিতার রস এবং ধর্ম আমাদের কাছে অভিনব কিছু ছিল না। কিন্তু যদিও মুখে আমরা চিরকালই গদ্যই বলে এসেছি, কিন্তু রচনা করতে গিয়ে আমাদের দুস্তর বাধা উত্তরণ করতে হয়েছিল। কারণ গদ্যরচনার রীতি আমাদের একেবারেই জানা ছিল না। এইজন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর গদ্যের ব্যাকরণগত প্রাথমিক নিয়মগুলি নির্ধারিত করতেই কেটে গিয়েছে। তারপর এল শিল্পকলার সময়। গদ্যের কাঠামো স্থির হলে মনোযোগ হল সেই গদ্যকে কত সুন্দর এবং প্রকাশক্ষম করে তোলা যায় সেই দিকে।

গদ্যের দায়িত্ব অনেক। গদ্যের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে পাঠককে লক্ষ্য ক'রেই নির্দিষ্ট হয়। কাব্যে যেমন কবির ব্যক্তিগত প্রেরণাই প্রধান, তেমনি কতকগুলি সুস্পষ্ট বক্তব্য পাঠককে জানাবার জন্যই গদ্যে লেখক কিছুটা প্রস্তুত হয়ে নেন। সমাজের জটিল আদর্শ-সংঘাত এবং প্রয়োজনের জন্য গদ্যকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হয়েছে। কখনও

বিজ্ঞান, কখনও ধর্ম-দর্শন, কখনও সমাজতত্ত্ব, কখনও ইতিহাস, কখনও কাব্যালোচনা এবং আরও কত বিচিত্র বিষয় গদ্যে গৃহীত হল। স্বভাবতই বিষয়ভেদে এবং লেখকভেদে গদ্যের রূপও পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিচিত্র নির্মাণ-রীতিই গদ্যের শিল্পবিচারের বিষয়। কাব্যসমালোচনার সঙ্গে গদ্যসমালোচনার পার্থক্য আছে। কাব্যসমালোচনার একটি সর্বস্বীকৃত নীতি এই যে ভাবকে বাদ দিয়ে শুধু প্রকাশপদ্ধতির আলোচনা সম্ভব নয়। গদ্য আলোচনাতে বক্তব্যকেও বিচার্য না করলে শিল্পবিচার সম্পূর্ণ হয় না। বিষয়বিন্যাস গদ্য স্টাইলের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কোনো রচনা সংস্কৃত শব্দবহুল কিনা অথবা কোনো রচনা চলতি ইডিয়মকে অনুসরণ করেছে কিনা—মাত্র এইটুকু বললেই গদ্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় বলে মনে হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধের গদ্যভঙ্গি আলোচনাকে শুধু ভাষার প্রাঞ্জলতার উল্লেখে পর্যবসিত করলে চলে না। গদ্যসাহিত্যের শ্রেণীভেদে গদ্যরীতির বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে হার্বার্ট রীড *English Prose Style* বইটিতে আমাদের অবহিত করেছেন। কিন্তু শ্রেণীগত রূপের মধ্যেও লেখকের ব্যক্তিত্ব গদ্যকে অনন্য করে তুলতে পারে গদ্য-সমালোচনার লক্ষ্য সেই দিকেই নিবদ্ধ রাখা সঙ্গত।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গদ্যের বহুমুখী সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে 'বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ' বইটি রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, চরিতকার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বাইশজন গদ্যলেখককে তিনি গ্রন্থভুক্ত করেছেন। আলোচনাকে তিনি শুধু গদ্যসাহিত্যরীতিতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ব্যক্তির রচনানৈপুণ্য বিশ্লেষণে তিনি তাকে প্রযুক্ত করেছেন। এ দিক থেকে তিনি একটি নতুন আলোচনাপদ্ধতির দিক্ নির্দেশ করলেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাস ইতিপূর্বে অন্তত দু'খানি বইতে আমরা পেয়েছি, একটি অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' অন্যটি ডাঃ মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ'। দুখানি বইই ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে রচিত। অরুণবাবুর বইখানা আলাদা। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা না ক'রে গদ্যের শিল্পবৈশিষ্ট্যই তিনি দেখিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্য মুখ্যত রসিকের। নিঃসন্দেহে তিনি লেখকদের শিল্পকুশলতা সপ্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা গদ্য যে কত রূপে সম্পন্ন হয়েছে, এই বইখানা পড়লে পাঠকরা তার একটা সমৃদ্ধ ধারণা করে নিতে পারবেন। বলা বাহুল্য গদ্যের আলোচনায় উদ্ধৃতির প্রাচুর্য স্বাভাবিক। উদ্ধৃতি পাঠকের রসবোধকে সমৃদ্ধ করে। বইয়ের নামকরণের দ্বারা প্রকারান্তরে এই ইঙ্গিতই তিনি করেছেন যে লেখকদলের আলোচনায় কোনো শ্রেণীবিন্যাস বা অন্য কোনো সূত্র অনুসৃত হয় নি। কিন্তু আমাদের মনে হয় কোনো একটা সূত্র থাকলে পাঠকেরা আরও উপকৃত হতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখন বলা হয় কোনো লেখকের রচনায় সংস্কৃত প্রভাব আছে, তখন সে প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তোলা একটু কঠিনই হয়। বাংলা গদ্য সংস্কৃত গদ্যরীতির প্রভাব অতিক্রম করেই স্বমহিমা অর্জন করেছে, এ কথা

সত্য হ'লে পরবর্তী গদ্যভাষায় তার প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করারও প্রয়োজন আছে। সাধারণভাবে প্রভাবমুক্ত হয়েও সংস্কৃত রীতিকে কতখানি স্বীকার ক'রে গদ্য সার্থক হয়েছে—সেটা ব্যক্তিবিশেষের স্টাইলের আলোচনাতেই আসে। একটা যুগে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যভাষাকে গদ্যে খুব বেশিই স্থান দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো এক যুগের সংস্কৃতানুসারিতা থেকে বোধহয় বেশিই। অনুরূপ প্রসঙ্গ চলিত ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আসে। লেখকব্যক্তির অভিপ্রায় এবং ক্ষমতার উপরই এর সার্থকতা নির্ভর করে সন্দেহ নেই কিন্তু এর একটা বিষয়-গত এবং ইতিহাস-গত পটভূমিও আছে।

অরুণবাবু এ বিষয়ে যে অনবহিত তা নয়। বইয়ের শেষ দুটি প্রবন্ধ 'উনিশ শতকের গদ্য' এবং 'বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ' লেখকের গভীর কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় বহন করছে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, পাঠকেরা এতে ভাববার উপকরণ যথেষ্ট পাবেন। সমালোচনার শেষে প্রসন্ন পাঠকের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা তিনি জাগিয়ে তুললেন, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য তাতেই সিদ্ধ হয়েছে।

অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত

যে আঁধার আলোর অধিক—বুদ্ধদেব বসু; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'যে আঁধার আলোর অধিক' আঙ্গিক ও চিন্তাবস্তুর সার্থক সমন্বয়ে প্রগাঢ় পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে। গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতা নিটোল ও দৃঢ়সংবদ্ধ এবং সনেটগুলিতে যতিপাত ও পদান্ত মিলের বৈচিত্র্য একাধারে বিস্ময়কর, আনন্দদায়ক ও আবিষ্কারমূলক। ঘরোয়া ভাষার মাধ্যমে নানাবিধ 'মৌলিক জরুরি' সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষত সনেটগুলিতে এমন এক নূতনত্বের স্বাদ সঞ্চারিত করে যা বাংলা সনেটে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সংরক্ত অনুভূতিকে এবং যুক্তিধর্মিতার সঙ্গে চিত্রকল্পের প্রতীকী ব্যবহারকে এত সহজ, অনায়াস, সাবলীল ভঙ্গিতে মিশিয়ে দিয়ে ক্রমশ কবিতাকে একটি অনাবিল উজ্জ্বল অন্তে নিয়ে যাওয়া চোখে পড়ে বোদলেয়ারে, এবং এ-কথা ভেবেও আনন্দ বোধ হয় যে এই কবিই বোদলেয়ারকে বাঙালী পাঠকের কাছে পরিচিত করেছেন ও করছেন। 'স্বর', 'সনাতন সংঘর্ষ', 'স্টিল লাইফ', 'মরুপথ' প্রভৃতি সনেটে যুক্তিপরম্পরা আর ইমেজরির ক্রমপরিণতি এত নিবিড়ভাবে পরস্পরে লীন হয়ে আছে যে তাদের পৃথক্ ক'রে চেনা সম্ভব হয় না; যে বস্তুটিকে চিনতে পারা যায় তাকে বিশুদ্ধ কবিতার ভাষা বললে অত্যুক্তি হবে না। কয়েকটি উদাহরণ দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

কান, প্রাণ, বীজের ভাণ্ডার
ভ'রে যায় মিনারে, মন্দিরে, যেন গভীর ঘণ্টার
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ছিনিয়ে, দূতের মতো হাওয়া

সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত—দুধের ফোঁটায়।
কিছু না, কেবল হাওয়া ; কম্পন, ভঙ্গুর ঢেউ, অথবা প্রমাণহীন
মনের শিশুর কান্না ঠেলে ওঠে ঘুমের বোঁটায়।

—স্বর

অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,
বালিতে কালোর বৃত্তে প্রসবের মৃদু অনুমান—
হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে, আঙুল পাগল হ'য়ে খুঁড়ে তোলে জল ঃ

অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয় ; সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফ'লে ওঠে ফল ;
এবং দর্শনস্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার আজান।

—মরুপথ

আর সেই ফুৎকারে দেহের তন্ত্র, হৃৎপিণ্ডের অতল গহ্বর
হয়েছে শ্রবণময়—যেন কোনো পথিকের প্রতীক্ষার সার্থক প্রহর
সমুদ্র লুণ্ঠন ক'রে ডুবে গেলো দূর টেলিফোনে।

—সনাতন সংঘর্ষ

গাদ, ক্বাথ, বুদ্বুদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, স্বচ্ছতায় সঞ্চিত আঁধার ;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুরি
ক'রে নিতে পারবে না—সেই দুরনিবদ্ধ নীহার।

—অপেক্ষা

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর যে নিবিড় অবসাদহীন সৌহার্দ্যের কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছিলেন তা এই গ্রন্থে নূতন চেতনার জন্ম দেয়। শাপভ্রষ্ট অপ্সরীর মত কুকুরের চোখে আমরা হরিণ-চোখ খুঁজে পাই ; পশ্চিমের শীত মূর্তিপরিগ্রহ করে 'বাষ্পলীন, ধবল, সরল ডিসেম্বরে'-এর মত শব্দসমষ্টিতে।

ইমেজরি-প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। পৌরাণিক চিত্রকল্প ও ঘটনাকে আধুনিক চৈতন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে তাদের তাৎপর্যপূর্ণ পুনর্জন্ম দেওয়া আলোচ্য গ্রন্থের বহু কবিতার বৈশিষ্ট্য। এই উপায়ে যে স্বাদুতা ও ব্যঞ্জনাগুণের সৃষ্টি হয়েছে তা অনন্য :

……হাজার-পাপড়ি-জ্বলা মণিপুর,
দ্বারকার অশ্ববেগ, সপ্রতিভ গতির প্রখর
হাওয়া, স্বতঃপ্রভ মাছের আগুনে স্নিগ্ধ গভীর বাসর
ভেসে উঠে ডুবে যায়, কিছুই না-দিয়ে, অকস্মাৎ।

—বহুমুখী প্রতিভা

……প্রবল প্রেতের মতো দলে-দলে নামে দুই তীরে
অতীত, আসন্ন কাল ; সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবরযুবতী।
—আটচল্লিশের শীতের জন্য : ১

কচ, দেবযানী, অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রকে আশ্রয় করে পূর্ণাঙ্গ কবিতাও কবি রচনা করেছেন।

শিল্পীর সুখদুঃখ, দায়িত্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব, খ্যাতিলাভে অনিশ্চয়তা একাধিক কবিতার বিষয়বস্তু। শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কি এই প্রশ্ন কবিকে বিশেষ ভাবিত করেছে। এটা লক্ষণীয় যে এই প্রশ্ন তিনি তাঁর অনেক প্রবন্ধেও তুলেছেন, এবং সর্বত্রই তিনি একই উত্তরে পৌঁছেছেন। আর্ট তাঁর কাছে মূল্যবান্ ও জীবন্ত। অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি, স্বাধীনতা, জনগণের নিয়তি, ইতিহাসের গতি ইত্যাদি মাপকাঠিতে বিচার করলে আর্টের প্রয়োজনীয়তা যদি শূন্যেও নামে, তবু তার নিজস্ব মূল্য কমবে না। কারণ 'শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত'। 'অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন' হ'য়ে 'নামহীন, প্রাচীন অনলে' মোমের মত জ্ব'লে যাওয়াই কবির স্বভাব ; বারবার সে এই কথাই জানাতে চায় যে তারও 'আঁতুড় ছিল দেবতায় বিধ্বস্ত নীলিমা'।

'সমর্পণ', 'প্রেমিকের গান : ২', 'অনুরাধা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চিত্র বা উপমার অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, কিন্তু

সোনালি চুল, নীলাভ চোখ,
বিরাম, সুখ, নিটোল ছুটি,
সম্ভোগের আঁচল-ধরা অবসাদের
কঠিন মুঠি।
—অনুরাধা

বা

কথা বলা বড্ড বেশি হবে,
থাকো আমার চোখের দাবদাহ,
লক্ষ শিখার স্বপ্নে যেমন জ্বলে
অস্বাভাবিক, নিথর খাজুরাহো।
—প্রেমিকের গান : ২

এই ধরনের নির্মল পঙ্‌ক্তি আজকের দিনে লেখা কত কঠিন তা পাঠক অনুমান ক'রে নেবেন। 'সদ্য-ফোটা সবুজ পাতা, দুটো রঙিন / রবিন্ পাখি' যে স্নিগ্ধ ঝিলিক দিয়ে যায় তার সার্থকতা আমরা শুধু তখন উপলব্ধি করি যখন আমরা অনুভব করি যে এই কবিতাগুলির সারল্য নিষ্ঠাশীল সাধনার ফল এবং এদের আপাতস্বচ্ছতার আড়ালে লুকিয়ে আছে সেই অন্ধকার যা আলোর অধিক।

কেবলমাত্র 'অনেকেরে', 'জগতেরে' ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে'-প্রয়োগে কবি কতদূর উপকৃত হয়েছেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রইলো, কিন্তু সাধারণভাবে ঋজুতা ও দ্যুতিময়তাই যে এই গ্রন্থের গুণ তা অনস্বীকার্য। 'যে আঁধার আলোর অধিক' ইদানীন্তন কালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

কেতকী কুশারী
পঞ্চম বর্ষ, কলা

সম্পাদকীয়

পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়লেও আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যে তাঁদের মুখপত্র প্রকাশে সমর্থ হচ্ছেন সেটা কলেজের সকলের পক্ষেই সান্ত্বনার বিষয়। শুধু যে বছরে দু'টি সুদৃশ্য ও সুপুষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করবার পক্ষে নির্দিষ্ট অর্থ অপর্যাপ্ত তাই নয়; একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করতে হ'লে চাই কলেজের প্রতিটি চিন্তাশীল ছাত্র ও ছাত্রীর সহযোগিতা; কিন্তু অবসরের একান্ত অভাবে এই সহযোগিতা অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠবার সুযোগ পায় না। বিশেষত লক্ষ্য করেছি পরীক্ষার খাতায় অল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার দূষিত রীতি ছাত্রদের সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যাহত করতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করতে গেলে রচনাশৈলীতে নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু পত্রিকার জন্য লিখতে ব'সে পরীক্ষাহলের মেজাজ বজায় রাখলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। হাল্‌কা চালের লেখা আর গুরুগম্ভীর লেখা উভয়ই আমাদের কাছে সমান অভ্যর্থনীয়; কিন্তু যে-বিষয়ের উপরেই ছাত্রেরা লিখুন না কেন, তাঁরা লিখবেন তাঁদের মনের কথা, প্রশ্নোত্তরের কৃত্রিমতাগুলোকে বর্জন ক'রে, এটাই হলো কাম্য। কলেজ পত্রিকার সার্থকতা বিভিন্ন বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে; প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যার ঊষর মরুভূমিতে এই চিন্তাধারা যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে তবে তা হবে নিদারুণ পরিতাপের বিষয়।

* * *

শুধু পরীক্ষাব্যবস্থা কেন, আমাদের কলেজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমন নানাবিধ বস্তু আছে যা হরেক রকমের ফর্ম্যালিটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং সে-হিসাবে আমাদের ব্যঙ্গরসিকদের প্রচুর খোরাক জোটাতে পারে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের কামরার দরজায় 'প্রবেশ নিষেধ'-এর ফলকটি বা টাকা লেনদেনের কাউণ্টার থেকে শুরু ক'রে গ্রন্থাগারের তথাকথিত রিজেক্‌টেড্‌ স্লিপ্‌-সমূহের পাঁজা পর্যন্ত বিস্তৃত মজাদার ক্যান্‌ভাসে এমন অনেক উপাদান আছে যা আশ্রয় ক'রে বিশুদ্ধ ল্যাম্বীয় রীতিতে একাধিক ডিসার্টেশন রচনা করা যেতে পারে। কেন যে সরকারী কলেজকে চেকে টাকা দেওয়া যাবে না, কেনই বা প্রতি মাসে বেতন দেওয়া একটি ছোটোখাটো বিভীষিকা হয়ে থাকবে এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর বোধ করি একমাত্র ঐ স্বচ্ছদৃষ্টি পুরুষই দিতে পারতেন। বলা বাহুল্য সমাজজীবনের আরও অনেক ফর্ম্যালিটির মত এ-সব ফর্ম্যালিটিও একাধারে অনন্ত কমেডি ও অনন্ত ট্র্যাজেডির উৎস। ছাত্রদের রুটিন-বাঁধা জীবনে এরা যদি

কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ সঞ্চারিত করতে পারে তবে আমরা এদের সহজে বিদায় দিতে চাইবো না! অন্তত কমিক চিত্তশুদ্ধির উপাদান হিসাবেও এদের কিছু মূল্য আছে; মধ্যে মধ্যে এদের সঙ্গে ধাক্কা না খেলে বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে এ-সব ফর্ম্যালিটির মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে ব'লেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এরা হয়তো সম্পূর্ণ বেমানান নয়।

* * *

দ্বিতীয়বার চিন্তা করলে মনে হয় মানানো না-মানানোর কথা বেশী জোর দিয়ে না বলাই নিরাপদ্। আমাদের কলেজের গেটের সামনে, কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকান আর রেস্তোরাঁর আনাচেকানাচে যেসব শিশু ভিখারীদের স্বরাজ, যাদের অনুরোধ-ভর্ৎসনা-স্বাধিকারবোধ-মিশ্রিত দাবি শুনে মনে পড়ে ছেলে-ভুলানো-গল্পে লেটুস্ পাতার প্রতি গিনিপিগশাবকদের উক্তি :

Lettuce! O Lettuce!
Let us, O let us,
O Lettuce leaves,
O let us leave this tree and eat
Lettuce, O let us, Lettuce leaves!

তারাই কি বেমানান? প্রাত্যহিক অভ্যাসের স্বার্থপরতার কাঠিন্যস্পর্শে আত্মবিস্মৃত না হ'য়ে থাকলে আমরা তো প্রতিদিন বেঁচে মরতাম এদের দেখে। অস্তিত্বের অর্থ-হীনতা যখন সর্বত্র প্রবলভাবে নিজেকে ঘোষণা করছে তখন আমরা যে কলেজে যাতায়াত করছি, হাসিঠাট্টাতেও যোগদান করছি, পত্রিকাও প্রকাশ করছি, সেটা অপার্থিব করুণার ফলেই কিনা তা চিন্তনীয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় করুণ, নিষ্ঠুর, হাস্যকর, নিরর্থক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর হেরফেরের কতখানি প্রয়োজনীয়তা আছে তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

* * *

অনার্সের মান-অনুসারে সংস্কৃতের অনুশীলন আমাদের কলেজে না হওয়াতে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য পঠন-পাঠনের যে স্বকীয় আবহাওয়া আছে তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে। এমন নয় যে বি. এ. বা ইণ্টারমিডিয়েটের বিষয় হিসাবে আমাদের কলেজের কেউই সংস্কৃত নেন না বা রাস্তার ওপারে সংস্কৃত কলেজে পাঠগ্রহণ করতে যান না। কিন্তু দৈনিক কর্মসূচীতে সেটা যেন কয়েক মিনিটের ইণ্টারল্যুড্, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে এলে সেটার স্মৃতি ঝাপ্সা হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের কলা বিভাগের পক্ষে এই ক্ষতি আমি অপূরণীয় মনে করি। আমি জানি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সংস্কৃতের আকর্ষণী ক্ষমতা কম, এবং তৎসত্ত্বেও যাঁরা সংস্কৃতের প্রতি গভীর অনুরাগবশত

এ-বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভে অগ্রসর হন তাঁরা স্পেশলাইজেশনের অমোঘ নিয়মে সংস্কৃত কলেজে জড়ো হন। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এই প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে হার্দ্য সম্পর্ক অটুট রাখলে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাভ বই ক্ষতি হবে না। কারণ উপরিউক্ত আবহাওয়ার পুনরুজ্জীবন প্রার্থনীয়; বিশেষত সাহিত্য এবং দর্শনের ছাত্রেরা সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে যে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারবেন না সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। অবশ্য সংস্কৃতকে বাদ দেবার ইচ্ছা ছাত্রদের মধ্যে বেশী প্রবল, না বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশী প্রবল, তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-অনুসারে ইংরেজী অনার্সের ছাত্র সংস্কৃতকে পাশের বিষয় হিসাবে নিতে পারলেও বাংলা অনার্সের ছাত্র সে-সম্মানের অধিকারী নন। নিজের দেশের পুরাতন ও নূতন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একই ব্যক্তি একসঙ্গে অনেক কিছু জেনে ফেলবে, এটা বোধ হয় অপরাধ। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকাতেই সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক কোনো প্রবন্ধ আজকাল প্রকাশিত হয় না সেটা দুঃখের বিষয় নয় কি?

আমাদের কথা

কলেজে পরিবর্তন

কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীতে অনবরতই পরিবর্তন হচ্ছে। ইংরাজী বিভাগ শ্রীকরুণাশঙ্কর রায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে; ঐ বিভাগে ইংলণ্ড-প্রত্যাগত শ্রীকালীপদ দাশগুপ্ত আবার যোগদান করেছেন। শ্রীমুজিবার রহমানের স্থানে ফার্সীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীওয়াজিউদ্দীন আহমেদ। ইতিহাস বিভাগের শ্রীশিশিরকুমার মিত্র অন্যত্র বদলী হয়েছেন এবং শ্রীসুধীরকুমার পাল ভারতীয় শাসনবিভাগে যোগদান করেছেন; এই বিভাগে নূতন যোগদান করেছেন শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপাললাল চক্রবর্তী। অর্থনীতি বিভাগে নবাগত শ্রীদীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। গণিত বিভাগে শ্রীমণীন্দ্রকুমার রায় বদলী হয়েছেন; তাঁর স্থানে এসেছেন শ্রীকৈলাসনাথ ভট্টাচার্য। পদার্থবিদ্যা বিভাগে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল কানাডা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় যোগদান করেছেন; ঐ বিভাগে শ্রীঅমরচাঁদ দে-ও নবাগত। রসায়ন বিভাগে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত বদলী হয়েছেন এবং শ্রীকিরণচন্দ্র সেন, শ্রীরণেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমুকুলচন্দ্র দাস যোগদান করেছেন। ভূগোল বিভাগের শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাতযাত্রা করেছেন; এ বিভাগে নূতন এসেছেন শ্রীবিমলেন্দু ভট্টাচার্য। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ হারিয়েছে শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী, শ্রীঅশোককুমার কর, শ্রীনিরঞ্জন পাল ও শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্রকে; এঁদের মধ্যে শ্রীঅশোককুমার কর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকা যাত্রা করেছেন। এ বিভাগে নবাগত শ্রীচিত্ততোষ দত্ত, শ্রীঅশোককুমার সিংহ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চন্দ। সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে শ্রীমিলনকুমার গুপ্ত শ্রীপ্রসাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান পূর্ণ করেছেন।

শ্রীফ্রেণ্ড পেরেরার মৃত্যুর পর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীপরমনাথ ভাদুড়ী অস্থায়িভাবে কিছুদিন কাজ চালিয়েছিলেন। বর্তমানে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীসনৎকুমার বসু। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর কর্ম-দক্ষতা ও সহৃদয় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে ছাত্রসমাজ মুগ্ধ হয়েছে। কলেজজীবনে সৌন্দর্য- ও শৃঙ্খলা-বৃদ্ধির জন্য তিনি সকলের অশেষ ধন্যবাদার্হ।

পরীক্ষার ফলাফল

অন্যান্য বছরের মত এবারও আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবারে আই. এ. ও আই. এসসি. পরীক্ষায় আমাদের পাশের হার যথাক্রমে ৯৩·১% ও ৯৭·৫৯%। আই. এ.-তে প্রথম দশজনের মধ্যে দুজন ও আই. এসসি.-তে প্রথম দশজনের মধ্যে আটজন আমাদের কলেজের ছাত্র।

বি. এ. ও বি. এসসি. পরীক্ষায় আমাদের পাশের হার যথাক্রমে ৮৭·৫% ও ৮৬·২৫%। বি. এ.-তে সবসুদ্ধ নয়জন ও বি. এসসি.-তে সবসুদ্ধ সাতাশজন ছাত্রছাত্রী আমাদের কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন। ইংরাজী, পালি, ইতিহাস, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও সংখ্যাবিজ্ঞান—এই বিষয়গুলিতে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের কলেজের স্নাতকোত্তর ইংরাজী বিভাগের দুজন ছাত্রছাত্রী শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী যশোধরা সেনগুপ্ত সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন।

ইংরাজী সেমিনার

কলেজ পত্রিকা যতদিনে আত্মপ্রকাশ করবে, ততদিনে ইংরাজী সেমিনার তার সুবর্ণজয়ন্তী বছরে পদার্পণ করবে। সুখের বিষয়, বহুকাল পরে আবার সেমিনারের কার্যকলাপ আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যাক্ যে ভবিষ্যতে সাম্মানিক ইংরাজীর ছাত্রছাত্রীরা সেমিনারের কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে।

ইংরাজী সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে পাওয়া কয়েকটি আবৃত্তির ও টি. এস্. এলিয়ট-এর নাটক 'দি ককটেল পার্টি'র রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়। কলেজের নিজস্ব কোনও গ্রামোফোন না থাকায় কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ গ্রামোফোনসহ তাঁদের দু'জন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে পাওয়া কয়েকটি ডকুমেন্টারী চলচ্চিত্র দেখানো হয়। তৃতীয় অধিবেশনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সেণ্ট জেভিয়ার্স্ কলেজের অধ্যাপক ফাদার আঁতোয়ান্ ইংরাজীতে মহাকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শীঘ্র আরো একটি অধিবেশনের আয়োজন করার ইচ্ছা রইল।

এই বছরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংরাজী সেমিনারের পক্ষ থেকে একটি প্রাচীরপত্রিকা প্রকাশ। একটি সুদৃশ্য নতুন বোর্ড দিয়ে অধ্যক্ষ শ্রীসনৎ বসু আমাদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। তাঁকে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ।

অনার্স লাইব্রেরীর কাজ যথারীতি চলছে। বহু নতুন বই কেনা হয়েছে। ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ কিছু কিছু অর্থসাহায্য করে অনেক বই কেনার সুযোগ দিয়েছেন।

ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আঠারটি পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া গেছে।

পরিশেষে ইংরাজী বিভাগের প্রত্যেক অধ্যাপককে এবং ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন কর এবং গোপালবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রীআর্গল্স্ ও শব্দযন্ত্রী শ্রীমলয়কুমার বক্সীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা ইংরাজী সেমিনারের কার্যকলাপে যে উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং বই দিয়ে যে সাহায্য করেছেন তা চিরকাল মনে থাকবে।

দিব্যদ্যুতি হাজরা
সম্পাদক, ইংরেজী অনার্স লাইব্রেরী

দর্শন সেমিনার

কাজ করা এক আর কাজের খসড়া তৈরী করা অন্য। একটার মাঝে পাওয়া যায় আনন্দ, অন্যটার মাঝে একঘেয়েমি। তবুও করতে হবে কর্তব্য বলেই। নবাগত ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য বইতে হবে এই খসড়া তৈরীর একঘেয়েমি। অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটি ঘটে থাকলে আশা করি সহৃদয় ছাত্রছাত্রীরা ক্ষমা করে নেবেন। নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার সোনালী আলোয় কলেজজীবনের দিনগুলি হয়ে উঠেছিল স্বপ্নভরা। দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে গেল। এখন এসেছে বিদায়ের পালা। তাই বিদায়বেলার পূর্বের স্মৃতি মন্থন করে যে অমৃতটুকু লাভ করতে পারি, তাই হবে বিদায়ের পরমুহূর্তের পাথেয়—এই ভেবে ছিন্ন স্মৃতির মালা গেঁথে চলেছি।

এই দু'বছরের অল্প পরিসরের মধ্যে পেয়েছিলাম সতীর্থ ও অধ্যাপকবৃন্দের অকৃত্রিম ভালবাসা। এইটুকু সম্বল করে ছেড়ে যেতে হবে কলেজজীবনের মধুময় স্বপ্নভরা দিনগুলি। এই কলেজের দর্শন সেমিনারের সম্পাদক হবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই পদই এনে দিয়েছিল অজানার মাঝে জানার সুযোগ আর বেঁধে দিয়েছিল বহুল করণীয়ের পুত বন্ধন। এইসকল কথা মনে করেই আজ বিদায়ের ক্ষণে আনন্দ ও নিরানন্দের মাঝে অনুভব করছি বন্ধন ও বিচ্ছেদের অপূর্ব শিহরণ।

সেমিনার-সম্পাদক হয়ে অনেক কাজেই হাত দিয়েছিলাম। হয়ত অনেকগুলো শেষ করতে পেরেছি।

অনেক পারিনি। যা পারিনি তা হয়ত ভবিষ্যৎ ছাত্রবন্ধুদের একাগ্রতায় ও উৎসাহে শেষ হবে। যা শেষ হয়েছে, তাও ত্রুটিহীন বলার দম্ভ আমার নেই। শেষ করবার ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছুই শেষ করতে পারিনি কারণ বিদায়ের পুরবী রাগিণী ইতিমধ্যেই করুণ সুরে বেজে উঠেছে। তাই আগামী ছাত্রবন্ধুদের হাতে এই অযোগ্য সম্পাদকের না-করে-যাওয়া কাজের ভারটুকু চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। যাক্‌গে, এবার কাজের কথায় আসি। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্যই সেমিনার। কিন্তু বর্তমানে সেমিনার ও তার লাইব্রেরী সমার্থক। বই দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পাদক 'middleman' মাত্র। বই সম্বন্ধে বন্ধুদের যে চিরন্তন 'যাহা-চাই-তাহা-পাই না' অভিযোগ—সে ব্যাপারে সেমিনার-সম্পাদক অসহায়। এবছর পাঠচক্রের পক্ষ থেকে মোট তিনটি স্মরণীয় অধিবেশন হয়। California Universityর স্বনামধন্য অধ্যাপক Abraham Kaplan সাহেব সেমিনারে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। Philadelphia Universityর অধ্যাপক Martin Foss সেমিনারে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। আরও দুটো বিশেষ অধিবেশন হল। দুটি বিদায়-সম্বর্ধনা। প্রথমটি দেওয়া হয় অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারকে, অপরটি দেওয়া হয় বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে।

গত কয়েকমাসে দর্শন সেমিনারের পক্ষ থেকে মোট ছয়টি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রীঅমিতাভ খাস্তগীর "Poetry, Philosophy and Religion" এবং শ্রীহৃদয়রঞ্জন মোদক "The value of Philosophy" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এ ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদায়ী চতুর্থ বর্ষকে বিদায়-সম্বর্ধনা এবং নবাগত তৃতীয় বর্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

কাজের স্বল্পতার জন্য সম্পাদক নির্দোষ না হলেও সেমিনারের বর্তমান পরিস্থিতি বোধ করি অধিকতর দায়ী। যে ধরনের সামর্থ্য, উৎসাহ এবং অবসর একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠচক্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন, তার একান্তই অভাব। সেমিনারের দেওয়ালপত্রিকা প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। আশা করি, উত্তরসূরীরা এটা নিয়মিত প্রকাশ করবেন। সেমিনারের একটা নির্দিষ্ট fundএর চিরন্তন অভাব দূর হয়েছে, অধ্যাপক এবং সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তায় যদিও পর্যাপ্ত অর্থ এ থেকে সংগৃহীত হয়নি। অন্যান্য কাজের সার্থকতার মূলেও আছে বন্ধুদের সক্রিয় সহানুভূতি আর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরীর মূল্যবান্ উপদেশ ও সহানুভূতি।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঋণশোধের বৃথা চেষ্টা করব না। সবশেষে, বাংলা সেমিনারের সম্পাদক শ্রীশুভঙ্কর চক্রবর্তী, বাংলা অনার্সের ছাত্র শ্রীমান্ মহীতোষ বিশ্বাস এবং ঐ অনার্সেরই ছাত্রী শ্রীমতী পম্পা ঘোষের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমার সেমিনারের বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতাও পেয়েছি।

হৃদয়রঞ্জন মোদক
সম্পাদক, দর্শন সেমিনার

বাংলা পাঠচক্র

মেয়াদ যখন ফুরিয়ে এল-ই, তখন পূর্ব-সূরীদের অনুসরণে পাঠচক্রের বিবরণী নতুন করে দেওয়া গেল।

বিদায়ী পাঠচক্র-সম্পাদকের কাছ থেকে ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি পাঠচক্রের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

পাঠচক্রের প্রথম কাজ বই দেওয়া-নেওয়া। এই প্রধান কাজে হাত দিয়েই প্রথম অভিজ্ঞতা হল—বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই কম।

পূর্ব-সূরী তাঁর সহৃদয় তৎপরতা দেখিয়ে যে কখানা বইয়ে পাঠচক্র-আলমারি সাজিয়েছেন—তার মধ্যে 'আসল বই'এর নাকি একান্তই অভাব। ছাত্রছাত্রীর এই 'আসলটাই নেই' অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি 'আসলের' সুরাহা করতে সচেষ্ট হই। এবং বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রধান অধ্যাপকের সাহায্য পেয়ে বহু কষ্টে কিছু-সংখ্যক 'আসল-বই' পাঠচক্রে আনিয়েছি। কিন্তু এই অভিযোগ চিরন্তন। এ-ব্যাপারে সম্পাদক নিতান্তই অসহায়।

বাংলা পাঠচক্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কাজ মোট তিনটি আলোচনা-সভায় তিনটি প্রবন্ধপাঠের আয়োজন। প্রথম আলোচনা-সভা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং বাংলা বিভাগের মান্য অধ্যাপকগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে। তিনটি প্রবন্ধই আলোচনা সভায় ছাত্রবন্ধুদের যুক্তি-অযুক্তির মধ্যে দিয়ে বিতর্কমূলক বিষয়ে পরিণত হওয়ায় বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে! কিন্তু তিনটির বেশি আলোচনা-সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। দোষ অনেকটা সম্পাদকের কিন্তু ছাত্রবন্ধুদের সাহচর্যের অভাব, এবং বিভাগীয় অব্যবস্থাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—বিদায়ী চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ঘরোয়া পরিবেশে বিদায়জ্ঞাপন এবং নবাগত তৃতীয় বর্ষকে সাদর আহ্বান জানানো।

তৃতীয় বর্ষে যখন আমরা ছিলাম তখন মাননীয় অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী এবং শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য অন্যত্র কার্যভার গ্রহণ করে আমাদের কলেজ থেকে বিদায় নেন। পাঠচক্রের পক্ষ থেকে তাঁদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হয়। মাননীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ও শ্রীশশাঙ্ক বাগ্‌চি একই সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। আমরা তাঁদের অবসর-জীবনে শান্তি কামনা করে বিদায়-সম্বর্ধনা জানিয়েছি।

এরপর পাঠচক্রের মুখপত্র প্রাচীরপত্রিকা 'আশাবরী'র কথা।

বাংলা বিভাগের নিয়মানুসারে পাঠচক্রের সম্পাদক 'আশাবরী'রও সম্পাদক। এই প্রাচীরপত্রিকা নিয়ে ছাত্রছাত্রীমহলে অনেকবার প্রশ্ন উঠেছে—বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'আশাবরী'তে কেন শুধু প্রবন্ধই বার করা হয়। এর যথাযথ উত্তর পূর্ব-সূরী দিয়ে গেছেন। আবার নতুন করে যাদের মনে একই প্রশ্ন জেগেছে বা জাগছে তাদের সংশয় নিরসনের চেষ্টা করা যাক্।

আশাবরীতে কেবল প্রবন্ধ প্রকাশের পেছনে রয়েছে বাংলা-পাঠচক্রের একটা স্বতন্ত্র মর্জি। এই বিশেষ মর্জি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অর্থ সাহিত্যের অন্যান্য ধারার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপন মোটেই নয়। প্রবন্ধধারার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বকীয় প্রবণতার সঞ্চার এর উদ্দেশ্য। আর এই মর্জির অব্যাহত পালন আমাদের কার্যধারাকে সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য নিয়ে স্বদেশ ও বিদেশের নমস্য মনীষীদের মূল্যবান্ আলোচনার সঙ্গে বাংলা সাম্মানিক শ্রেণীর যে-সব ছাত্রছাত্রীর কমবেশি পরিচয় ঘটেছে—তাঁরা যেন সেই সব আলোচনা থেকে অমূল্য অংশ তুলে 'আশাবরী'কে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এর জন্য 'আশাবরী'তে এ বছর থেকেই 'চিকীষা' (চয়ন করবার ইচ্ছা) নামে একটি বিশেষ স্তম্ভের আয়োজন করা হয়েছে। নব-নির্বাচিত পাঠচক্র-সম্পাদকের কাছে অনুরোধ—তিনি যেন বিভাগের এই বিশেষ মর্জির কথা মনে রেখে কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করেন।

'আশাবরী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের এবং লেখকদের নাম দেওয়া গেল ঃ—

১। বিসর্জনের নাট্যবস্তু
২। একটি আধুনিক গল্পের সমালোচনা
৩। 'চিকীষা'র স্তম্ভে সাহিত্যের উদ্দেশ্য

} শুভঙ্কর চক্রবর্তী

৪। এখন লিরিকের লগ্ন } শ্রীমান্ পল্লব সেনগুপ্ত
৫। সমাজ ও সাহিত্য }
৬। বিভূতিভূষণ ও প্রকৃতিচেতনা } শ্রীমান্ মহীতোষ বিশ্বাস
৭। একজন আধুনিক কবি }

আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধের এবং লেখক-লেখিকার নাম দেওয়া গেল :—

১। কবি মধুসূদন দত্তের ব্যক্তি-মানস ও কবি-মানস—রচয়িত্রী পম্পা ঘোষ
২। নজরুল-কাব্যে নারীচেতনা—রচয়িত্রী গীতশ্রী রায়
৩। পথের পাঁচালী ও বাংলা উপন্যাসসাহিত্য—রচয়িতা শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সবশেষে স্মরণ করি আমাদের সমস্ত উদ্যোগে পাঠচক্রের সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ মহাশয়ের অনুকূল মতামত, অকুণ্ঠ সহানুভূতি এবং বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের সস্নেহ সহযোগিতার কথা। এবং ঋণ স্বীকার করি পাঠচক্রের সতীর্থ বন্ধুদের কাছে, যাদের অকৃত্রিম সাহচর্যে সম্পাদকের কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সংস্কৃত অনার্সের ছাত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সাধুকে, যিনি পাঠচক্র-আয়োজিত প্রীতি-সম্মেলন এবং বিদায়-সম্বর্ধনায় উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে আমাদের সাহায্য করেছেন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী
সম্পাদক, বাংলা পাঠচক্র

অর্থনীতি সেমিনার ও প্ল্যানিং ফোরাম

গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে বিদায়ী সম্পাদক হিসাবে রিপোর্ট লিখছি—২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বহন করে এনেছে এক পরিবর্তনের আভাস এবং তারই প্রতিফলন এসে পড়েছে আমাদের সেমিনারে। সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই সম্প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ অর্থনীতি বিভাগটি কলেজের নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হবে। তবে বর্তমান সেমিনার-ঘরে আমরা অসুবিধা ভোগ করে গেলাম অনেকই। ত্রিতলের রসায়ন বিভাগের কৃপায় 'কৃত্রিম বৃষ্টিপাতে' সিক্ত এবং কাঠের পার্টিশনের ওপারে গার্লস্ কমনরুম থেকে ভেসে আসা কলকণ্ঠের ঐকতানে নিত্য-মুখরিত প্রায়ান্ধকার সেমিনার-ঘরটি আর যাই হোক অধ্যয়নের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়, এটা নির্বিবাদে বলা যায়।

এবার আসছি কাজের কথায়। বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ ঠিকমতই চলছে। প্রয়োজনের তুলনায় বইয়ের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাই কোন-কোন চাহিদা হয়ত সময়মত মেটান সম্ভব হয়নি। কিন্তু সীমিত সংখ্যার বই নিয়ে সম্পাদক এক্ষেত্রে নিরুপায় ও অসহায়। যাই হোক্, সরকার অর্থনীতি বিভাগকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই সরবরাহ করবার আশ্বাস দিয়েছেন—আগত-অনাগত সভ্যদের আনন্দের কথা।

ট্র্যাডিশনকে অনুসরণ করে আমরাও নিয়মিত পাঠচক্র আহ্বান করেছি। এপর্যন্ত অর্থনীতি সেমিনারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়—

Problems of Capital formation in under-developed countries—শ্রীআনন্দরূপ রায়
Foreign-Exchange Crisis and the Second Plan—শ্রীঅসীমকুমার চৌধুরী
Implications of a Socialistic Pattern of Society in India—শ্রীদীপক মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ পাঠের পর তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়েই হয় ভাবের আদান-প্রদান। ভবিষ্যতে আরও দুই-একটি পাঠচক্র আহ্বান করার ইচ্ছে রইল।

বৎসরাধিককাল প্ল্যানিং ফোরামের প্রতিষ্ঠা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পরিকল্পনাবোধ কতখানি

জাগিয়েছে তা জানি না, তবে আমাদের পরিকল্পনা-সচেতনতা দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা গত ১৩ই সেপ্টেম্বর '৫৮, 'জাতীয় পরিকল্পনা দিবস' উপলক্ষে প্ল্যানিং ফোরামের পরিচালনায় দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর '৫৮তে ছিল আলোচনা-সভা।

বিষয়—Recent rise of agricultural prices।

বক্তা—শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দাস।

পরের দিন ১৩ই সেপ্টেম্বর '৫৮তে স্থিরীকৃত Symposiumটি অনিবার্য কারণবশতঃ ঐদিনের পরিবর্তে ২০এ সেপ্টেম্বর '৫৮তে অনুষ্ঠিত হয়।

Symposium এর বিষয়—Finding resources for the National Plan। অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দরূপ রায়, শ্রীদিলীপ সমাদ্দার।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ হীরালাল দে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

এবার আমাদের প্রাচীর-পত্রিকা The Economistএর সম্পর্কে দু-চার কথা বলব।

বহু-আকাঙ্ক্ষিত একটি সেমিনার-মুখপত্র, এ বৎসরে (১৯৫৮) আমাদের প্রচেষ্টায় The Economist নামে প্রতিষ্ঠালাভ করল। এর আবির্ভাব চতুর্দিক থেকে অভিনন্দিত হয়েছে। সম্পাদনায় কতটা কৃতকার্য হয়েছি, সমালোচকেরাই তার বিচার করবেন। পথপ্রদর্শক হিসাবে শ্রীপ্রণব বর্ধনকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আর একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে হয়ত অপরাধী থেকে যাব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীশৈলেন দাস তুলির রেখায় The Economist-এর সংখ্যাগুলিকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। এ বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর এই অতুলনীয় সাহায্যের জন্যই The Economist এত সুনাম ও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। চারুকলা ও বৈষয়িক গুরুত্ব এই দুইদিক থেকেই The Economist-এর প্রত্যেকটি সংখ্যা সর্বজনীন প্রশংসা লাভ করেছে। শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার দাস ও শ্রীঅশোক-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পাদনায় দুটি সংখ্যার প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির নাম নিচে দিলাম—

প্রথম সংখ্যা (Inaugural Issue) :

1. "Contemporary English Bourgeois Economics." Through the Communist Eye.—Dipak Rudra.
2. Middle-East Politics—Saurindra Kumar Das.
3. Defeat of Robertson—Asoke Chatterjee.
4. An Economist—Ajoy Bhattacharyya.

দ্বিতীয় সংখ্যা (Friend-Pereira In Memoriam).

1. Homage to the departed Soul.
2. This is the way democracy ends—Pranab Kumar Bardhan (15.6.58).
3. A Critique of Sarvodaya Economics—Saurindra Kumar Das.
4. Speaking Generally—Ajoy Bhattacharyya.

তাছাড়া আছে অধ্যাপকদের যাওয়া-আসা। পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদানের জন্য দিল্লী-যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্যকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানান হয় গত ২৯শে মার্চ ৫৮তে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বিদায় গ্রহণ আমাদের পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক। ধীরেশবাবুর জায়গায় এসেছেন শ্রীঅমিয় বাগচী।

শ্রীপ্রভাকর সেন সেণ্ট াল ক্যাল্‌কাটা কলেজে বদ্‌লী হন এবং ইংল্যাণ্ড-প্রত্যাগত ডাঃ তাপস মজুমদার পুনরায় যোগ দিয়েছেন।

গত ১৭ই জানুয়ারী বিদায়ী চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রীতি-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করা হয়। সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শ্রীচিত্রলেখা চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানাই।

কাজ করবার ছিল হয়ত অনেক। কতখানি করতে পারিনি তার পরিমাপ বন্ধুরা করবেন। তবে এর জন্য সম্পাদক সম্পূর্ণরূপে দায়ী নয়। ইচ্ছা, উৎসাহ এবং উদ্যম থাকা সত্ত্বেও কোন কোন কাজ করতে পারিনি, কারণ পরিবেশই বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেমিনারের অনুষ্ঠানাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করবার জন্য এবং 'সদ্যোজাত' The Economistকে বাঁচিয়ে রাখা ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য সেমিনারের একটি নিজস্ব Fundএর প্রয়োজনীয়তা আমি যথেষ্টভাবেই অনুভব করেছি। কিন্তু বিশেষ কোন কারণবশতঃ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একটা স্থায়ী Fund গড়ে তোলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হল না। আগামী-দিনের সভ্যদের দৃষ্টি আমি এবিষয়ে আকর্ষণ করছি। ভবিষ্যতের সম্পাদকদের কাছে আমার এক সনির্বন্ধ অনুরোধ—The Economistএর মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ রোপিত হল, তার পরিবর্ধনের প্রতি যেন তাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

সেমিনার পরিচালনা ব্যাপারে সহযোগিতা ও সহানুভূতির জন্য সভ্যবৃন্দকে সমষ্টিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে, অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষালকে তাঁর পথপ্রদর্শী উপদেশ ও সহানুভূতির জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর, সহৃদয় সাহায্যের জন্য সহকারী গ্রন্থাগারিক রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই।

সৌরীন্দ্রকুমার দাস
সম্পাদক, অর্থনীতি সেমিনার
সম্পাদক, প্ল্যানিং ফোরাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেমিনার

বিদায়ী চতুর্থ বর্ষকে বিদায়সংবর্ধনা দিয়ে আমাদের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এবার আমাদের বিদায়ের পালা। যাবার সময় তাই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে বর্তমানের আলোয় খুঁজে নিয়ে আসতে হল···কি করেছি তার হিসাব দেবার জন্য।

সেমিনারের কাজ মোটামুটি ভালই হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর মোট ৫টি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধকারদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সহপাঠিগণের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এবং শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিরূপে উপস্থিতি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ·····এই সব মিলে-প্রবন্ধালোচনাগুলিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছিল। নিম্নে প্রবন্ধ ও রচয়িতাদের নাম দেওয়া গেল :—

1. "Nationalism as a political ideal"—রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য।
2. "Parliamentary democracy in Great Britain"—রচয়িতা দীপক রুদ্র।
3. "Socialism Vs. Capitalism"—রচয়িতা অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়।
4. "The future of parliamentary democracy in India"—রচয়িতা প্রতীপ চট্টোপাধ্যায়।
5. "Is communism the remedy ?"—রচয়িতা দীপক রুদ্র।

আমাদের সেমিনার থেকে The Economist নামে একটি প্রাচীরপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। The Economist রূপে এবং গুণে বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে The Economist বিষয়ক সকল প্রশংসা ও অভিনন্দন অর্থনীতি বিভাগের সম্পাদক শ্রীসৌরীন দাসের প্রাপ্য।

গত বৎসর আমাদের প্রিয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদায় দেওয়া যে কত কঠিন তা তাঁর ছাত্ররাই কেবল বুঝতে পারে। বিদায়সভায় তাই অশ্রুসংবরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয় বাগ্‌চী মহাশয়কে আমরা পেয়েছি। তাঁর আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছে। সেমিনারের সম্পাদক হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। উপদেশ ব্যতীত সেমিনারের কাজ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সহপাঠিগণের মধ্যে সৌরীন দাস, অজয় ভট্টাচার্য, দীপক রুদ্র, প্রণব রায়, প্রবীর বসু, দিলীপ সমাদ্দার, দীপক মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে আমাকে নানা-রূপে সাহায্য করে তাঁদের কাছে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেমিনার

গণিতবিদ্যা সেমিনার

পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে তাগিদ এসেছে প্রথামত কর্মতালিকা পেশ করার জন্য। প্রথমেই বলতে হয় বই লেনদেনের কথা। এ ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ সঙ্গত এবং চিরন্তন। সেমিনারের বইগুলি সুপ্রাচীন, তা দিয়ে ঐতিহ্যের গর্ব করা চলে কিন্তু কাজ করা কঠিন।

গত বছরের দ্বিতীয় কাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীকামিনীকুমার দের বিদায় সংবর্ধনা। এই উপলক্ষে একটি ছোট অথচ সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্যময় পরিবেশে সরল মানুষটির সহজ প্রীতি, ধৈর্য, নিষ্ঠার স্মৃতি আমাদের ব্যথাতুর করেছিল। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সাবলীল, মঙ্গলময় হ'য়ে উঠুক—এই কামনা।

আমাদের বিভাগে নূতন যে অধ্যাপক এসেছেন, তিনি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসনৎকুমার বসু। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি প্রেরণা দেয়। পরীক্ষার গণ্ডীর বাইরেও অঙ্কশাস্ত্রের দিকে, অঙ্কের ইতিহাসের দিকে ছাত্রদের প্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর প্রয়াস অনন্য। তা ছাড়া, শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে আমাদের বিভাগে যোগদান করেছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দলাল ঘোষের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীকৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরিচালনায় আমাদের সেমিনারের কাজ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ছুটির পরে একটি অনুষ্ঠানে তৃতীয় বর্ষ থেকে নূতন সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীনন্দলাল ঘোষ একটি মনোজ্ঞ ভাষণে আমাদের উৎসাহ দান করেন। সেমিনারের দৈন্যের কথা উল্লেখ করে তিনি চাঁদা তুলে বই কেনার কথা বলেন। সেমিনারের একটি নিজস্ব fund থাকাও দরকার। সহপাঠীদের সহযোগিতায় এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে—আশা করি।

প্রণবকুমার লাহিড়ী
শুকদেব মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম-সম্পাদক, গণিতবিদ্যা সেমিনার

ভূজ্ঞান-পরিষদ

আমাদের ভূজ্ঞান পরিষদের বয়স মাত্র আট বছর। কিন্তু এই সামান্য কটি বছরে এর অগ্রগতি সত্যি প্রশংসনীয়। আমাদের পরিষদের কার্যসূচী শুধুমাত্র দৈনন্দিন বই দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্লাশের বাঁধাধরা গণ্ডির বাইরে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানোন্মেষে সহায়তা করা ও উৎসাহ দেওয়া।

এর জন্যে তাকে ব্যবস্থা করতে হয় পাঠচক্রের, আয়োজন করতে হয় সভাসমিতির আর পরিচালনা করতে হয় প্রাচীরপত্রিকা 'পরিক্রমা' আর 'Photo Corner'।

গত কয়েকমাসে মোট চারটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের পরিষদে। আমাদের পাঠচক্রের প্রথম অনুষ্ঠানে 'Plant Geography'র ওপর বক্তৃতা দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রঞ্জিত লাহিড়ী। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'The land use in Eastern Kolhan as related to its environment।' বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীপুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় অনুষ্ঠানে আমরা বক্তা হিসাবে পেয়েছিলুম Oxford University-র অধ্যাপক Mr. M. J. Webb-কে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "The Sea-side Resorts of U. K.।" বক্তৃতার শেষে বক্তাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবরুণ দে, অধ্যাপক তরুণ লাহিড়ী এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন পাঠক। চতুর্থ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন আমাদের সদ্য বিদেশ-প্রত্যাগত অধ্যাপক ডাঃ নিশীথরঞ্জন কর। বিষয়বস্তু ছিল "An Excursion to a German University।" আমাদের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এস্. পি. চ্যাটার্জি।

প্রত্যেকটি সভার শেষে আমাদের পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন পরিভ্রমণে গৃহীত রঙিন চলচ্চিত্র দেখান হয়। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা U. S. I. S. কর্তৃপক্ষের কাছেও কৃতজ্ঞ।

পরিষদ পাঠাগারে এখন বই-এর সংখ্যা এক হাজারের কিছু বেশী। অধ্যাপক শ্রীতরুণ লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে বই দেওয়া নেওয়ার কাজ বেশ ভালভাবেই হয়ে থাকে। এই সাহায্যের জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এর পরে আসা যাক্ পরিভ্রমণের কথায়। আমাদের প্রথম পরিভ্রমণের গন্তব্য স্থান ছিল কুলু-কাংড়া উপত্যকা। অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা দু' দিনে ২৮ মাইল পায়ে হেঁটে গিয়েছিল উত্তর বিপাশার উৎস সন্ধানে। তাদের উঠতে হয়েছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৪০০ ফিট উঁচুতে।

আমাদের পরবর্তী পরিভ্রমণের গন্তব্য স্থান ছিল Gondwana Coal Basin। কলকাতা থেকে সোজা বাসে দুর্গাপুর, মাইথন, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি দেখে আসা হয়। আসানসোলে একটি কয়লাখনির অভ্যন্তরভাগও পরিদর্শন করা হয়। পরিভ্রমণটি পরিচালনা করেন ডাঃ নিশীথ কর এবং অধ্যাপক সত্যব্রত গোস্বামী।

আমাদের সর্বশেষ পরিভ্রমণ হয় কাশ্মীর এবং জম্মু এলাকায়। পরিচালনা করেন ডাঃ নিশীথরঞ্জন কর ও ডাঃ সত্যেশ চক্রবর্তী। পরিভ্রমণের পর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী Field Report পেশ করে।

এ বৎসরের অপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ল বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিদায় সংবর্ধনা। তিনি উচ্চতর গবেষণার জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

এ বৎসর আমরা দুজন অধ্যাপককে আমাদের বিভাগে পেয়েছি। ডাঃ কর আমেরিকা এবং জার্মানীতে তাঁর উচ্চতর গবেষণার কাজ শেষ করে আবার যোগ দিয়েছেন আমাদের বিভাগে। আর নতুন করে এ বিভাগে যোগ দিয়েছেন ডাঃ সত্যেশ চক্রবর্তী।

প্রতিটি কাজে অধ্যাপকদের কাছ থেকে যে অমূল্য উপদেশ আর অকুণ্ঠ সহানুভূতি পেয়েছি তার জন্যে সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। শুধু দুঃখ এই রয়ে গেল যে ডাঃ কর আর ডাঃ চক্রবর্তীর সাথে বেশীদিন কাজ করার সৌভাগ্য আমার হল না। আমি নিশ্চয় জানি আমার তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর নতুন বন্ধুরা প্রাপ্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এই পরিষদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে সহায়তা করবেন।

চন্দ্রশেখর রুদ্র
সম্পাদক, ভূজ্ঞান পরিষদ

শারীরবৃত্ত পরিষদ

একটু দেরীতে এ বছর পরিষদের কাজ সুরু হয়েছিল। ৯ই আগস্ট '৫৭ বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পরিষদের বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন সত্ত্বেও পরিষদীয় কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য অম্লান আছে।

এ বছরেরও উল্লেখযোগ্যতম অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে পুনর্মিলন উৎসব। ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর '৫৭ দু'দিন ধ'রে বিচিত্র আনন্দের মধ্যে উৎসব চলে। প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন শ্রীপরিমলবিকাশ সেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ সুবোধ মিত্র। অন্যান্যবারের মত এবারেও উৎসবের দ্বিতীয় দিনে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের প্রীতি ফুটবল খেলা ও 'বিচিত্রানুষ্ঠান' হয়েছিল। উৎসবের বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল 'টনসিল্' ও 'ভীমপলশ্রী' নাটক দুটির অভিনয়। এবারের পুনর্মিলন উৎসবের নতুন অঙ্গ হলো গার্ডেন পার্টী। ২৩শে সেপ্টেম্বর '৫৭ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীগণ পানিহাটীতে মিলিত হন এবং খাওয়াদাওয়া-গানবাজনা-খেলাধূলা-প্রতিযোগিতার মধ্যে আনন্দে দিন কাটান। সে দিনের কথা চিরদিন মনে থাকবে।

পরিষদের কর্মসূচীর বিশিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে শুক্রবারের আলোচনা সভা। এ বছর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল ; পাশে প্রধান বক্তার নাম দিলাম—

1. Muscular contraction—Sri Jagneswar Saha.
2. Sex-change—Sri Basudeb Pal.
3. The scientific method—Dr. H. P. Chatterjee.
4. Blood-groups—Sri Basudeb Pal.
5. Emesis—Dr. S. Mukherjee.
6. Physiological problems in space-flight—Sri R. N. Sen.
7. My experiences in the laboratories of England—Sri Pulak Ghosh.
8. Abnormal Hemoglobins—Dr. J. B. Chatterjee.
9. Acetate metabolism—Sri H. D. Singh.
10. Determination of body fat—Sri R. N. Sen.
11. Cell and its functions—Dr. B. D. De.

ঘরোয়া প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন ক'রে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ও বিভাগীয় গবেষক শ্রীঅসীম সরকারকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রীসরকার শারীরবৃত্ত সম্পর্কে উচ্চ গবেষণার্থে গেছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্রীপুলক ঘোষ ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা শেষে বিভাগীয় গবেষণায় যোগ দিয়েছেন।

এই বিভাগের ছাত্রছাত্রী যাঁরা বিদেশে গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা হলেন সুখময় লাহিড়ী (অক্সফোর্ড), অর্চনা বসু (অক্সফোর্ড), দ্যুতীশ দাশগুপ্ত (ম্যাক্‌গিল্), রাজর্ষি মজুমদার (ক্যালিফোর্নিয়া), অসীম সরকার (লণ্ডন)।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত সংবর্ধনা জানানো হয় ১লা আগস্ট '৫৮।

U. S. I. S.-এর সৌজন্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল ২১শে মার্চ '৫৮।

পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রাচীরপত্র 'প্রাচীরিকা'র ঐতিহ্য আজও অম্লান। পরিষদীয় বার্ষিক মুখপত্র Physiological Institute Journal যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে।

ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে মৌলিক গবেষণার জন্য হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কান্তিপদ

চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুখময় লাহিড়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল্ উপাধি পেয়েছেন। এ দের কর্মময় জীবন কামনা করি।

বিদেশ থেকে এ বছর আমাদের বিভাগ দর্শনে এসেছিলেন Australian Institute of Medical Research-এর Dr. Ennor এবং Dr. H. J. Quastel, Prof. of Biochemistry, University of Montreal.

শারীরবৃত্ত পরিষদের সকলেই আমাদের আপন লোক। তাই মামুলী ধন্যবাদ দেওয়া বাদ দিয়ে একটা প্রথা ভঙ্গ করলাম।

বাসুদেব পাল
সম্পাদক, শারীরবৃত্ত পরিষদ

পদার্থবিদ্যা সেমিনার

যে সেমিনারের কার্যবিবরণী দিতে বসেছি তার বয়স মাত্র তিন বছর হতে চলল। এই শিশু-সেমিনারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তার কারণ সহপাঠীদের এ বিষয়ে চরম শৈথিল্য। অবশ্য সম্পাদকেরও যোগ্যতা দরকার, যেটা আমার যথেষ্ট ছিল কিনা বলতে পারি না। কিন্তু যোগ্যতর আর কেউ এগিয়ে না আসায় আমাকেই কার্যতঃ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সে যা হ'ক অনেক অসুবিধা এবং বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আলোচনা সভার আয়োজন করতে পেরেছি তাই যথেষ্ট মনে করি। পাশে প্রধান বক্তাদের নাম দেওয়া হ'ল।

1. Physical applications of integrations—মথুরেশ পোদ্দার।
2. Rockets & artificial satellites—ডাঃ পরেশ সেন চৌধুরী (আমন্ত্রিত)।
3. Atom—ষষ্ঠীব্রত চক্রবর্তী।
4. Fundamental particles—বালকৃষ্ণ গারডিয়া।
5. Relativity—কমলকুমার দত্ত। (আমন্ত্রিত)।
6. Brownian movement—মথুরেশ পোদ্দার।
7. Cosmic Rays—দিলীপ ভদ্র। (আমন্ত্রিত)।
8. Preliminaries of statistical probability—দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও কার্তিকচন্দ্র দাস।
9. Nuclear reactions—মথুরেশ পোদ্দার।
10. Infinite Series—পিনাকীশংকর রায়। (সাম্মানিক গণিত)।

দ্বিতীয় আলোচনা সভাটির জন্য আমি আমাদের সেমিনারের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ডাঃ পরেশ সেন চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উপরিউক্ত আলোচনা সভা ছাড়াও আমাদের সেমিনারের পক্ষ থেকে আর একটি যে কাজ করা হয়েছে তাতে আমরা একটু নূতনত্ব দিতে পেরেছি বলে দাবি করতে পারি। কাজটি হ'ল নবাগত তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রদের জলযোগ সহকারে আপ্যায়িত করা। আপ্যায়ন সভাতে পদার্থবিদ্যা বিভাগের সকল অধ্যাপকদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ঐ উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদের সম্মানিত করেছিলেন।

দীর্ঘকাল পদার্থবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পর আমাদের অতি প্রিয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ডিসেম্বর '৫৭ সালে আমাদের কলেজ থেকে অন্যত্র বদলী হন। এই উপলক্ষে ছাত্র ও

সহকর্মীদের পক্ষ থেকে এক বিদায় সভার আয়োজন করা হয়। ঐ একই সভায় আমাদের নবাগত অধ্যাপক শ্রীসুভাষরঞ্জন বসুকেও তাঁর অন্যত্র বদলী উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

পরিশেষে আমাদের সেমিনার লাইব্রেরী সম্বন্ধে দুটি কথা বলে আমার এই বিবরণী শেষ করতে চাই। এখন যে ব্যবস্থা তাতে উপরিউক্ত লাইব্রেরীটি প্রধানতঃ স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের জন্যই চিহ্নিত। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরীর ভার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের হাতে তুলে দিলেই যেন ভাল হয়। বস্তুতঃ সকল বিভাগেই এরূপ ব্যবস্থা চালু আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

মথুরেশ পোদ্দার
সম্পাদক, পদার্থবিদ্যা সেমিনার

বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

'বোটানিকাল অ্যাসোসিয়েশন অব প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এর ইতিহাস সুরু হয় ১৯৪৪ সালে। ঐতিহ্যময় এর গতি। এ বছর অ্যাসোসিয়েশন-এর নতুন কমিটি গঠন করা হয় গত ২১শে মার্চ। কমিটিতে আছেন—

সভাপতি—ডক্টর পরমনাথ ভাদুড়ী
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—ডক্টর হীরালাল চক্রবর্তী
সেমিনার লাইব্রেরী বিভাগ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—অধ্যাপক হীরেন গাঙ্গুলী
সম্পাদক—শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভঞ্জ
শ্রীহাম্‌সা রামা আয়েঙ্গার
প্রাচীরপত্রিকা (অঙ্কুর) বিভাগ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—অধ্যাপক হীরেন গাঙ্গুলী
সম্পাদক—শ্রীকল্যাণকুমার কুণ্ডু
শ্রীশ্যামলী দত্ত
আলোচনা বিভাগ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—ডক্টর হীরালাল চক্রবর্তী
সম্পাদক—শ্রীরঞ্জিতকুমার মল্লিক
শ্রীশিবদাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক—শ্রীশিবদাস ঘোষ

সেমিনার লাইব্রেরী এবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। অতি আবশ্যকীয় ও মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহের উপর বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

প্রাচীরপত্রিকা বিভাগের পরিচালনা এবার বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করে। 'অঙ্কুরে'র এ হচ্ছে পঞ্চম বর্ষ। এবারকার 'অঙ্কুর'গুলির বিশেষ আকর্ষণ ছিল এর তুলি-শিল্প। এ ছাড়া Genes and heredity, Footprints of Botany, A new phytohormone প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে এই পত্রিকাকে অলংকৃত করে।

আলোচনা বিভাগে কাজও এবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। নিম্নলিখিত আলোচনাগুলি হয়েছিল।

১৮।৭।৫৮ তারিখে chromosomes-এর উপর আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভঞ্জ (ষষ্ঠ বর্ষ), শ্রীরঞ্জিতকুমার মল্লিক (ষষ্ঠ বর্ষ), শ্রীশিবদাস ঘোষ (চতুর্থ বর্ষ)।

১।৮।৫৮ তারিখে chlorophyll-এর উপর আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীপ্রতিমা মুখোপাধ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষ) এবং শ্রীদীপংকর সেন (চতুর্থ বর্ষ)।

২২।৮।৫৮ তারিখে halophytic vegetation of Bengal-এর উপর আলোচনা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীকল্যাণকুমার কুণ্ডু (চতুর্থ বর্ষ) এবং শ্রীশিবদাস ঘোষ (চতুর্থ বর্ষ)।

প্রত্যেক আলোচনাতেই অন্যান্য ছাত্ররা, রিসার্চ স্কলারেরা এবং অধ্যাপকরা যোগ দেন এবং আলোচনাগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করে গেলেন।

Bengal Botanical Society-র আলোচনা সভাগুলিতে আমাদের আলোচনী সভার সভ্যরা যোগদান করেন।

এ ছাড়া ২৮।৩।৫৮ তারিখে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে U. S. I. S.-এর সহযোগিতায় একটি Film show হয়। এতে Gift of Green, Tuberculosis, Streptomycin এবং Forest and Man এই চারটি Film দেখানো হয়।

১৯।৯।৫৮ তারিখে আমাদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে নতুন তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত ও বিদায়ী ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। আবৃত্তি, একক ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনায় সকলেই আনন্দলাভ করেন। সভার প্রথমে ফুলের তোড়ার মাধ্যমে প্রীতিবিনিময় ও সভার শেষে জলযোগের প্রাচুর্যে সভাগৃহ কলমুখর হয়ে ওঠে। সভায় অন্যান্য বিভাগের ছাত্রদেরও অভ্যর্থনা জানানো হয়।

৭।৭।৫৮ তারিখে ডক্টর সতীনাথ ভাদুড়ীকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। ইনি দার্জিলিং সরকারী কলেজে বদলি হয়ে গেছেন।

৯।৯।৫৮ তারিখে অধ্যাপক অশোক কর ও অধ্যাপক নিরঞ্জন পালকে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। অধ্যাপক কর সরকারী বৃত্তি নিয়ে গবেষণার জন্য আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন এবং অধ্যাপক পাল সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে বদলি হয়েছেন। এঁদের আমরা শুভকামনা জানাই।

নতুন এলেন অধ্যাপক চিত্ততোষ দত্ত ও অধ্যাপক অশোক সিংহ। এঁদের আমরা স্বাগত জানাই।

অন্যান্য বিভাগের মতো আমাদের বিভাগেও গৃহসমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল সেমিনার লাইব্রেরীকে নতুন করে গড়বার এবং একটি প্রথম শ্রেণীর মিউজিয়াম গড়বার, কিন্তু গৃহসংকটে তা চাপা পড়ে রইলো। আশা করি নতুন ভবন উদ্বোধনের সঙ্গে আমাদের আশা মূর্ত হয়ে উঠবে।

সুদীর্ঘ এক বছরে আমরা হয়তো কিছুই করে উঠতে পারিনি। আমাদের পরে যাঁরা আসছেন আশা করি তাঁরা অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলবেন। আরও একটা বছর ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল। প্রাচীন বৃক্ষ স্থান ছেড়ে দেয় নতুন অঙ্কুরকে—ঝরা পাতায় থাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শিবদাস ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক, বোটানিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

রাশি-বিজ্ঞান পরিষদ

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল রাশি-বিজ্ঞান পরিষদ। আমাদের হাতে যখন এর কর্মভার এসে পড়েছিল তখন এটা এক কথায় নবজাত। এই এক বছরে এর উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। বই-এর সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। বই দেওয়া-নেওয়া চলছে পুরোদমে।

দুটো বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের পরিষদে। প্রথমটার বিষয়বস্তু ছিল "Some aspects of population studies—with special reference to India"। বক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত রঞ্জনকুমার সোম।

ইনি Indian Statistical Institute-এর একজন পদস্থ কর্মচারী। দ্বিতীয়টার বিষয়বস্তু "Response error of sample survey"। বক্তা ছিলেন আমাদের বিভাগের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র শ্রীবিভাসরঞ্জন দে। দুটো বক্তৃতাই হয়েছিল সারগর্ভ ও উপভোগ্য।

পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা এবার একটা "Sample survey" পরিচালনা করছিলাম। নানা কারণে তা অসমাপ্ত থেকে গেল। আশা করছি আগামী বছরের ছাত্ররা তা সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

এবারে পুজোর ছুটিতে আমরা চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা দিল্লীতে রাশি-বিজ্ঞানের কার্যালয়গুলো (C. S. O. & I. C. A. R) দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের এই ভ্রমণ যথার্থই আনন্দময় ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। সেই সঙ্গে আমরা দিল্লী ও আগ্রার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখে এসেছি।

আমাদের বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ পরিত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। তাঁর এই বিদায়ে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। পরিষদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানান হয়েছে। তাঁর স্থান পূরণ করেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিলন গুপ্ত। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি পরিষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবত দাশগুপ্তকে। গত এক বছরে পরিষদের কাজে আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রচুর প্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি।

রজত গুপ্ত
সম্পাদক, রাশি-বিজ্ঞান পরিষদ

ছাত্র সংসদের কার্যবিবরণী

কলেজ ইউনিয়নের একটা বছর কেটে গেল ; এখন কাজের খতিয়ান যাচাই করবার পালা। কাজ যতটা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি করার দরকার ছিল—এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাধ থাকলেও সাধ্য সব সময় প্রয়োজনের প্রান্তে পৌঁছয় না। তার জন্যে আমরা নিজেরা কতটা দায়ী, সেটা ঠিক বলতে পারিনে—তবে সে পরিমাণটুকু যে অনেকটা—এ কথা নিশ্চিত।

কলেজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যতগুলো কাজ করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্যান্টিনের গোড়াপত্তন করা। এই প্রয়াস বহুদিনের ; এতদিনে তার সম্ভাবনা সূচিত হল। ইউনিয়নের অন্যান্য কাজের মধ্যে যাকে 'ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি' বলে—তার মান হ্রাস পায়নি—বরং বেড়েছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের ইউনিয়নের গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে। ইউনিয়ন চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় 'অফিস ইকুইপমেণ্টস্'-এরও ছিল অভাব। কিন্তু সে সব সামলেও, এই ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পেরেছে—এটুকু স্মর্তব্য।

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বহু অনুষ্ঠান করা হয়েছে। প্রখ্যাত জনেরা তাতে অংশ গ্রহণ করে বাধিত করেছেন। বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে সভা করে আন্তর্জাতিক ছাত্র সংহতি আন্দোলনের আদর্শকে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণেও নিয়ে আসার প্রয়াসের কথা উল্লেখযোগ্য।

সবচেয়ে বড় কথা—'৫৭-'৫৮ সালের ইউনিয়ন দেশের ছাত্র আন্দোলনের প্রগতিশীল অধ্যায়ের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করতে পেরেছে যথাসাধ্য। এ কথা অবশ্য স্মরণীয়।

সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা যে আস্থা রেখেছিলেন '৫৭-'৫৮-র ইউনিয়নের ওপর, ইউনিয়ন তার যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে বলেই মনে করি। এ কথা বলেই বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদান্তে—

পল্লব সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

রবীন্দ্রপরিষদ

পূর্বসূরীর অনুসরণে পরিষদের কাজ মোটামুটি সাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রপরিষদের অনুরাগী কলেজে আছেন দু'দল। একদলের মত, রবীন্দ্রপরিষদের উচিত কলেজের সংস্কৃতি পরিষদের স্থান পূরণ করা। আর রক্ষণশীল দল মনে করেন যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধিত এই পরিষদ ভিন্ন নাম নিলে, তা কলেজের ঐতিহ্যের পরিপন্থী হবে। তাই সম্পাদকের কাছে একটা পথ খোলা থাকে, সেটি হলো মধ্যপন্থা। সাহিত্য ও সঙ্গীত ছাড়া অন্য সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলিতে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের আয়োজন হয়েছিল।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহে পরিষদের প্রথম অনুষ্ঠান সঙ্গীতসম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন দেবব্রত বিশ্বাস, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ রায় ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশান্ত রায় চৌধুরী, জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য, চিত্রলেখা চৌধুরী, গীতশ্রী রায়, সঞ্জয় মজুমদার ও তপোব্রত ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহেই আয়োজন করা হয়েছিল একটি সাহিত্যসভার। আলোচ্য বিষয় ছিল "আধুনিক বাঙলা সাহিত্য"। সভা উদ্বোধন করেন ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত দত্ত ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে একটি কবি-সম্মেলন হয়েছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কলেজের পনের জন ছাত্রছাত্রী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল কলেজের উদীয়মান কবিদের উৎসাহিত করা। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিতর্ক ও সঙ্গীতে সুযোগ পেয়ে থাকেন, কিন্তু সাহিত্যে কোন সুযোগ পান না। পরবর্তী সম্পাদক ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যে আরো সুযোগ দিলে সুখী হব।

প্রীতি সম্মিলনীর মাধ্যমে প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত সংবর্ধনা জানানো হয়।

পূজাবকাশের পূর্বে রবীন্দ্রপরিষদের শেষ অনুষ্ঠান সঙ্গীতসম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও অমল মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক মদনমোহন কুমার ও ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের কাছে তাঁদের অমূল্য উপদেশের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলির জন্য বন্ধু অসীম রায়চৌধুরীর কাছে একান্ত ঋণী। অন্য যাঁদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি, তাঁরা হলেন কল্পনা চক্রবর্তী ও স্বপনা চৌধুরী।

বাসুদেব পাল
সম্পাদক, রবীন্দ্রপরিষদ

বিরাম-পীঠিকা

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার আমরা বাৎসরিক স্টিমার পার্টির আয়োজন করি। আমাদের স্টিমার সকাল দশটায় আউটরাম ঘাট ছেড়ে গতানুগতিকভাবে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে না গিয়ে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট অভিমুখে যাত্রা করে এবং দুপুর ২টার সময় তার গতি ফিরিয়ে সন্ধ্যের সময় আবার কলকাতায় ফিরে আসে। স্টিমারে মাধ্যাহ্নিক আহার, বৈকালিক চা ও আনুষঙ্গিকের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সাড়ে চারশো ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। গত কয়েক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় এবার অন্য কলেজের ছাত্র নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রভাবশালী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও। আমাদের এই সাহসিকতা-পূর্ণ কাজ অধিকাংশ ছাত্রের, বিশেষ করে ছাত্রীদের, জোরালো সমর্থন লাভ করে।

গ্রীষ্মাবকাশের কিছুদিন পর কলেজের আভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। শ্রীমান দীপ্তিপতি মুখোপাধ্যায় (১ম বর্ষ, বিজ্ঞান) দাবা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন। এই প্রতিযোগিতায় শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার নিয়োগী ও শ্রীতুষারকান্তি দাস পরিচালনা-ভার গ্রহণ করে আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কলেজের এই বিরাম-পীঠিকায় দেশবিদেশের পত্রিকা পড়ার সুব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই পত্রিকাগুলি মনোনয়ন করবার ভার ছাত্রদের উপর নেই। ছাত্রদের কমনরুমে স্থানাভাবের অভিযোগটা অনেক কালের। দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী যে মহাবিদ্যালয় এবং যেখানকার ছাত্রসংখ্যা বার শ'য়েরও বেশী সেখানে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হ'লে আমাদের বর্তমান স্বল্পপরিসর বিরাম-পীঠিকার অনুপযোগিতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যাঁরা বলেন, আর্টস্ লাইব্রেরী হলে গল্পরত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের কারণ বিরাম-পীঠিকায় স্থানাভাব—আমি তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কমনরুমে এবার আর একটি বোর্ড কেনায় মেয়েদের আমাদের কমনরুমে খেলতে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। ছাত্রীদের আমাদের কমনরুমে খেলতে দেওয়ার প্রস্তাব ছাত্রছাত্রী প্রত্যেকের কাছ থেকেই অভ্যর্থনা লাভ করেছে। এবার কমনরুমে কয়েকটি আইনকানুনের বিশেষ ক'রে টেবলটেনিস্ বল দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি করায় অনেকে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন অথচ কমনরুমের শৃঙ্খলারক্ষার্থে এবং অপচয় বন্ধের জন্য সেগুলি ছিল অপরিহার্য।

আমাদের সকল কাজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীপ্রণবকুমার রায় যে সাহায্য করেছেন তা উল্লেখ না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের।

সুস্নাতকুমার রায়
সম্পাদক, বিরাম-পীঠিকা

বিতর্ক পরিষদ

বিতর্ক পরিষদের কার্যসূচী পেশ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে অনেকের অনুযোগের কথা যে এবারে বড় কমসংখ্যক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমি তাঁদের জানাতে চাই যে এর জন্য বিতর্ক পরিষদের সম্পাদকের চেয়ে ভাগ্য অধিক পরিমাণে দায়ী।

আমি কাজের দায়িত্ব পাই জানুআরী মাসের প্রথম দিকে। গুছিয়ে বসার আগেই প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ এসে পড়ে এবং এই উপলক্ষে প্রতি বছরের মত এ বছরেও অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে প্রদর্শনী-বিতর্ক (২০শে জানুআরী)। বিতর্কটির বিষয় ছিল "In the opinion of the house parliamentary democracy has been a failure in India।"

এর পরের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় ২১শে ফেব্রুআরী এবং এতে কেবল নতুন তার্কিকেরা অংশ গ্রহণ করেন। ১৪ই মার্চ শুক্রবার আবার একটি প্রদর্শনী-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ বহু খ্যাতনামা তার্কিকেরা অংশ গ্রহণ করেন।

শনিবার ২৯শে মার্চ প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্ক পরিষদের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিনের বিতর্কে কলকাতা সহরের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি যোগদান করেন। জাস্টিস্ জে. পি. মিত্র, শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়, শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীকমল দত্ত, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। বিতর্কটির বিশেষত্ব যে এর বিষয়টি আগে জানান হয়নি। সভাপতি মহাশয় সভায় তা ঠিক করেন। Physics Lecture Theatre-এ বহুদিন এরকম ভিড় হয়নি।

এর পর বার্ষিক পরীক্ষা এগিয়ে আসায় আর কোন বিতর্কের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। কিন্তু জানুআরী মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত যতগুলি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম নয়।

এর পর কলেজ খোলে জুলাই মাসের দোসরা তারিখে। প্রথম ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী কলেজে যোগদান করে যথাক্রমে ১৮ই এবং ২৯শে জুলাই। প্রতি বছর এদের যোগদান করার পরে কলেজে আরম্ভ হয় বিতর্কের মরসুম। আমি এ সময় মাত্র একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত করতে পেরেছি। তবে এর কারণ আছে। কলেজে যে সব দিনে বিতর্কগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তা হচ্ছে শুক্রবার ও শনিবার। এর মধ্যে শনিবারই বাইরের বক্তাদের আনার পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ শুক্রবার তাঁদের অফিস-কাছারী। আমাদের প্রধান বিতর্কগুলি অনুষ্ঠিত হয় Physics Lecture Theatre-এ, কিন্তু এবার পদার্থবিদ্যা বিভাগের কার্যসূচী এরকম ছিল যে শনিবার Physics Lecture Theatre দিতে গেলে তাঁদের তিনটি Honours ক্লাশ নষ্ট করতে হত। তাও ডক্টর রাজেন সেনগুপ্ত বহু ক্ষতি স্বীকার করে আমাদের একটি শনিবার (২৩শে আগস্ট) ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এর পর আসা যাক শুক্রবারের কথায়। প্রথম এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী যোগদান করার পর আমরা প্রথম শুক্রবার পাই ৮ই আগস্ট। কিন্তু এতে রবীন্দ্রপরিষদের সম্পাদক শ্রীবাসুদেব পাল "Freshers' Welcome" করাতে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়নি। এবার আমি এর পরের শুক্রবারগুলিতে কি কি অসুবিধা ছিল তা দেখিয়ে যাব। ১৫ই আগস্ট ছুটি। ২২শে আগস্ট কোন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়নি কারণ ২৩শে আগস্ট British Council-এর সঙ্গে বিতর্ক। ২৯শে আগস্ট কোন তর্কসভা আহূত হয়নি, কারণ ২৮শে আগস্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ British Council-এ গিয়ে বিতর্কে যোগদান করেছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর ছাত্র আন্দোলনের গোলযোগ। ১২ই সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সভা, যা পরে পেছিয়ে ১৯শে করা হয়েছিল। ১৯শে ঐ সভা। ২৬শে বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান। তেসরা অক্টোবর কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচন। ১০ই অক্টোবর কলেজ ইউনিয়নের বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের নির্বাচন। ১২ই থেকে আরম্ভ হয় পূজার ছুটি।

পূজার ছুটির পর দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর আসন্ন 'Test' পরীক্ষার জন্য কোন বিতর্কের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি।

আমাদের কলেজের বক্তারা বাইরের বহু জায়গায় গিয়ে বিতর্কে জয়ী হয়েছেন। আমরা ৯ই মার্চ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত এবং ১৫ই মার্চ হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর দ্বারা পরিচালিত নিখিলবঙ্গ আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছি। ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮তে শ্রীসুজয় শ্রীমাল ও শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন আমাদের পক্ষ থেকে যুব-সংসদ ও U. S. O. দ্বারা পরিচালিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন। আমাদের আরও অনেক বক্তা বাইরের বহু বিতর্কে জয়লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছেন।

এবার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য ও উপদেশ ব্যতীত আমাদের কোন কাজই সম্পন্ন হত না। এ ছাড়াও কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়কে, শ্রীপ্রণব রায়কে, শ্রীসুদর্শন গুপ্তকে ও শ্রীস্বস্তিক মিশ্রকে। অনেকেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, কিন্তু প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকদের, তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য।

হিরণ্ময় কার্লেকর
সম্পাদক, বিতর্ক পরিষদ

মক-পার্লামেণ্ট

এক বছরেরও আগে অনুষ্ঠিত মক-পার্লামেণ্টের এই বিলম্বিত বিবরণীর কৈফিয়ত একাধিক। প্রথমত, অনিবার্য কারণে পূর্বের বিবরণীতে এটি অনুল্লিখিত ছিল। কলেজের প্রাক্তন বিতর্ক পরিষদের কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইভাবে অবর্ণিত থাকায় বিবরণী স্বভাবতই অসমাপ্ত থাকে। সেই ত্রুটি সংশোধনের

অপেক্ষায় ছিল। তা ছাড়া এই ধরনের মক-পার্লামেণ্ট বোধ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্ক পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথম। ঐতিহাসিক মূল্যের দিক দিয়েও এর বিবরণী প্রকাশন একটি কর্তব্য ব'লে মনে করি।

আমাদের জাতীয় লোকসভার অনুকরণে এই ধরনের মক-পার্লামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুকরণ স্বভাবতই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আনুষ্ঠানিকতার দিক দিয়েও নয়। তবুও আমরা আমাদের সীমায়িত ব্যবস্থাপনা ও স্বল্পপরিসরের মধ্যে অনুষ্ঠানটিকে যতদূর সম্ভব সফল করে তুলবার চেষ্টা করেছি। বক্তৃতার সময়-নির্দেশক আলোটি পর্যন্ত বাদ পড়ে নি।

প্রথমেই উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সভ্য-পরিচিতি। প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীবিশ্বনাথন। শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন, শ্রীসুরপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন আঢ্য, শ্রীহিরণ্ময় কার্লেকর এবং শ্রীমতী ইন্দু রামস্বামী যথাক্রমে পরিকল্পনা ও বাণিজ্য, দেশরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, খাদ্য এবং স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। বিপক্ষের নেতা ছিলেন শ্রীজলি কাউল। শ্রীকাউল ও শ্রীসমীর গঙ্গোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রীমণীশ নন্দী ও শ্রীসঞ্জিত বসু প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, শ্রীষষ্ঠীব্রত চক্রবর্তী আর-এস-পির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী ছিলেন স্বতন্ত্র সদস্য। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বিধানসভার অধ্যক্ষকে আমাদের মক-পার্লামেণ্টের অধ্যক্ষ হিসাবে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

সভার কাজ সুরু হয় বিতর্ক দিয়ে। বিতর্কের বিষয়টি ছিল : Under the existing circumstances the 2nd Five-year Plan is to be pruned। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পরিকল্পনা ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথন প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিপক্ষ দলের হয়ে বলেন শ্রীজলি কাউল এবং শ্রীসমীর গঙ্গোপাধ্যায়। বিতর্কের পর আরম্ভ হয় প্রশ্নোত্তর। এক একটি বিভাগের মন্ত্রীকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিভাগ সম্পর্কিত বিপক্ষের প্রশ্নবাণের উত্তর দিতে হয়। অর্থমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সেই বিভাগীয় প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। প্রশ্নকালে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসমীর গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমণীশ নন্দী এবং কয়েকটি চিত্তাকর্ষক উত্তর দেন শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন এবং শ্রীমতী ইন্দু রামস্বামী।

সভার শেষে প্রধান অতিথি শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তরুণ বক্তাদের উৎসাহ দিয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও অনুষ্ঠানটি মোটামুটি সফল হয়েছিল। শ্রোতৃসমাগমও হয়েছিল উৎসাহজনক। স্থানাভাবে অনেককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। এই সব কথা বলবার আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। গত এক বৎসরে কলেজে আর একটিও এই ধরনের অনুষ্ঠান হয় নি। অথচ বক্তা বা সাংগঠনিক কর্মীর অভাব প্রেসিডেন্সি কলেজে আছে বলে মনে হয় না। চেষ্টা করলে বিতর্ক পরিষদের উদ্যোগে কলেজে মাঝে মাঝে মক-পার্লামেণ্টের অনুষ্ঠান অসম্ভব নয় এবং আশা করি ভবিষ্যতে প্রথমটির চেয়ে আরও বেশী সফল হবে।

সঞ্জয় চন্দ্র
মণীশ নন্দী
যুগ্ম সম্পাদক, মক-পার্লামেণ্ট

গার্লস কমনরুম

গার্লস কমনরুম সেক্রেটারীর কাজে এক বছরের জন্য বহাল হয়েছিলাম। দেখতে দেখতে কেটে গেল সে এক বছর। এই এক বছর সেক্রেটারী হিসেবে আমার করণীয় হয়তো অনেক কিছু ছিল কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার জন্য আমি প্রায়, অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও—করে উঠতে পারিনি। আমাদের গার্লস কমনরুমের কোনও 'অর্থকরী উৎসে'র ব্যবস্থা না থাকায়, সাধারণভাবে আমার পক্ষে কোনও

নতুন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। তবে আমার এই কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন, আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ডাঃ সনৎকুমার বসু মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় কমনরুমের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে খেলার সাজসরঞ্জামের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা করা হয়নি। এবং এ বিষয়ে প্রায় প্রতি বছরই সাধারণভাবে মেয়েদের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা যায়।

গার্লস কমনরুম সেক্রেটারী হিসেবে অনেক নতুন কিছু করবার ইচ্ছে ছিল। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন—আমরা অনেক সময় টাকার অভাবে আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি না। তাই আশা করি, সামনের বছর থেকে এদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

এই সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, আমি গার্লস কমনরুম সেক্রেটারীর কাজের অঙ্গ হিসেবে 'পথিকৃৎ'-এর সম্পাদনার ভারও নিয়েছিলাম। এই পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে আমি মাত্র দু'টি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছি। অবশ্য এখনও ঐ পত্রিকার সম্পাদনা আমার ওপরেই ন্যস্ত। আশা করছি আরো কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারব। পরিশেষে এক বছরের অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝতে পেরেছি তার ওপরেই ভিত্তি করে বলতে বাধ্য হচ্ছি গার্লস কমনরুম-এর আরো উন্নতি আবশ্যক। প্রেসিডেন্সি কলেজের মত এত বড় কলেজের পক্ষে এর যে কোন বিষয়ে দৈন্য শোভা পায় না। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

গীতশ্রী রায়
সম্পাদিকা, গার্লস কমনরুম

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

(বার্ষিক বিবরণী)

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা বহুকাল এন. সি. সি. শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমানে আমরা পেয়েছি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং Second Bengal Armoured Squadron, N. C. C., Fort William-এর ক্যাপ্টেন বি. কে. চক্রবর্তীকে। এ বছর কিছু ছাত্র Armoured Squadron-এ এবং কিছু ছাত্র বিভিন্ন Infantry Battalion-এ যোগদান করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অধ্যাপকদের মধ্য থেকে একজন অফিসার পেলে এই কলেজে একটি পূর্ণাঙ্গ Infantry Platoon গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দার্জিলিঙের Himalayan Mountaineering Institute ও কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নেতৃত্বে এন. সি. সি. ক্যাডেটদের পর্বতারোহণের বাস্তব শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কিছু ক্যাডেট নির্বাচিত হন। ওয়ারাণ্ট অফিসার রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এন. সি. সি., (তৃতীয় বর্ষ, ভূগোল অনার্স) পশ্চিমবঙ্গের নং চার সার্কল্-এর ছয়জন এন. সি. সি. ক্যাডেটদের অন্যতম হিসাবে নির্বাচিত হন। আনন্দ ও গর্বের বিষয় এই যে তিনি ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন এবং H. M. Institute-এ নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন ২৪,০০০ ফিট উচ্চে উঠে। রাইফেল-ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় তাঁর নিজস্ব ইউনিটে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি 'সার্টিফিকেট অব অনার' প্রাপ্ত হন। এন. সি. সি.-র সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট পরীক্ষা—'সি'-সার্টিফিকেট পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি।

এন. সি. সি.-র শিক্ষা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং ছাত্রদের সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু করে। এন. সি. সি. ছাত্রদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে।

শোকসংবাদ

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাব্রতী ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে ডাঃ ঘোষের পাণ্ডিত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে এবং ভারতবর্ষে কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম স্মরণীয়। বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি তাঁর অসামান্য কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক মোহিতকুমার ঘোষের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে। আমাদের দেশে বাণিজ্যসংক্রান্ত শিক্ষার বিস্তারে ইনি অন্যতম পথিকৃৎ। ইনি পূর্বে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও ডীন্ ছিলেন।

অধ্যাপক রজনীকান্ত দত্তের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ মর্মাহত হয়েছে। ইনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং এই কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর জ্ঞানার্জনস্পৃহা অদম্য ছিলো; শিক্ষাদান ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত।

অধ্যাপক সুনীতকুমার ইন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত হয়েছি। ইনি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং বহুকাল আমাদের কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার সঙ্গে তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন, ছাত্রজীবনে কর্মসচিব ও সম্পাদক হিসেবে, অধ্যাপকজীবনে সম্পাদনী সভার সভাপতি হিসেবে। মৃত্যুর সময় ইনি হুগলী গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

আমরা এঁদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

PRESIDENCY COLLEGE STUDENTS' UNION COUNCIL

SESSION : 1957 - 1958

Sitting (left to right)—S. Ray (Junior Common Room Secretary), S. Sen (Social Service Secy), P. Sengupta (General Secy), A. Banerji (Vice-President), Dr. S. C. Sengupta (President), G. Ray (Girls' Common Room Secy.), E. Sengupta, J. Basu, A. Bhattacharya.

Standing (1st row)—(left to right)—S. Chakrabarty, P. Ray, A. Raychaudhuri, A. Chatterji, A. Mitra, S. Ghosh, K. Chakrabarty, A. Chaudhuri, A. Maitra, S. Chandra- (Junior Bursar), S. Sarkar, S. Bose.

Standing (2nd row)—(left to right)—Bipin (Bearer), B. Guptabhaya, A. Guha (Ex-editor, Presidency College Magazine), B. Pal (Rabindra Parishad Secy.), H. Karlekar (Debate Secy), D. Sen, S. Bose, M. Pal, A. Ray, D. Mandal (Publication Secy), C. Ghoshal, P. Mukherji (Drama Secy), A. Ghosh.

PRESIDENCY COLLEGE CRICKET CLUB FESTIVAL MATCH (Past Vs. Present Students)

FRIDAY, THE 16TH JANUARY, 1959.

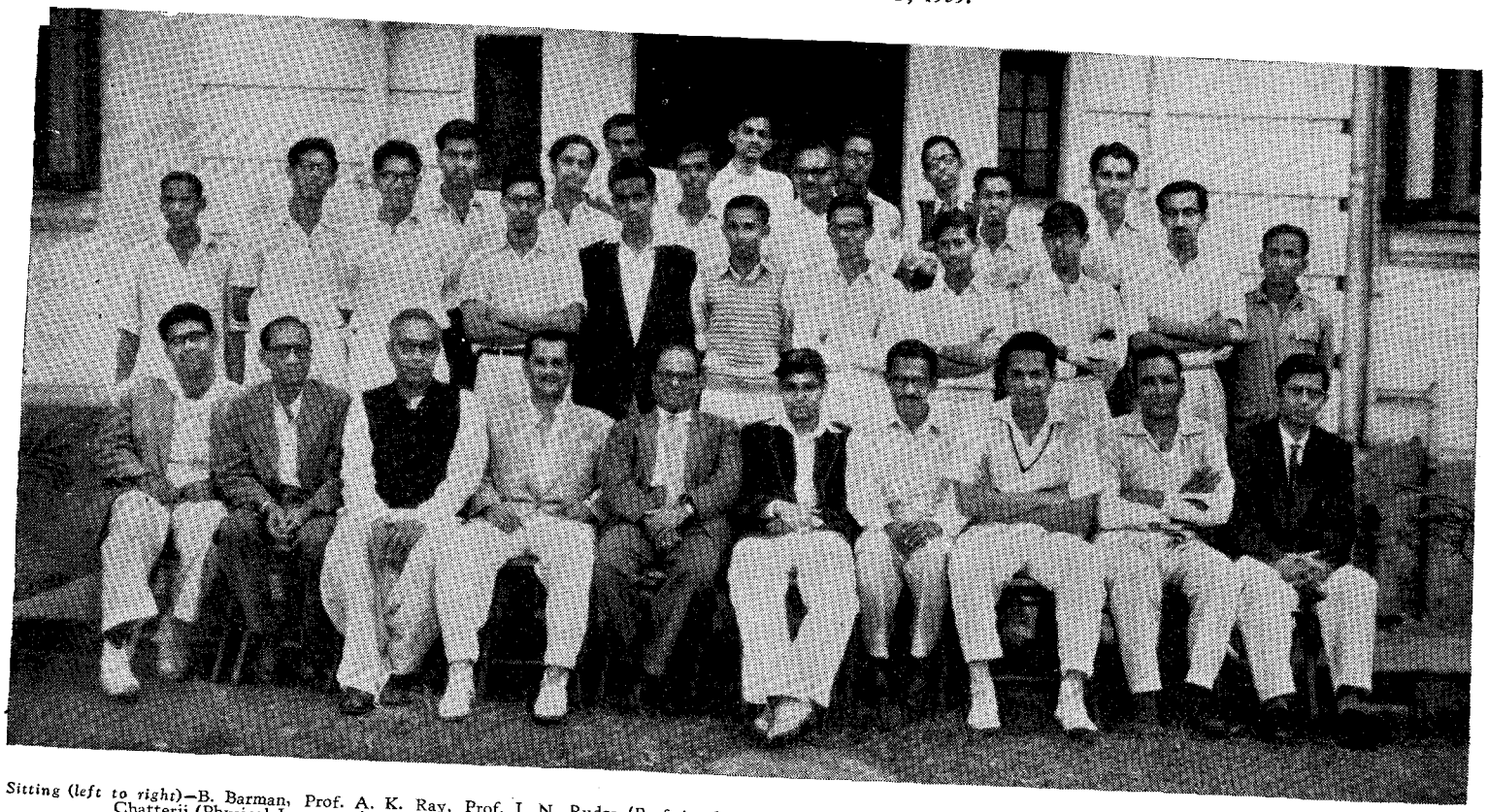

Sitting (left to right)—B. Barman, Prof. A. K. Ray, Prof. J. N. Rudra (Prof.-in-charge), G. Roy (Capt.—Past), Principal S. K. Basu, A. Sinha (Capt.—Present), N. N. Chatterji (Physical Instructor), P. B. Datta, N. Chatterji, P. K. Ray (Secretary).

Standing (1st row)—(left to right)—Chandra (Bearer), S. Dasgupta, A. Ray, R. M. Basu, P. Ray Sarcar, P. Dey, A. Bhattacharya, A. Guha, S. Chatterji, B. Chaudhury, Bostom (Bearer).

Standing (2nd row)—(left to right)—B. Chakrabarty, T. Ganguli, A. Datta, P. Ray, T. Ray, S. Chakrabarty.

Standing (3rd row)—(left to right)—G. Mukherji, P. Ray, P. Auddy, D. Ghosh.

THE
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

APRIL, 1959

Extracts from the Proceedings of the Hindu College Committee relating to the dismissal of Henry Louis Vivian Derozio

PROF. SUSOBHAN CHANDRA SARKAR*

At the Centenary Exhibition of the College (in the Arts Section organised by Prof. P. J. Chaudhuri and colleagues) much attention was drawn to the 1831 volume of Hindu College Records which contains the proceedings relating to the dismissal of H. L. V. Derozio. Through editorial oversight, extracts were not included, as they should have been, in the Centenary Volume. This omission is now being repaired in the pages of the College Magazine.

February 5, 1831

No. 17. Read a letter from Mr. De Rozio preferring a charge against Mr. D'anselme and Requesting the Committee to investigate the matter.

Mr. D'anselme and Mr. Derozio being called upon and required to state the circumstances before the Committee upon which they respectively authorized the Committee in the following manner.

No. 18. "Mr. D'anselme assured the Committee that he deeply regrets having suffered his feelings to get the better of his judgement and under an impression of an insult from Mr. De Rozio which he is satisfied was not intended to use objectionable language and gestures towards that gentleman; he also expresses his regrets for having addressed unbecoming language to Mr. Hare and pledges himself to the Committee that a Repetition of the offence shall not occur."

Signed I. I. (?) D'anselme

* Prof. S. C. Sarkar, who was for a long period Professor and Head of the Department of History in the Presidency College, is now Head of the Department of History in Jadavpur University.

No. 19. "Mr. Derozio declares that in denying the assertion made by Mr. D'anselme of his frequently obtaining permission at an earlier hour to leave the College for the purpose of preparing for his lectures he is not conscious of having used language or gestures calculated to offend Mr. D'anselme that it was far from his intention to have failed in his respect towards Mr. D'anselme and that he regrets that Mr. D'anselme should have supposed he had any intention to treat him with insult or disrespect.

Signed H. L. V. Derozio

Ordered that Mr. D'anselme and Mr. Derozio resume their respective duties.

Ordered that no holiday or halfholiday (the fixed holidays excepted) shall be granted to the College on any account whatever without a written order from one of the Managers.

Saturday, April 23, 1831

At a Special Meeting of the Directors of the Hindoo College held at the College house on Saturday the 23rd April 1831

Present

Baboo Chundro Coomar Tagore—Governor
H. H. Wilson Esqr.—Vice Presdt.
Baboo Radhamadub Banerjea
„ Radha Canto Deb
„ Ram Comul Sen
Da Hare Esqr.
Baboo Russomoy Dutt
„ Prasonno Coomar Tagore
„ Sri Kishen Sinh
Luckynarayan Mookerjea—Secretary

Read the following Memorandum on the occasion of calling the Present Meeting.

"The object of convening this meeting is the necessity of checking the growing evil and the Public alarm arising from the very unwarranted arrangement and misconduct of a certain Teacher in whom great many children have been interested who it appears have materially injured their Morals and introduced some strange system the tendency of which is destruction to their moral character and to the peace in Society.

The affair is well-known to almost everyone and need not require to be stated.

In consequence of his misunderstanding no less than 25 Pupils of respectable families have been withdrawn from the College a list of which is submitted. There are no less than 160 boys absent some of whom are supposed to be sick but many have purposed to remove unless proper remedies are adopted a list of them is also submitted. There have been much said and heard in the business but from the substance of the letters received and the opinion of the several directors obtained the following rules and arrangements are submitted for the consideration and orders of the Meeting.

Read also various letters withdrawing boys from the College.
Read the following Memorandum
Memoranda of the proposed rules and arrangements.

1. Mr. Derozio being the root of all evils and cause of Public alarm, should be discharged from the College, and all communications between him and the Pupils be cut off.
2. Such of the students of the higher Class whose bad habits and practices are known and who were at the dining party should be removed.
3. All those Students who are publicly hostile to Hindooism and the established custom of the Country and who have proved themselves as such by their conduct, should be turned out.
4. The age of admission and the time of the College Study to be fixed 10 to 12 and 18 to 20.
5. Corporal punishment to be introduced when admonition fails for all crimes committed by the boys. This should be left at the discretion of the head Teacher.
6. Boys should not be admitted indiscriminately without previous enquiry regarding their character.
7. Whenever Europeans are procurable a preference shall be given to them in future their character and religion being ascertained before admission.
9. (sic.) Boys are not to be allowed to remain in the College after school hours.
10. If any of the boys go to see or attend private lectures or meetings, to be dismissed.
11. Books to be read and time for each study to be fixed.
12. Such books as may injure the morals should not be allowed to be brought, taught or read in the College.
13. More time for studying Persian and Bengally should be allowed to the boys.
14. The Sanskrit should be studied by the Senior Classes.
15. Monthly Stipends be granted only to those who have good

character, respectable Proficiency and whose further stay in the College be considered beneficial.

16. The student wishing to get allowance must have respectable proficiency in Sanskrit and Arabic.

17. The boys transferred from the School Society's Establishment to be admitted in the usual way and not as hitherto and their posting class to be left to the head Teacher.

18. The practice of teaching boys in a doorshut room should be discontinued.

19. A separate place be fitted for the teachers for their dining and the practice of eating upon the school Table be discontinued.

With reference to the 1 article of the above the following propositions was submitted to the meeting and put to the Vote.

"Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his Scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Chandra Coomar stated that he knew nothing of the ill effects of Mr. Derozio's instructions except from report.

Mr. Wilson stated that he had never observed any ill effects from them and that he considered Mr. Derozio to be a teacher of superior ability.

Baboo Radha Canto deb stated that he considered Mr. Derozio a very improper person to be intrusted with the education of youth.

Baboo Russomoy dutt stated that he knew nothing to Mr. Derozio's prejudice except from report.

Baboo Prosonno Coomar Tagore acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his disadvantage.

Baboo Radha madub Banerjea believed him to be an improper person from the report he heard.

Baboo Ram Comul Sen concurred with Baboo Radha Canto deb in considering him a very improper person as the teacher of youth.

Baboo Sri Kishen Sinh was firmly convinced that he was far from being an improper person and Mr. Hare was of opinion that Mr. Derozio was a highly competent teacher and that his instructions have always been most beneficial.

The majority of the managers being unable from their own knowledge to pronounce upon Mr. Derozio's disqualifications as a teacher the Committee proceeded to the consideration of the negative question.

Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindoo Community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College.

Baboos Chandra Coomar Tagore, Radha Canto deb, Ram Comul Sen, and Radha madub Banerjea Banerjea (sic.) voted that it was necessary.

Baboos Russomoy dutt and Prasonno Coomar Tagore that it was expedient and Baboo Sri Kishen Sinh that it was unnecessary.

Mr. Wilson and Mr. Hare declined voting on a subject affecting the state of native feeling alone.

Resolved that the measure of Mr. Derozio's dismissal be carried into effect with due consideration for his merits and services.

Proceeded to consider the rest of the proposed rules.

Resolved that Rule 2 was unnecessary the Committee having already the power of dismissing any boy from the College by Rule of the printed Regulations.

Resolved with regard to rule 3 that the Regulation of the conduct of the boys in this respect is best left to the Parents themselves who if they have reason to think that the College is the cause of hostility to Hindooism in their children can at any time withdraw them from it.

Resolved that article 4 is unnecessary.

Resolved that Rules 5 & 6 be adopted.

Resolved that Rule 7 be adopted in the following form.

"In future a preference shall be given to qualified European Teachers whenever procurable and after due investigation of their moral and religious character."

Resolved that Rule 9 be adopted with the addition—without some satisfactory reason.

Resolved that the Managers have not the power nor the right to inforce the prohibition prescribed by Rule 10 and that the conduct of the boys in those respects must be left to the regulation of their friends and relations.

Resolved that Rules 11 and 12 be adopted also Rule 13 with the addition "whose friends are desirous they should learn those languages."

Resolved that Sanskrit and Persian are actually studied by the first Class but that little progress has been made or can be expected under the present system of teaching and that the best methods of improving these branches of study remain for further consideration.

Resolved that the provisions of Rule 15 are already in force and that it is not in the Competency of the Committee to adopt the 16 Rule, the scholarships being established by the Committee of Public Instruction for proficiency in English.

Resolved that Rule 17 be in future adopted in concurrence with Mr. Hare.

Resolved that Rule 18 be left for further consideration and that Rule 19 be adopted.

Read the following correspondence with the Editor of the Sambad Probhakor.

To
The Proprietors of the Sambad Probakor

Sir

Having observed a letter in your paper of the 15(?) April No. 12 reflecting in very unbecoming language upon the character of the teachers of the Hindoo College—I have to request your informing me of the writers name that legal measures may be adopted for his punishment.

I am etc.
Luckynaron Mookerji
Secy. H. College

Hindoo College
the 19 April 1831

To
the Secretary to the Hindoo College

Sir

In acknowledging the receipt of your letter dated 19 Instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12th No. of the Publication, I am authorized in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letter to bring the Colleges institution or the characters of its teachers and Members as a body into hatred and Contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a Public journal to meet your calls as Secretary of the College, when the writer positively denys any intention to have offered any unbecoming language either towards the institution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

I am etc.
(Signed) Isher chunder Gopto
Editor Proprietor of Probhakor

23d April 1831

Resolved that the following letter be written to the Editor

To
the Editor of the Sumbad Probhakor

Sir

I am desired by the Managing Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23d Inst it has not been considered as altogether satisfactory. They expect therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputations against the teachers of the Hindoo College.

I am etc,

May 7, 1831

——— The following letters were submitted relative to the boys who have left College since the Special Meeting.

(13 letters of withdrawal)

——No. 30. Letter from Mr. Derozio communicating his resignation and commenting on the Resolution of the Committee passed at the Special Meeting to dismiss him without examining the circumstances thereof and affording him time to vindicate his character from those accusations which have been fixed upon it.

—25 April

No. 31. Letter from Ditto furnishing replies to the Queries put on him by the Vice-President as to have inculcated the following lessons. Firstly Denying the existence of God. Secondly disrespect to Parents, & thirdly marriage with sisters.

—26 April

Resolved that these letters be circulated to the Committee of Management.

Note : Extensive comments are superfluous but a few points may be noted: (i) Three members of the Committee constituted the spearhead of the attack: Radha Kanta Deb, Ram Kamal Sen, Radha Madhab Banerji. The Memorandum with the proposed new 'rules' was evidently their document. (ii) Three other members declined to put on record the condemnation of Derozio's capacity as a teacher but agreed to the dismissal: the 'governor' Chandra Kumar Tagore as a 'necessary' step, Prasanna Kumar Tagore and Rasamoy Datta as merely 'expedient'. (iii) One Indian member, Sri Kishan Singh, consistently opposed both the condemnation and the dismissal. (iv)The two Europeans among the nine Committee members felt Derozio to be a very able teacher but abstained from the vote on dismissal as "native' sentiment had become the question at issue. (v) The Memorandum was a determined attack on the 'advanced' pupils, proposing expulsions and curtailment of student rights but the success in getting rid of Derozio possibly mollified its sponsors and no drastic action was taken against the students. (vi) The allegation that withdrawals of boys were due to Derozio's excesses is largely disproved by fresh withdrawal after his dismissal. (vii) The Memorandum expresses a certain conservative

distrust towards too much Western education (Rules 13, 14, 16). (viii) There was also a veiled attack on David Hare (Rule 17). I have discussed elsewhere (in a forthcoming paper) Hare's links with the Derozians. (ix) Something like a newspaper campaign against the 'new thought' was in the offing (the correspondence with Iswar Chandra Gupta of the Prabhakar *above). (x) Derozio was dismissed without a hearing. His defence in the resignation letter and his long deservedly-famous epistle to Wilson demand, for their present inaccessibility, reprinting in full in the College Magazine. Nor should it be overlooked that the present year marks the 150th anniversary of the birth of Derozio, surely the most remarkable teacher in the annals of our College.*

ON THE HOUSE

On being appointed to the Indian Educational Service and posted as a Professor of English in the Presidency College, Mr. Humphry House wrote a letter to Professor Profulla Chandra Ghosh requesting the latter to find out a place for him to stay in Calcutta. Prof. Ghosh was in a fix, for he had not the least idea as to what sort of a place would be suitable for an European to stay in. However, he did the best he could, and engaged a single room for Mr. House in the Y.M.C.A. hostel in Mechuabazar. On the day of the professor's arrival, Prof. Ghosh went to the port to receive him. At the port he was informed by some English officers, who too had gone to receive Mr. House, that they had booked a suite of rooms for Mr. House at the U.S. Club.

As soon as he landed, Mr. House walked straight up to Prof. Ghosh and asked him whether he had fixed him up a lodging. Prof. Ghosh informed him that a room was ready for him in the Y.M.C.A. hostel for students, but that that probably would not be necessary since the other gentlemen present had already engaged rooms for him elsewhere.

"Where do *you* want me to stay?" Mr. House asked the officers. "At the U.S. Club, Sir," they replied. "It will be quite in keeping with your prestige if you stay there, because it is meant strictly for Europeans".

"Well," said the professor, "there are so many of you to carry on the white man's burden! I would much rather stay with the students."

[Mr. House was seen in two College functions clad in a *dhoti* and *punjabi,* and his wife wearing a *sari*].

—Dibyadyuti Hazra, *Fourth Year, Arts*

Acharya Jagadish Chandra Bose

PROF. PRIYADA RANJAN RAY

Though I am not a student of physics or physiology or of psychology, to the unification of which the great Acharya made his remarkable contribution, yet my title to writing these few lines in the Presidency College Magazine on the life and work of Acharya Jagadish Chandra Bose, a pioneer in science, rests on the following grounds. In the first place I had the good fortune and privilege of sitting at his feet in this college in 1906-1908, while a student in the B.A. (B. Course) class. Secondly, I have often felt inspired by his ideas and ideals. For, these ideas and ideals were akin to those of the ancient Indian civilization and culture, as preached by its sages and seers. Hence these ideas and ideals run through our veins, though we may often be unaware of them and even disown them by trying to imitate those of recent origin. Now, what are these ideals? These ideals, as we are aware, relate to the conception of truth and knowledge as an integrated whole. Ancient Indian sages and philosophers laid a great stress upon this fundamental conception. They tried to realize this ultimate truth or supreme knowledge, which they called জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্, through supersensuous perception and meditation. But even in their pursuit of practical sciences they never lost sight of this goal. Therefore, it is no wonder that in almost all ancient Indian treatises on medicine, astronomy, chemistry or biology we find philosophical and religious discourses intermingled with experimental descriptions, though sometimes in an incompatible manner. Acharya Jagadish Chandra's life and work may also be looked upon as a great intellectual adventure in the task of unifying the whole group of phenomena that were explored separately before under the name of different branches of knowledge, physics, physiology and psychology.

The growth of modern science in Europe during the renaissance period, however, proceeded in a different way. Knowledge was pursued there in a compartmental fashion. This led to the development of something like a caste system in the search for truth resulting in the establishment of different branches of science with their different disciplines. This had its wholesome effect to begin with, as it prepared the ground by collection of facts and materials. But the entire aspect of truth, or the integrated knowledge about reality, cannot be revealed thereby. No universal generalisation, or the formation of a law of nature that is valid under all circumstances, is possible by observations within a limited sphere. This system of searching for truth is beautifully illustrated in the ancient Indian

philosophies by an example which is now familiar to all. This refers to the story of a number of blind persons, each relating his own experience of the shape and size of an elephant or what it looks like, when they were permitted to examine the animal. Each differed from the other in his description, depending on the part of the body of the animal he happened to feel by laying his hand thereon. Fortunately with the advancement of science scientists have realized the imperfection of their system of search for truth by compartments, with the result that many new branches of science are now springing up dealing with the borderland regions between two or more basic sciences or their subdivisions. Acharya Jagadish Chandra with his inherent tradition of early Indian culture realized it long before others and had the courage and boldness to assert before the scientific world that the knowledge of reality can never be attained if we confine our study only to limited spheres. It was for this reason that Acharya Bose at once switched on to a new line of research dealing with response in the living and non-living, abandoning the very fruitful field of electro-magnetic micro-waves which brought him a great reputation and recognition in the scientific world. The observation that the artificial retina or the receiver of his electric waves suffers from fatigue on continued use, and recovers its original power by rest or stimulation just like a living tissue, at once revealed before his mind a new world of investigation. This led Bose to devise and demonstrate numerous experiments of extraordinarily simple character but of extreme precision, which proved beyond all doubt the similarity of responses in the living and non-living matter to external stimulus. His synthetic mind with its characteristic Indian tradition at once perceived in the results of these investigations a continuity in the phenomena of living and non-living, a constant property common to all forms of matter. In other words, as he himself expressed it, "the results simply illustrated and supported the general tendency of science to seek, wherever facts permit, a fundamental unity amidst the apparent diversity."

The subsequent series of his investigations for a long period may be viewed as a continuation and amplification of his work on the responses in the living and non-living. In these he occupied himself with studying the response phenomena in plants which stand in the midway between the inert inorganic matter and the living conscious matter in the order of evolution. By designing and constructing instruments of extraordinary fineness and magnification like resonant recorder, magnetic crescograph and other similar contrivances he showed that there is a close similarity between plants and animals in their physiological reactions; the nature of his researches then took a turn from physics to physiology. His study on plant response and plant physiology admirably supported and confirmed his view based on the previous investigations that there is a continuity

and fundamental unity in nature. If he would have confined himself to physics alone this remarkable generalisation could not have possibly received its experimental verification in such a convincing manner today. As a matter of fact, there were no dearth of detractors to begin with, particularly among the physiologists, who advised Bose to confine himself to his own region of physics instead of encroaching upon other people's reserve. This caste system in science, as was prevalent for a long time, obviously stood in the pursuit of truth in its integrated form, which was the objective of the ancient Indian sages and which Bose adopted as his ideal by inheritance.

From a consideration of the results of Bose's researches there emerge two divergent and almost diametrically opposite views about the nature of the physical world. One is the materialistic view, holding that even consciousness and life are the by-product of matter, resulting from rearrangement or reaction of certain characteristically organised chemical molecules under the influence of environmental stimulus. Many scientists seem to adhere to this view, and they refer to the development of the discipline of cybernatics in its support. Another group of scientists, whose number is possibly limited, holds, on the other hand, that all matter, living and non-living, are impregnated with consciousness or an intelligence stuff manifested in various gradations from inert inorganic matter to the most highly evolved organised being as represented by man. To them matter is the by-product of consciousness or a vital essence. Acharya Jagadish Chandra belonged to this second group, and following his ancestors, the ancient Indian sages, believed in the existence of a supreme intelligence pervading the universe at once as its cause, ingredient and law.

Bose's researches also helped greatly to remove that wrong impression and prejudice which the western scholars used to entertain about the aptitude of the Indian mind for exact and precise experimental scientific research. It was a commonly held belief in the West that the East excelled in metaphysical speculations even to subtlety, and the West had the monopoly of those phrenological ingredients that create talent for exact science. The experimental rigour and exactitude of his work, and the exquisite refinement, yet simplicity, of the instruments constructed by him, starting from his first wave transmitter and receiver to the highly delicate and faithful recording instrument like magnetic crescograph, bear an eloquent testimony to the ability of Indian minds for mastering the technique and methods of exact science in no less measure than for acquiring the art of philosophical and religious contemplation. Bose thus demolished the prejudice of western scholars once for all.

We have yet to learn two great lessons from the life of Acharya Bose. As a scientist he has demonstrated that knowledge and truth should be pursued as a whole, following the tradition of ancient India. Never knowing but in part, there is no place for dogmatism in science. Stating in

his own words "we should not lose sight of the fundamental fact that there can be but one truth, one science which includes all the branches of knowledge." In the course of his own researches he bridged the gulf between the visible and invisible light by the study of electric waves. From a study of the fatigue of his receivers he discovered the universal sensitiveness inherent in matter, as shown by electric response. This subsequently led to the demonstration of resemblance between the living and non-living, as well as between the plant and animal life. The lines of physics, physiology and psychology may be said to converge and meet as a result of his researches.

As a man he has demonstrated by the example of his own life that want of money, materials, facilities and well-equipped laboratories is not always a serious obstacle to the pursuit of truth. He used to emphasise that the real laboratory lies in the heart of the worker himself. It is the inner vision which supplies the spirit of enquiry. For this, what is most needed is an integrity of purpose and a dedication without distractions. To quote again his own words, "It is not for man to complain of circumstances, but bravely to accept, to confront and to dominate them, and we belong to that race which has accomplished great things with simple means."

We are celebrating today the birth centenary not only of a great scientist, but also of a great soul, a great philosopher and a great patriot who upheld the ideal of India's past civilization and culture. For, he served and pursued science not for acquiring power, pelf or fame, but for its spiritual value and for the glory of India, the country of his birth. As an illustration let me now conclude with the following excerpt from his inaugural address in dedication of the Bose Institute on November 30, 1917:

"The thrill in matter, the throb of life, the pulse of growth, the impulse coursing through the nerve and the resulting sensations, how diverse are these, and yet so unified. How strange it is that the tremor of excitation in nervous matter should not merely be transmitted and reflected like the image on a mirror from a different plane of life in sensation and in affection, in thought and in emotion. Of these which is more real, the material body or the image which is independent of it? Which of these is undecaying and which of these is beyond the reach of death?

"Not in matter but in thought, not in possessions nor even in attainments but in ideals, is to be found the seed of Immortality".

Acharya Jagadish Chandra has made himself immortal by his ideas and thoughts, which he has handed down to us for our inspiration and guidance.*

---

* Based on a speech of the writer in a symposium held at the Presidency College on the occasion of the birth centenary of Acharya Jagadish Chandra Bose.

Extracts from the writings and speeches of Bipin Chandra Pal

I

"My first acquaintance here (at the hotel where he stayed in New York) was a gentleman who had been an inmate of the hotel for many years. As soon as I arrived, the manager of the hotel asked me if I would like to go to my room first or meet a gentleman who had been waiting to see me from the time my steamer was signalled. Naturally knowing that he must have left his business for three or four hours with this object I asked the manager to immediately take me to him. He was waiting in the reading room of the hotel. As soon as I entered he got up and putting forward both his hands gave me a most cordial greeting saying, 'You come from a great country, Sir, you are a representative of a great nation, who are destined to be the teachers of the world.' This enthusiastic greeting almost took my breath away.

"My first idea was that he must be a disciple of Vivekananda, a convert to our new-Hinduism of which Vivekananda was an apostle in America. I have an instinctive mistrust of the judgment of converts. But before long I discoverd that this new friend of mine was not a disciple of Vivekananda, nor a convert to Hinduism. He was a loyal member of the American Presbyterian Church. In fact, when he found that I was lecturing on the religion of the Brahmo Samaj, criticising orthodox Christian doctrines and dogmas, he openly condemned my propaganda, saying that my place was not in America but in my own country, where I must work for the emancipation of my people to qualify them for discharging their high mission as teachers of the modern world. He told me that with a view to discharging this great mission, we people of India, must be able to 'look civilised humanity horizontally into the face.' The expression struck me as original. He explained himself by adding that the world would not receive its lessons, however, true or lofty these might be, from a slave. Our first duty therefore was to work for the liberation of our country from the British yoke. Until we had achieved this, we had no business in America."

II

"It is easier to plunge oneself, like Brutus of old, horse and all, into the dark abyss, before the eyes of the admiring multitude, than to live laborious days, working up the national life by hourly sacrifices of life

and happiness, and eaten up by the gnawing cares of complex duties and unsatisfied longings. To die oneself through sudden violence is easier than to see one's own earth and home crumbling to dust inch by inch, one's dear ones slowly moving towards the grave through the privations of self-imposed penury, and one's ideal of art and beauty and love and life standing for ever unrealised. This is a severer trial, it is a heavier yoke; and yet the sacrifices that patriotic duty demands of us in these peaceful times are of this prosaic and inglorious kind. Are we prepared to make them? Shall we take this yoke up?

"This question has not a mere theoretic value. This seems to us to be the most urgent and practical question of the hour in India. Indian patriotism will have to answer this question soon; and upon the answer that it will give will depend the future of this hapless land.

" 'Heaven helps those who help themselves'—an old saying this; but it will soon be out to a new test in this country. We have too long looked for help from the outside to work out our problems.

"We have always been begging, and begging, and begging. The Congress here, and the British Committee in London, are both begging institutions. We have given a new name to begging; we call it agitation. But agitation in England by the British citizens, who have real political power in their hands, who control elections, who control the constitution of the national legislature, upon whose pleasure ministers of the crown have to wait for the continuance of their official life,—agitation by such a people is essentially different from our agitation. They can demand, and if not satisfied they can constitutionally enforce their demand. But we, —we can only pray and petition, beg and cry; and at the most fret and fume, and here ends all.

"Our agitation has been successful in a way. Begging brings sometimes a few bits of crumbs, and these we had, now and again. Oh, stop that horrid cry; and since the feeding-bottle could not be spared from the child of the house, the baby-comforter, soft, hollow and empty, is thrown to the foundling outside the door. Let us not therefore continue in the grievous mistake that our agitations have brought any real, solid advantage. Our agitations have done us great good, as instruments of political training, and have helped the growth of a national sentiment among us. These are not slight gains. For these we value agitations: as a training we must carry them on. But no rights really we have got through them, or perhaps ever will. Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice. And the time perhaps is coming, faster than we had thought, when patriotism will be put to this new test. Will it be able to stand it? Time will show."

III

"If anything could prove the utter futility of our so-called methods of constitutional political agitation, with a view to enforce the will of the people upon those who are vested with the authority and functions of the State in this country, the history of the agitation against the proposal to partition Bengal has done it.

"No amount of petitioning or memorialising, no number of deputations sent from here to England, will change this attitude (of non-responsiveness). It is only the growth of a mighty and moral power among the people themselves, among the masses, and by the organisation of the forces of the nation under the leadership of the educated classes, that will alone secure the reforms we so sorely want, and remove the grievances that we suffer under at present.

"Not agitation but organisation must be our watch-word today."

IV

"A protest is always demoralising unless it is followed by action. The educated classes among us have been exceedingly demoralised owing to their readiness to protest against unpopular and mischievous measures of the Government, while they lack the strength and the courage to follow these protests up by adequate action. This is why Lord Curzon characterised, with some amount of truth it must be said, our platform orations as mere soda water eloquence. The ridicule was deserved. But the time is fast coming when even the soda water eloquence must cease to effervesce, or people must make up their mind not only to pass but also to make strong resolutions."

V

"As in religion, so in politics, fear is the beginning of wisdom. The fear of the people is the mother of all reforms in despotic and bureaucratic administrations."

VI

"A benevolent despotism by its very mildness makes people absolutely indifferent to all public affairs, and thus insidiously kills all public life and civic enthusiasm in them. And when a people lose their public life and spirit, they necessarily become more and more selfish and parochial. Our pettinesses and little jealousies are not due to anything that is inherent in our national consciousness, but are the direct fruits of our deprivations of political life and liberty."

VII

"I want more extended political rights for my countrymen, but I do by no means want to secure them at the sacrifice of Truth, Justice, Love and Humanity. And I strongly condemn that political agitation which degrades Truth, lowers Justice, stifles Love, and kills Humanity. I condemn that political agitation which makes me a patriot before a man; ..."

Bipin Chandra Pal

From Moderatism to Extremism

By

PROF. UMA MUKHERJEE

Ex-student

Those who think that Bipin Chandra Pal immediately after his return from the West set himself to the propagation of radical political thought for the country betray a lamentable ignorance of facts.[1] Even on his return from the Western world in 1900, he still continued to cherish the old-time belief in the justice and generosity of the British and regard the English rule in India as a sort of a Divine Dispensation. And in this psychological affinity he was quite on a par with the older leaders of the Congress like Surendra Nath Banerjea, Pherozshah Mehta, Gopal Krishna Gokhale and Dadabhai Naoroji who had so long confined the Congress agitation to some small and narrow objects, with their mendicant technique of prayer, petition and protest to redress grievances. This deep-rooted conviction of the old guards of the Congress in the moral basis and foundation of British rule in India was still shared by Bipinchandra during 1901-1902. On the occasion of the Shivaji Festival held in Calcutta in 1902 (first introduced in Bengal in the same year), Bipinchandra spoke in the following vein :

"Nor is the realisation of our highest national destiny, necessarily, in any way inconsistent with the realisation of the highest ideals of the Empire of which we form so large and vital a part. Though so far in many respects, kept out of our legitimate heritage, we too, Sir, are children of the British Empire, and are therefore loyal to its highest and purest in-

[1] Vide *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* under the joint-authorship of Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee (Cal., 1958).

terests. And we are loyal, because we believe in the workings of the Divine Providence in our national history, both ancient and modern; because we believe that God himself has led the British to this country, to help it in working out its salvation, and realise its heaven-appointed destiny among the nations of the world. And as long as Britain remains at heart true and faithful to her sacred trust, her statesmen and politicians need fear no harm from the upheaval of national life in India, of which, this movement and other movements of its kind, are such hopeful signs".

Again, in an article entitled "Loyalty in India", published on August 7, 1902, Bipinchandra expressed himself thus:

"Loyalty literally means devotion to Law. And in this literal, this radical sense, it is true that we are loyal, more loyal indeed than the general body of our fellow subjects either in Great Britain or Greater Britain can ever claim to be. Submission to law, allegiance to constituted authority, these are cardinal virtues with us. They are inherent in our mental and moral constitution. They are parts of the intense conservatism of our national character. Our loyalty,—in the sense of allegiance to law and constituted authority—is so natural, unconscious, so automatic indeed, that no effect is needed on the part of the Government to train us in this virtue ... The Indians accept 'the existence of the British Government', as Sir Henry Cotton truly says, 'as an irrevocable necessity which has done immense service to them'."

These speeches and writings of Bipinchandra reveal him more as a non-political cultural enthusiast than as a pronounced political idealist and propagandist during 1901-02. This is also clear from the editorial comments offered by Bipinchandra on a long letter of Hemendra Prasad Ghose which was published in *New India* on November 11, 1901. In that article entitled "The Congress—Is It Alive?" published in the Correspondence section of the journal, Hemendra Prasad Ghose made a very rude criticism against the prevailing policy and method of work of the Indian National Congress. Yet in 1901, such naked criticism of the Congress as offered by the Correspondent seemed too violent and radical to the Editor of *New India* who warned the readers not to mistake "his (Mr. Ghose's) views for ours" in a brief editorial note published simultaneously with the said letter of "H.P.G." i.e. of Hemendra Prasad Ghose. The truth of the matter is that Bipinchandra had not as yet become a severe critic of the Congress in whose utility and power of beneficence he had much faith still in 1901-02. The radical attitude that Aurobindo Ghose had adopted to the Congress movement even as early as 1893-94 in his writings in the *Indu-Prakash,* was still conspicuous by its absence in Bipinchandra.[2] Even

[2] Vide our joint-work on *Sri Aurobindo's Political Thought (1893-1908)*, which contains a careful selection of certain rare political writings of Sri Aurobindo during the period stated in the title.

in 1903 the latter could not shake off the spell of traditional Congress politics. The absence of a single reference to *New India* in the Government's Weekly *Confidential Report on Native-Owned English Newspapers in Bengal* for the entire period from July to December, 1903 is also suggestive of the deeper truth that *New India* had not yet acquired any pronounced political bias and complexion.

But a change in the tone of the journal was slowly manifesting itself on the surface from the beginning of 1904. The question of the Partition of Bengal, officially presented to the public for the first time in the Risley Letter of December, 1903, gave rise to an outburst of indignation and protest in the country, particularly in Eastern Bengal. The Anti-Partition agitation that was provoked as a reaction to the policy of bureaucratic highhandedness soon became the focal point of Bipinchandra's attention, and he gave a very faithful expression to the new spirit in his journal. *New India* was gradually changed in this background from a predominantly cultural magazine into a manifestly political organ. Times were fast changing. The old belief in India's salvation through British generosity was being rudely shaken. A revolutionary enthusiasm was rapidly growing; new conceptions of patriotism and politics were taking shape. A new consciousness of India's power and greatness was abroad in the country. Like a true leader of men Bipinchandra flung himself headlong along the drift of the current to which he simply added a mightier force and momentum both by his speech and writing.

In an address delivered in the Calcutta Town Hall on the occasion of the anniversary of the Brahmo Samaj (January, 1904), Bipin Chandra Pal characterised the recent political "changes and transformations" through which the country was passing "as almost revolutionary". He said:

"The conflict of opinions and ideals between the governing body and the governed, and the clash of interests between the members of the ruling race and the children of the soil, which were hardly pronounced then (i.e. *25 years ago*) have become most serious and acute to-day. The natural self-assertiveness of the educated classes, their legitimate demands for absolute equality of treatment between themselves and the white subjects of the King, not only in theory, before the law, but equally in practice, before the Courts, and in the different walks of public life; their condemnation—not always moderate or respectful—of unjust or injurious administrative measures; their merciless exposure of official folly; and, above all, their open avowal of an ideal of national freedom and autonomy;—all these acting upon the reactionary, the retrograde; and the repressive tendencies of modern British Imperialism have worked together to kill the old idealism of the British administrators in India, and the old faith of the people in their saving mission and power".

Bipinchandra presented here a clear exposition of the new political ideals that were already looming on the horizon. True to the spirit of the new gospel of which he himself was an avowed champion, he also demanded a thorough-going change in the old methods of political agitation as a very necessary condition of our national regeneration. The utter contempt with which the universal protests of the Bengalis against Partition was treated by the Government exhibited in bold relief how helpless were Indians even in the land of their birth. The futility of the old method of agitation through prayer, petition and protest now became increasingly apparent. The need for a new and vigorous line of action to meet the bureaucratic challenge was felt more deeply than ever. The mental and emotional transformation of Bipinchandra from moderatism to extremism both in political ideal and method of work was swiftly taking place, and this evolution was clearly revealed in that issue of *New India* (December 21, 1904) which, according to Government Report, stated thus:

"The belief that England will of her own free will help Indians out of their long-established Civil servitude and establish those free institutions of Government which she herself values so much was once cherished, but all hope has now been abandoned.

"What India really wants is a reform in the existing constitution of the State, so that the Indians will govern themselves as other nations do, follow the bent of their own national genius, work out their own political destiny, and take up their own legitimate place, as an ancient and civilised people among the nations of the world".

The formal inauguration of the Swadeshi Movement in August, 1905 presented to Bipinchandra a much broader field and an ampler scope for his political activity.[3] Constantly in touch with the crying needs of the nation, Bipinchandra threw himself heart and soul into the new-born national movement of which he was destined to become the most trusted and accredited leader. When the Boycott Resolution was first adopted in Calcutta on August 7, 1905, even many of the leaders felt diffident of its ultimate success. As Bipinchandra himself said at Rangpur in course of a speech delivered on January 19, 1907:

"When these proposals were first made, many were of opinion that they could not be acted upon; not to speak of others, I myself had doubts as to our success. Three successive meetings were held in Calcutta in this connection. At the last meeting in the Curzon Theatre about 6000 persons were present. I came out and said: 'Will you be able to boycott British goods until the partition is annulled?' In one voice the audience shouted 'boycott for ever'."

To this mandate of the people Bipinchandra readily responded, for

[3] Vide our joint-work on *India's Fight for Freedom* or The Swadeshi Movement (Cal., 1958).

the voice of the people was to him the voice of God. Thus he emerged towards the end of 1905 as the greatest leader and architect of the national movement into which he infused a moral tone altogether new. The national upheaval of 1905 commenced with the cry for Boycott and Swadeshi symbolising a protest against a particular administrative abuse, viz., the Partition of Bengal, but as the movement progressed, other ideals, more radical and revolutionary, such as National Education and Independence, were introduced into the scene and found intoxicating. The new passion for liberty very few of our countrymen could articulate so early and so faithfully as Bipinchandra. Aurobindo Ghose who was soon to create a new epoch in politics as being the recognised leader of the most advanced party in the country was still working in the background. Surendra Nath Banerjea who had done so much in an earlier period to rouse the slumbering soul of the nation and had rightly earned the coveted title of the 'Father of Indian Nationalism' was fast becoming a moderate, and, consequently, losing his hold on the imagination of the rising generation that now clamoured for a new policy of action and self-sacrifice for the country. It was the everlasting glory of Bipinchandra to articulate the new spirit of the people with the greatest amount of fidelity. Both through his writings and public orations Bipinchandra drove home deepest the new gospel of liberty to the mind of the people. His eloquence had no parallel in those days.

Bipinchandra endowed the Boycott category with a dynamic and revolutionary import. Intended originally to be an instrument of retaliation against the British commerce in the country, the Boycott category was developed by him as an all-comprehensive programme of Non-Cooperation with the alien despotism. He discerned in the new technique a potent instrument of action as well as the nucleus and potentiality for the building up of a great nation. Functioning as a "consumer's league", the Boycott was producing, in his view, the same desired result in the country as a free Government might have derived by levying adequate import duties to foster indigenous industries and preserve the productive capital of the land from being exploited. Satis Chandra Mukherjee, another great architect of the Swadeshi Movement, also described the scheme of Boycott and Swadeshi as tantamount to that policy of protection as is generally adopted by independent countries to safeguard and promote their national resources. But Bipinchandra went a step further and requisitioned Boycott to serve other mighty purposes. Even as early as September, 1905, when the cry for the boycott of the Calcutta University had just been raised alongside with the demand for economic boycott, he sought to invigorate the movement further by bringing within its sweep concrete political objects as well. He declared in no uncertain terms that the Boycott movement was not a mere economic movement; it was also a protest against

the British rule, aiming at the foundation of ultimate civic autonomy in India. Thus he wrote on September 16, 1905. Even a week earlier he had written that, peculiarly circumstanced as India was at that time, with an autocratic Viceroy—more autocratic even than the Russian Czar—at the helm of affairs, a constitutional agitation was well-nigh impossible in this land. As the old methods of political tinkering had failed, India should demand a fundamental change in the constitution of the country for an ultimate transfer of political authority from the ruling masters to the representatives of the people. The same idea was further elaborated by him in *New India* on October 30, 1905, when he advocated a totalitarian boycott of every form of cooperation with the alien ruling race and declared Self-Government as the ultimate goal of India's political destiny.

BY A YOUNG MAN WHO IS NOT ANGRY, BUT SAD . . .

This Angry Age

PRANAB KUMAR BARDHAN

Fifth Year, Arts

Injustice and absurdity still made him angry in spite of himself and he was still angrier at being so. . . .

Stendhal.

'I don't love anybody,' Krebs said.
It wasn't any good. He couldn't tell her; he couldn't make her see it. It was silly to have said it . . .

'I didn't mean it,' he said. 'I was just angry at something. I didn't mean I didn't love you.'

Hemingway.

. . . I was angry, I didn't want to die. That made me smile. How madly I ran after happiness, after women, after liberty. Why?

Sartre

I

Dr. Johnson said of 'a woman's preaching' that it 'is like a dog's walking on his hinder legs.' 'It is not done well; but you are surprised to

find it done at all'. It is in the same spirit, A. J. Ayer tells us, that most people have taken the now-famous group of writers whom cheap journalism has successfully tucked into the A.Y.M. pigeonhole, though most of them spare no pains to avoid being dubbed 'angry', though some of them are not quite young and there is at least one woman among them. Naturally, the credos of these successful freaks whose kicking and fretting have made many people bewildered and some even prescribe an anti-dyspepsia pill or a visit to the psychiatrist, will evoke widespread interest. Herein they are expected to define in terms as sane as are possible for them, their positions in relation to contemporary society; mere 'get out and push' won't do: we don't call it cricket.

Yet this is the queerest manifesto* one can conceive of. A manifesto, full of confusions and contradictions, a motley crowd of haughty thoughts running at cross-purposes and in their self-advertising flare leading to intestine leg-pulling. Some of the contributors, the editor informs us, were even reluctant to appear between the same covers with others whose views they violently oppose. Now that the reluctance has been overcome, thanks we don't know whether to editorial assiduity or to the intensity of belief, it is the duty of the honest reader to carve out from this promiscuous huddling of ideas at least a foggy conception as to what these writers commonly stand for and to judge whether they really stand upon the burning deck (or upon a Hot Tin Roof?).

II

Truly I live in a dark period.
To speak calmly is stupid. A smooth forehead
Is a sign of insensitivity. The man who laughs
Has merely not yet been told
The terrible news ...

Brecht.

The angry young man symbolises in himself the post-adolescent revolt against the apathy, the complacency and the idealistic bankruptcy of his

---

*DECLARATION ed. by Tom Maschler (MacGibbon and Kee, London, 18s, 1957. Reflecting on the title of the book, I feel an odd temptation to quote a passage, torn off its context most abruptly, from Andre Gide's *La Porte Etroite*:

" 'Come now, did you or did you not make your declaration ?'
Although rebelling with my whole heart against the word 'declaration', which seemed to me so inappropriate and crude, I was incapable of replying by a falsehood to this direct question; I answered 'yes', in some confusion, and felt my face flame as I did so.
'And what did she say ?'
I bent my head: I should have liked not to answer.
In still greater confusion and as though in spite of myself, I said,
'She refused to be engaged'. "
Pardon my reading into these lines more than the author meant.

environment. (His American counterpart is the Beat Generation.) Ours is an age of spiritual vacuum and emotional anarchy—'the gigantic canvas of anarchy and chaos that is our age' (Eliot)—in which the individual with his puny self loses himself. We have decided to suffocate ourselves with the myths of materialistic progress, and our society *is* moving grimly, but steadily towards Orwell's 1984 and Huxley's Brave New World—the writings, one on the communist and the other on the bourgeois wall. Meanwhile people clock-in and clock-out day after day ('getting up, tram, four hours of work, meal, sleep, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, in the same routine....' *L'Etranger,* Camus), and find no meaning in a civilisation, increasingly complex and mechanical, looking upon them only as cogs in the whole machine. In the cold, impersonal world of today, man (with nothing but a mere Kafka-K designation) has lost his 'small personal voice' and to use a pet existentialist phrase, he moves without shadows. One social psychologist has analysed the problem with particular clarity: "Large-scale industrial societies with their immense bureaucracis, operating....in society at large, in industry, in trade unions, and in practically every other institution, do not provide the individual with the companionship, the sense of participation and the sense of significance which he requires for his well-being. He is a mere number, a client, a cog, a member of an age-group, a holder of an insurance card.... He longs for ego-involvement." (J. H. Sprott, *Human Groups.*) Hence the Teddy Boy in civic life—his Russian counterpart, be it noted by those who are prone to dismiss everything as pure bourgeois frustration, is the *stilyagi*—and on the intellectual level, the Angry Young Man. This man is not a Byron-like rebel who thinks himself to be an exception in a well-organised world. He, like all frustrated, maladjusted spiritual refugees of modern civilisation, feels alone[1] in a crazy, indifferent world. In the eternal night of Gethsemane that is our life, man has the terrible feeling of 'nothingness,[2] inadequacy, forlornness, impotence and emptiness'—and all this, while it *nauseates* a Sartre hero and *disgusts*[3] Brick in Tennessee Williams's play, *enrages* the angry young man.

Wars and depressions and growing population have increased the individual's insecurity to the point of hopelessness. And above all, we have

[1] 'Here we are, we're alone in the universe, there's no God, it just seems that it all bgan by something as simple as sunlight striking on a piece of rock. And here we are. We've only got ourselves'.

This is Jean, Archie Rice's daughter, in Osborne's *The Entertainer.* Cf. Sartre: 'I live alone, entirely alone; I never speak to anyone, never; I receive nothing, I give nothing .....' *La Nausee.*

[2] The waiter in a Hemingway story sympathises with an old man who tried to commit suicide because 'he was in despair .. about nothing', and finally prays: 'Hail nothing, full of nothing, nothing is with thee'.

[3] When Big Daddy in *Cat on a Hot Tin Roof* asks his son, Brick, why he drinks, the answer, teasingly withheld until another drink is offered, finally comes forth as DISGUST, in bold type.

chosen collective death under radio-active clouds. Today, those who carry the torch of freedom are compelled to run with it into the ammunition dump. With the thermo-nuclear Frankenstein gnashing its teeth, 'we are haunted by the image of an idiot hand, pressing down a great black lever, ... as the dance of fiery death begins in one county and spreads over the earth; and above the hand, the concentrated fanatic stare of a mad, sick face'. Democracy cannot check it. Lincoln's prepositional rhetoric is of no avail. The dry taste of futility and impotence lingers in the mouth of all. And nations have today to live by circuses alone. (Remember the futile people of the *Wasteland*: 'I see crowds of people walking around in a ring'.) There is the Monroe doctrine of sex—there is Brigitte Bardot too whom, it is said, God created for adults only—and the Pied Pipers of Hollywood having a greater success among (grown-up) children than among rats. Sex, food, jazz, drink, drugs, fast cars (cf. the novels of Sagan, Kerouac etc.) and horror movies sum up life today. With all that, we are perhaps taking part in the last circus of a civilisation that has lost faith in itself, and sold itself for splendid trivialities ('shiny barbarism' as Richard Hoggart calls our present mass culture). Our literature too is sodden with a tired pity for human beings—a dreary moaning of frustration and exasperation.

Into this state of hebetude and mass-boredom the angry young men have irrupted indignantly and we hear the howl of Jimmy Porter's trumpet, issuing from his dishevelled bed-sitter to rend the tedium of a wet Sunday afternoon. ('There's someone going crazy in here!') Theirs is an angry protest against the pettiness and pusillanimity they find all around. (Jimmy calls his wife the Lady Pusillanimous.) *Unlucky Jimmy* is *the* figure of the age, the intellectual lower middle-class James Dean, the 'rebel with a high I.Q. and no cause'.[1] With all his whining self-pity, cheap attitudinisings, his hysterical, hyperbolic bitchiness about pretty well everything, the trigger-happy flair for scenes and upset, the use of world's woes—Hungary, Suez, South Africa—as a crutch for his own ego, Jimmy typifiies in his own person the contemporary disgust with bourgeois values, the hypocrisies and traditions of the Establishment—*phoney* and *wet* as they are—the tattered and tatty patterns of gentility and patriotism, the squirrel-and-bear affair which people call love—with a woman to suck you dry!—and at the same time reflecting the twentieth-century man's schizophrenic soul, his sense of confusion, lack of focus and frustrated idealism.

From Jimmy Porter to Mr. Wilson's Outsider is no doubt a far cry. The Outsider is more akin, if at all, to the Nietzschean (or Shavian) superman or to Camus' *l'homme absurde*. The challenge before our civilisation

[1] 'There arn't any good brave causes left. If the big bang does come and we all get killed off, it won't be in aid of the old-fashioned grand design. It'll be just for the Brave New Nothing-thank-you-very-much'. *Look Back in Anger,* Osborne.

is to produce a higher type of man and give itself a new unity of purpose. The Outsider is the individual who attempts to respond to the challenge. With a sort of suicidal courage he launches himself into the sea of chaos and ends up by creating a world of value so much higher than the world we have made for ourselves that it seems supernatural, the world of Beethoven's last quartets, of Mozart's *Zauberflöte,* of *The Brothers Karamazov,* or the last Act of *Back To Methuselah.* The Outsider fights his way back from the sense of meaninglessness and futility to the spiritual discipline of a religion. (Witness Blake, or Ramkrishna or George Fox.) It has given them the sense of moral purpose, the sense of spiritual reality—a step towards the god-like. And the problem of the Outsider is now the problem of the whole civilisation.

III

I had always known that civilisation needs a religion as a matter of life or death. Shaw.

We live in a sceptical half-dead civilisation of Scientific Humanism and abstract philosophy—the AYM's particular bugbear. Dancing to the cafe orchestra of the logical positivists, we have scraped the barrel of Reason and materialism, the root of man's spiritual exhaustion—civilisation's present malady—and the young men's anger.[1] What is the way out? Religious faith, we are told. We have once to believe in Belief. It gives man an inner compass of certainty beyond all logic and reason and thus serves as the mortar that binds the bricks of civilisation together. Belief is, and Hopkins speaks historically, the instrument for projecting oneself beyond one's surface limitations. Reason, on the other hand, will have us acknowledge them, even when the recognition is disastrous, as now. 'For me (Wilson), real philosophy is an attempt at an estimate of the human situation from the point of view of somebody involved in it: not abstruse questions of logic or metaphysics'. Kierkegaard has called this Outsider-philosophy existentialism. And this existentialist revolution Heidegger has worked out in Germany, Sartre and Camus in France. Even in the Anglo-Saxon world, the citadal of rationalism, it is being increasingly felt that there are more things in heaven and earth than are dreamt of in Russell's philosophy.

No civilisation, Wilson informs us, has ever yet achieved its possible maturity. They all pass through the same stages: simple superstitious belief to half-educated scepticism. But so far, no civilisation has advanced to the next stage: the stage of a new religious belief based on religious vision,

[1] They almost sound like good old Luther: 'You must part with reason and not know anything of it and even kill it; else one will not get into the kingdom of heaven.'

the Outsider's vision. And if our civilisation is to go this way—as it must or perish!—it is literature that would have to be the cradle of our future religion, philosophy and leadership. This was in some way the case in the Greek world of Aeschylus, Sophocles and Euripides. And once again today the responsibility of human deliverance has devolved upon literature. But the literature of the last few decades has evidently betrayed its historic task. It has drifted into a morose subjectivism and wallowed in a pleasurable luxury of despair that permeates its morbid stories and neurotic poems.

It is the prime duty of the writer or the artist-philosopher not to subscribe to the general apathy and disillusionment, but to discover the escape route to salvation. It is not his business to 'mirror the age', but to change it. He must dedicate himself to the task of restoring a metaphysical consciousness to our age. Drawing upon the reservoir of power which Faith provides (an internal power comparable to the external explosions of atomic energy), the artist is to widen the horizon of humanity and with his sense of desperation, galvanize the lethargic non-living of ours.

This is more or less the position taken by these literary angries who have by now capitalised their anger, just as Scott Fitzgerald had once earned more money than he had dreamt of, simply for telling people that he felt as they did. The angry young man lashes out and cashes in.[1] But what a bewildering variety of 'angry' talk they present in this collection of essays!

Don's Lessing misses warmth, compassion and humanity in modern literature—that's why she has to re-read Tolstoy, Stendhal, Balzac, Dostoevsky and the rest of the old giants—and ends with a suggestion that literature should be 'committed'.[2] John Osborne, seemingly the angriest of the lot, belches out ('whirling words like a meat-cleaver', to use Allsop's phrase) volleys of abuse against the murderous idiocies of the well-bred nobodies who rule British life today.[3] This is hectic hitting—of course with a cross-bat—and he calls it cricket. The most disappointing is John Wain who somehow comes to believe that things have not changed much since 1914, that our task of immediate future is one of consolidation, that

[1] A. P. Herbert's 58-line poem in *Punch* on 'Angry Young Men' ends thus:

No British young, since British young were new,
Have had such boons and benefits as you.
The talk of war 'unsettles' you, I see:
I've served in two, my lads, and suffered three.
We did not whine and whimper at our doom
We did not cry 'Frustration!' in the womb.
We saw, and shared, some grandeur in the grime.
Cheer up, my lads—you'll understand in time.

[2] This question of commitment of literature has been discussed by Sartre in his book, *What is Literature* ?

[3] A *New Statesman* reviewer comments: 'Osborne's jeers at our new Byzantinism—the insane cult of Royalty, hatched by a mentally moth-eaten Palace entourage and blown up into a giant octopus by Fleet Street—are the sharpest we have heard yet.'

we have to 'keep our heads' and have the nerve to go step by step 'along the tightrope' in the Great Circus. Kenneth Tyman is disgusted with English theatre 'that is for ever preoccupied with trivia' and suggests 'political commitment' on the part of playwrights. Tynan ends with an ironic letter, unposted, where he pines for a world in which there will be no Tories or Americans, no Koestler to depress young minds and where people feel, as in a Salinger story ("*Zooey*"), that every fat woman is Jesus Christ. Lindsay Anderson, on the other hand, talks of British cinema, which has fallen out of the running, given as it is to an out-of-date, exhausted national ideal. The only articles which try to see the whole matter seriously and comprehensively, to diagnose the basic ills of our age and to reason out some sort of a definite solution for them are those of Colin Wilson, Bill Hopkins (apparently the most systematic and sensible of all) and Stuart Holroyd. They present, in rather abstract terms, what might reliably be forwarded as the AYM philosophy and remarkably enough, these three stand upon more or less a common ground.

IV

I do not know whether this world has a meaning that is beyond me. . . . What can a meaning beyond my condition mean to me? I can understand only in human terms.

Camus.

One conclusion to be drawn from all this 'angry' furore is that men, and especially the younger generation, are becoming more conscious of stagnation and developing more will to dread it, as Shaw once hoped. The game is up, as W. H. Auden said, for those 'who, thinking, pace in slippers on the lawns'. If you take these angry people seriously—there is every reason you should—they do not merely don turtle-neck sweaters and shout forth a creed, rationalising their own neurosis, in the damp expresso houses of Soho—in them you can find the anguish of rebel spirits who have not, like Ivan Karamazov, 'returned the ticket', but are sincerely grappling with the 'overwhelming question' of what we should do with our lives, a question which most of us are too lazy, shallow, sensual and dishonest to reflect upon, and which the abstract philosophers are too much absorbed in small, and often downright trivial, questions to consider. All modern intellectuals who think about life have to be crypto-outsiders.

Everyone today wants to find a way out of the wasteland of lost and crumbling values, the Kafka-esque world of endless and insoluble doubts. Naturally different people have fumbled with different 'solutions'. For Sartre's Mathieu (*L'Age de Raison*), it is Marxism—a solution which, in Raymond Aron's language, has almost become the 'opium of the intellec-

tuals'.[1] Kirilov in Dostoevsky's *The Possessed* asserts his will to freedom at the highest point of terror and reality: death. (Also, the nameless hero of Barbusse's *L'Enfer*: 'Death, that is the most important of all ideas'.) 'Svidrigailov pulled the trigger'. (*Crime and Punishment*). The nihilistic solution of suicide is in fact *the* philosophic problem of the age. (Cf. *Mythe de Sisyphe,* Camus.) The cases of break-away from negation through violence, terror and death are too many in modern literature (e.g., the hero of Nathaniel West's novel, *Miss Lonelihearts;* Paul Bowle's little people who plunge into the depravities of the Arab world in his *The Sheltering Sky,* etc., etc.). The Beat Generation of America, on the other hand, puts tremendous emphasis on the emotional intensity[2] of a neo-Bohemianism.

The angry young men with their machine-gun rattle of explosive assertions point to *their* royal road—a philosophy of a new espresso evangelism, of a revolt against Scientific Humanism, of the restoration of religious faith to the central role which it played in the civilisation of the Middle Ages. Evidently we must not make too much of this doctrine. First of all, except for the intellectual arrogance, there is nothing very new about it. Readers of Spengler and Toynbee, of Eliot and Shaw would find many ideas only too familiar. But it is not familiarity alone which breeds disapprobation. Wilson's religious existentialism is loudly egotistical and anti-human. As a general solution it is scarcely adequate for a society, certainly not peopled by anti-social outsiders, but by common men, unless one is going to dismiss them as 'bound souls' and therefore not deserving of attention. The alternative to the wasteland, then, is to create an oasis, as Eliot himself has done, reserving it for one's chosen few and leaving the rest of mankind to shrivel amid the rocks and sand. A man with some sense of social responsibility can hardy remain complacent at that, even if he believes with Toynbee that it is always the 'creative minority' who solve the problems of a civilisation. Nor can we subscribe to the wholesale denunciation of Reason as such. Reason alone, to be sure, cannot solve some of life's most central problems. But does it follow that Reason ought to be abandoned altogether?[3] While asking whether Des-

[1] Remember the number of opiates cited by a heartless cripple in a Hemingway story: 'Religion is the opium of the people. . . . and now economics is the opium of the people, along with patriotism. . . . . What about sexual intercourse, was that an opium of the people? But drink was a sovereign opium, oh, an excellent opium. . . . .'

[2] 'The only people for me', says Sal Paradise, the narrator of Jack Kerouac's *On the Road* (a novel that has received in America a good deal of publicity of the 'Outsider' sort), 'are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars . . . .'

[3] See W. Kaufmann's introductory article in *Existentialism from Dostoevsky to Sartre.*

cartes' fine ideal that our reasoning should be clear and distinct, reinforced since by the tremendous progress of the sciences, might not eventually lead philosophers to concentrate on logic and trivialities to the neglect of vital problems, it would be rash for us to renounce clear and distinct thinking altogether. And as to faith, it is not entirely without an element of truth that Nietzsche wrote in his *Antichrist*: 'Faith means not wanting to know what is true'. It is wise to be cautious before some philosophical steeple-jacks, scaling sickening heights, preach pseudo-disciplines which dangle before us the non-existent carrot of salvation and lead us to the 'comfortable wilderness' of mysticism. We are asked to depend on the intensity of our spiritual vision, the vision of the neo-Superman. Stuart Holroyd glibly talks of self-knowledge, self-division, self-abnegation, of living in a condition of dynamic tension and of rooting the polarities of existence in consciousness. (And still these young men say that they are angry with 'abstract philosophy', don't they?) He reaches the climax when he proclaims: 'Man is an eternally existing individual who stands absolutely responsible for his actions before God'. Frankly, we have had enough of such stomach-turning transcendentalism as much as we have seen through the ritualistic twaddle of orthodox religion in the past and the crude ways of Billy Grahamism of the present. I, for one, would rather be a half-educated sceptic in a world struggling with its own imperfections than turn may back to my limitations which Reason lights up, and bury my head in the self-deceiving sands of religious mysticism. Let Outsiders spy into their next bed-rooms and see 'too deep and too much'—when they only see women undressing—; meanwhile the world churns, bubbles and ferments. A sadist mid-twentieth century public may enjoy the dismissal of Russell as an overgrown schoolboy, or of Einstein as a moral imbecile or of Freud as a congenital idiot, but—one may ask, to some extent legitimately—should not there be a stop to the pampered children of a confused civilisation rising to instant celebrity at the crest of jejune philosophies?

> *. . . . And God said to Jonah, Doest thou well*
> *to be angry for the gourd? And he said,*
> *I do well to be angry, even unto death.*

The Concept of 'Asiatic Society'

SUMIT SARKAR

Fifth Year, Arts

Since the time of Marx, a number of historians have used terms like 'Asiatic Society' or 'Oriental Despotism' to delineate certain features common to the social systems of the countries of the East prior to the Western impact. Such generalizations are usually ignored by orthodox Indian historians as unnecessary and illegitimate. But as every interpretation of facts implies the use of some category or other, an amount of generalization is unavoidable in any historical writing; and the failure to face such questions can only lead to the application of terms without a proper consideration of their precise meanings. Marx's conception of Asiatic society, whatever its limitations may be, cannot just be ignored, nor can the modified versions presented by historians like Max Weber or Wittfogel be brushed aside as irrelevant to the study of Indian economic history. The subject, of course, is highly controversial, and the scope of the present essay is limited to the raising of certain questions and the suggestion of possible lines of approach to the problem.

Marx's writings on India were based mainly on two sets of sources—the accounts of European travellers who visited Muslim India, and a mass of material derived from the reports of East India Company servants and embodied in various Parliamentary papers like the well-known Fifth Report of 1812. Seventeenth-century travellers to India were impressed above all by the vast power of the Mughal despots, and the more acute of them traced this absolutism to the absence of private property in land, to the fact that, as Bernier remarked, "the land throughout the whole empire is considered the property of the sovereign." The officials of the Company penetrated deeper into the country, and they have left behind valuable accounts of the old revenue system and village organization which their own actions were helping to destroy.

The main features of Marx's conception of Asiatic society are well-known and may be described very briefly. The whole structure was based on two fundamental premises—the union of agriculture and handicrafts within the village organization, and the absolute necessity for artificial irrigation works (due to peculiar climatic and other geographical conditions) which prevented the emergence of private property in land and made the intervention of a highly-organized state essential. In the words of Marx, "an economical function devolved upon all Asiatic governments, the

function of providing public works."[1] The first economic factor led to the phenomenon of a self-sufficient village community with communal ownership of land existing from very early times, the second to the emergence of successive bureaucratic states with the "three departments"[2] of finance, war, and public works. Thus Asiatic society, according to Marx, functioned on two levels—the permanent unchanging village community, and the ever-changing succession of despotisms; it was a social system in which "the structure of the economical elements of society remained untouched by the storm-clouds of the political sky."[3] This stagnant society was smashed by the British, and Marx gives a detailed analysis of the changing nature of this impact in the two distinct stages of mercantilism and industrial capitalism.

The limitations of the sources available to Marx are evident today. The European travellers usually came into contact with only the upper levels of society gathered round the Mughal court, and most of them visited India at a time of imperial unity by no means typical of all periods of her history. Thus their accounts possibly overstress the power of the bureaucratic state. The Company officials, faced with a very complex situation, were sometimes led astray by various preconceived notions. It is only thus that we can explain the widely differing interpretations of the Mughal land system, given, for instance, by Grant and Philip Francis. In these circumstances, it would have been surprising if Marx's analysis had been borne out in every detail by more recent research; that it has stood the test of time to such a considerable degree is a tribute to the greatness of the man. Clearly, the limitations we have mentioned are particularly marked for the earlier, pre-British period. It is not unnatural, therefore, that while Marx's analysis of the stages of the British impact on India is very largely accepted (if not always with acknowledgments) by the historians of today, his theory of Asiatic society still remains somewhat speculative.

In the hundred years which have elapsed since Marx wrote his articles on India for the *New York Daily Tribune* two lines of development of his view of Asiatic society may be distinguished.

Marxist historians have retained the stress on the self-sufficient village economy with communal ownership of land, but little further work has been done on the hypothesis of irrigation forming the basis of the bureaucratic state-systems of the East. What is more significant, present-day Marxist historians generally apply the term 'Asiatic Feudalism' to describe pre-British India or Asia, and as critics have pointed out, this is not quite

---

[1] K. Marx: *British Rule in India.*

[2] *Ibid.*

[3] K. Marx: *Capital,* Vol. I, Ch. XIV, Sec. 4.

in accordance with Engels' assertion that the "Orientals did not arrive at landed property even in its feudal form."[4]

Non-Marxist historians like Max Weber and Wittfogel, on the other hand, have developed the irrigation hypothesis into the theory of a 'water-works state' or 'hydraulic despotism'—an all-embracing system of bureaucratic power extracting the surplus from the peasants, managing vast irrigational and other public works, and wielding tremendous influence on all spheres of social life. Wittfogel in his *Oriental Despotism* turns the argument against present-day Marxists by drawing a somewhat far-fetched parallel between the Soviet Union and the Oriental despotisms of the past. The Marxists are accused of drawing a false analogy with European feudalism, due to their dogmatic preference for an unilinear conception of historical development, and also (according to Wittfogel) because of a desire to conceal the resemblance between the Communist rulers and the Oriental despots. The second charge probably does not deserve very serious consideration, but the first should induce Marxists to examine afresh the question of the applicability of the concept of feudalism to Asian countries, and in general, the whole theory of Asiatic society. We will now consider the various aspects of this theory in greater detail.

The question of ownership of land is usually taken as the starting-point for any discussion of the subject, and this has remained a vexed and complicated issue ever since the first controversies among revenue administrators in the early days of British rule. We cannot enter into the details of the controversy here, but one or two points may be mentioned. In the first place, it seems fairly clear that landed property in the specific modern sense (which connotes not merely hereditary use but purchase and sale in an open market) is a fairly recent creation. Consequently, the question "Who is the owner of the soil" (in, say, the Muslim period) may be unanswerable if ownership is defined in the modern manner. The problem therefore resolves itself into a study of the respective rights vis-a-vis the land, and effective control over its produce, enjoyed by the four main parties concerned—the individual peasant, the village community, the immediate overlord (who may have been a chief by his own right or a holder of an assignment from a central power), and the sovereign. The Marxist theory is that the village community was the dominant factor. There is some evidence in favour of this view, but it cannot be regarded as fully proved yet for all the regions of India. The possibility of local differences must not be ignored—thus while there is ample evidence regarding Bombay and the North-West Province, traces of a communal system are rarer in Bengal.

The second key assumption of Marx was the self-sufficiency of the

[4] Engels to Marx, 6 June 1853.

village community based on an union of agriculture and handicrafts. The concept of self-sufficiency can be rendered absurd if interpreted in an absolute sense—trade of course existed in considerable degree at all periods, and most villages must have depended on the outside world for the supply of even such necessaries as salt or metals. What Marx meant was that commodity circulation could never go beyond a certain point due to the peculiar division of labour within the village community—"the chief part of the products is destined for direct use by the community itself, and does not take the form of a commodity".[5] In order to test this hypothesis, what seems to require study is the specific character of Asian trade and the quantum and nature of the commodities involved in it. While trade of considerable value was conducted even on an international scale from very early times, it was always primarily a traffic in relatively small amounts of high-quality goods (the "splendid and trifling" articles of Gibbon) —as is brilliantly substantiated by the Dutch historian Van Leur in his *Indonesian Trade And Society*. This may be regarded as an indirect confirmation of the relative self-sufficiency of the village community. But here once again the question of regional differences must be considered—while Gujerat, the Coromandel coast and Bengal were linked with world trade at least from Roman times, the villages of the interior probably retained their self-sufficient character to a greater degree.

The most controversial element in Marx's theory of Asiatic society is his stress on irrigation works, the construction and maintenance of which was supposed to have been the basis for the power of the Oriental despots. In Muslim India, at least, there is very little mention of state-run irrigation works in the official imperial chronicles. This dose not mean, of course, that artificial irrigation did not play an important part in economic life—thus to give only one example, Bernier asserts that "from Rajmahal to the sea is an endless number of canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense labour for navigation and irrigation." The natural question follows— who constructed such works? The subject requires full-scale research for any definite answer, but on purely logical grounds it may be argued that the question turns at least partly on the size and nature of the works. Thus while water-control projects on a very large scale (e.g. in ancient Egypt or Mesopotamia or the Chinese Grand Canal) probably required state action, smaller types could have been constructed by less powerful agents—the village communities, other corporate organizations, or (most commonly perhaps) local chiefs. From what little evidence is available, the second type of irrigation seems to have predominated in India. Buchanan in his survey of the Carnatic, Mysore, and parts of Bihar and North Bengal at the beginning of the nineteenth century men-

[5] K. Marx: *Capital*, Vol. I, Ch. XIV, Sec. 4

tions numerous canals and reservoirs constructed by local chiefs.[6] In Bengal, tradition bears witness to the irrigational and other public works of the old benevolent zamindars, and that the repairing of embankments was one main function of such families is confirmed by Dr. N. K. Sinha in a recent article on the zamindari system of eighteenth-century Bengal.[7] The matter evidently needs further research, and a study of land-grants and inscriptions of the Hindu period may be of help here.

This apparent importance of the local chiefs in the sphere of irrigation brings us to consider the possibility of a modification in our previous model of Asiatic society as a bureaucratic apparatus superimposed upon the village communities. The key question here is the degree of independence enjoyed by the local chiefs in relation to the central state. Marx based himself mainly on evidence pertaining to Mughal times, but we must remember that such a degree of centralization is not typical of most periods of Indian history. Even under powerful empires like that of the Mughals, many local chiefs retained their position; and what is equally significant, the imperial officials themselves tended to become independent, once the central authority weakened. This seems to be a recurring tendency of Indian history, and it compels a modification of the previous picture of Asiatic society as governed by centralized bureaucracies at all times. The really permanent relationship appears to be that between the peasant community and its immediate overlord, who at times becomes (at least formally) an agent of centralized empires, but soon tends to regain his practical independence.

The content of this key relationship, stated in Marxist terms, is the extraction of the surplus product from the peasants (in the form of rent—in produce, money and possibly labour) by methods of what has been described as 'non-economic compulsion' (i.e by custom, military force, or legal enactment and not by the operation of economic forces as in capitalism). In return, the local chief performed the function of defence and the construction of roads, irrigation works, etc. The relationship, in fact, is seen to be a 'feudal' one, if feudalism is given the precise Marxist connotation of a particular form of appropriation of the surplus product from the direct producers.

There are, of course, wide differences between Asian and West European feudalism. The village communal organization, while not absent in Europe, is certainly more prominent in Asia; so is the power of centralized bureaucratic states (which in the West arose only towards the end of the feudal period). But certain common features may also be traced, and in the light of these, the use of the concept of Asiatic Feudalism by the Marxist historians of today cannot be dismissed out of hand.

---

[6] Cited by R. C. Dutt: *Economic History of India under Early British Rule*, Chapters XII, XIII.

[7] *Bengal Past and Present*, Jubilee Number, 1957.

Mankind—Victim of Habit-Neurosis

SHIB SHANKAR BASU

Third Year, Arts

Nosce te ipsum

Do you know what you are? You are just a bundle of habits. No offence; I have also my own bundle; and not a very small bundle at that; one of those large economy sizes. In fact, every bloke that is worth the name of man is made of that bally stuff.

These are unexpected depths to you; your feeling is much the same as that innocent cove in Moliere's 'Le Bourgeois Gentilhomme', whose life was all pink and rosy, till one fine morning he realised with a nasty shock that he had been talking prose all his life. I see that you are waiting for further enlightenment; it may ease your heart a bit to know that "habit" is a way of living that has been learned; conversely, a definite process of learning is the formation of a habit. The toothless young bumpkin that is learning to prattle, is forming the speech-habit. Well, we live to learn, don't we?

Suus cuique mos

Sounds Greek to you? Well as a matter of fact, it is Latin, and it means that everyone has his habits. Individual differences of attitude (taking resort to a somewhat pedantic jargon) are in some measure due to differences in sense-organs, or in bodily state and other basal conditions; but in a far larger measure, they are matters of habit.

A game of billiards

All mental life is a process of reaction or response to environment, which takes the form of perceiving, thinking, feeling. Your billiards-table of life contains these three balls to play with. You have your own habits of hitting the balls of course. Touching one ball with another carries points; for more often than not, your action is a complex combination of two or all of these processes which are built and modified by habits.

More about responses

There are responses which blokes with IQ less than an average adult pig are capable of, namely, reflex action, which is overt and definite and involves the minimal thinking, e.g., a missile approaches your eyes, and

your eye-balls press further into the parent-socket, eye-lids close up like spring doors; in one word, you blink; and you do all this without thinking them out.

There are responses where thinking conspicuously occurs, but action is slight. At the mention of water, you remember that you have left the water running in the sink; you can't do anything about it but you are doomed to thinking; thinking marks you for her own.

There are others, in which perceptual response and thought response are composed into one action. In some responses, action is a part of the thought-process itself; in speaking fluently, thought-response itself eventuates in the action.

Now for the 'feeling' part of our story. Let us make a goodish stab at it. According to the James-Lange theory, emotion is a 'bodily state' which is the result of a response to some stimulation. This in turn is an effective stimulation to nerve-endings in the body, through which a new response is created, and this second response is that in which we 'feel' the emotion. Feelings are not always aroused perceptually but may be aroused by thought-processes in sequences of responses which have been made habitual by associative learning.

All these responses are capable of being, and always are, habitual.

Man, life and the bundle

Thus if living consists in responses to environment and responses be habitual, you see as I told you, that life is a matter of habit!

The bundle (or constellation, if you seek variety) of habits which the adult man (the fairer sex included) has formed and which constitutes the framework of his life, is about the size of a fair-sized mountain (pretty big, that, for a bundle, eh?) and in complexity, well, reader, the jig-saw puzzle of a labyrinth is a mere nothing compared to it, I tell you. It includes habits of social behaviour; of work; of emotional response; of eating, drinking and sleeping; of sexual behaviour; in one word, everything.

The secret of learning

One of the results of learning is the fixation of habits. When I was an awkward little man studying in a binge they taught me the trite formula 'try, try, try again'; I tried, tried, tried again and then suddenly I needn't had to try at all. A very advantageous formula that. Once I decided to have a go at dancing; trouble began when I kept treading my partner's feet; rummy affair, that. You cannot be chivalrous and lady's-toe-treader all at once. So I told myself: You clumsy, fat-headed ass, where is your magic formula gone now?

I stiffened my backbone, stuck out my chin, squared my elbows and then you know what I did. After some time, 1, 2, 3 . . . 1, 2, 3 and my feet landed on the well-polished, eh—oh, no, not the toe, this time it was the floor. Now-a-days I don't have to try for it, it comes automatically.

The secret is that each time you learn a thing, you form new but relatively fixed ways of response, with the minimum energy and maximum efficiency, viz., self learning to keep partner's feet in peace.

Age quod agis

The heading means: 'Mind what you are about'; I was merely indulging in a piece of soliloquy. That point settled, let us proceed.

When a particular habit is learned, the particular learning-process is finished, giving place to other learning-processes—releasing time and energy for that.

Now, suppose, we do not engage the released time and energy in other learning-processes; what would happen? Why, precisely what has happened in our time—frustration, aimlessness, frivolity, boredom and sloth; call this habit-neurosis. For all practical purposes, certain fixed habits are sufficient to carry a man through life; he does not bother to learn more; he ceases his learning-processes and becomes and automaton—an electric machine that works by various switches, which are his habits. The state of affairs stands four square with this age of specialisation, into which we have been thrown.

Hinc illæ lacrimæ

Perhaps this is the destiny of man. With infinitely limited potentialities, he cannot be anything else but a machine, in order to achieve anything or preserve what has been achieved. Once in a blue moon a creative genius appears; the rest of us are merely teachable animals. We repeat ideas thousand-fold to make them our own. In this way we learn in a life-time, what humanity learnt through centuries. We only imitate like baboons; then we repeat like idiots. Then the learning-process is finished, giving rise to habits, which make us what we are.

Brave New World or Bavardage

Some people would frown upon this 'che sarà sarà' attitude; they would insist that all is for the best, in this best of all possible worlds. I am all for them; for example, I believe personally, that like reflex actions all other responses can be conditioned. Do you see the infinite possibilities it opens up? As in Huxley's Brave New World, we could get highly

standardised and mechanised array of human beings—only far superior in quality, in fact just as we wish them to be. Call them Supermen. But the problem will then be: what particular dose of habits shall we inject into the Supermen? What should be the criterion of superiority? Habit-formation, instead of being accidental and haphazard, should be determined and systematic. But how the deuce are we going to find the ideal?

Voila Tout

Some time ago an English author, protesting bitterly against the stiff and formal way in which the British Income-tax authorities go about their work, gave instances of the treatment of taxpayers, who had overpaid the government and wanted refund, in the hands of the American and British authorities.

A friend of the author had, on going over his income-tax returns, found that he could claim a refund of $1.50 from the U.S. Government. He accordingly, sent the govt. a letter asking for the refund. The govt. soon sent their apologies for the mistake and begged to enclose a cheque for $15.00. At this the gentleman returned the cheque and asked the authorities to correct their mistake. In reply, they were even more apologetic and sent a cheque for $150.00. The author's friend sent the cheque back once more, saying that there evidently was some mistake, and the amount due to him was $1.50, upon which the authorities almost grovelled and sent him a cheque for $1500.00. At this point the gentleman thought it prudent to collect the money and retire from the game. The author, however, says that he is sure that if his friend persisted, he could have cleared them out.

The same friend came to England and, after some time, sent in a demand for a 10-shilling refund from the Exchequer, explaining that he had overpaid them the amount. By the return of post he received the following letter :

"With reference to your communication, we are directed to inform you that it would be quite all right if you pay the money at your earliest convenience."

—Dibyadyuti Hazra, *Fourth Year, Arts*

Those without Shadows[1]

SUNIT BANERJEA

Fifth Year, Arts

> The age of chivalry is gone: that of sophisters economists and calculators has succeeded: and the glory of Europe is gone.
>
> EDMUND BURKE, 1790

> Professional economists have long been disturbed by the comparative lack of practical success from their efforts.
>
> SIDNEY SCHOEFFLER, 1955.

Henry James sadly defined the task of a writer as "to hammer out headachy fancies with a bent back at an inkstained table." But despite Mr. James' low estimation of the writers' task, the writers are universally esteemed and adored for their skykissing fancies. But what is true of the writers is not true of the economists. In this age when even "a rascal is given the benefits of Freudian doubts" and every nascent industry is provided with adequate finance, the economist faces the same lot as the worker of a rationalised industry. Philosophical aloofness and mathematical abstraction are considered unpardonable offences for which the economists spend a hibernating existence in an all-forsaken cell with a label "fuzzyheaded ivory-towerites" attached to it. Economists are looked upon as the great sinners who have eaten the fruits of the land of "the lotus-eaters". Really the armchair economists dozing on the dunlopillo scribble out any half-conceived theory of social forces punctuated by misrepresented calculus and tantalising scholastic schema which becomes a scrap of paper[2] after a lapse of only few years. Economic theory is so far unable to make even one solid and dependable prediction. And hence doctors, engineers, politicians common men have scant respect for the prowess of the economists. They in a contemptuous tone say, "If all the economists are laid end to end they will not be able to come to a conclusion". And though the economists are themselves proud of their contribution to the formulation of the policy

[1] The title is borrowed from Francoise Sagan's recent novel of the same title (English translation by Irene Ash.) This is neither a "lament for economics" nor a treatise on the "failures of economics". It is an integration of some random thoughts on the state of economic science.

[2] Economists, in most cases, consider their own writing to be valueless. Dr. Hicks' example is a case in point. His "The Measurement of Real income", Oxford Economic Papers, June 1958, is a revision of his "much controverted" 1940-paper, The Valuation of Social Income, Economica, just as his recent book on demand theory is a revision of some of the chapters of his Value and Capital.

of a state yet the number of economists knighted in Great Britain and honoured by the President's award in India clearly manifests how little regard the men at the helm of affairs have for the economists. The nebulous concepts and teutonic complexity that form the crux of the economists' theories may hypnotise the young novice or the immature undergraduate but the essential "unearthiness" in their concepts may not pass unnoticed in the eyes of the keen sociologists.

The failure of the economists to make people accept their theories is to a large extent due to their overestimation of the power of ideas to control events. The matters with which economists deal do not present a coherent pattern—the very incoherent and inchoate nature of the problems that present themselves before economists frustrate any attempt to control them with the tools of some predetermined ideas. Keynes erred perhaps when he over-emphasised the role of ideas. He wrote: "The ideas of the economists and the political philosophers both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood".[3] But history denies it. And Professor Pigou was perhaps not so confident of the power of economists' ideas when he made the following statement: "The hope that an advance in economic knowledge will appreciably affect actual happenings is, I fear, a slender one. It is not likely that there will be a market for our produce".[4] Really the *sine qua non* of the greatness of the economists is their ability to probe deep into the historical problems—the most that an economist is expected to perform is to clarify contemporary problems and to point towards the direction of their solution. The source of the greatness of Ricardo and Keynes is their ability to take positive stands on the great issues of their time. Ricardo's programme for the repeal of the Corn Laws was consistent with the best allocation of resources as between agriculture and industry while Keynes' programme for full employment was an adequate answer to the capitalistic instability. The value of economics as an empirical science ultimately depends on how accurately the natural and social background of economic activity is reflected in the various assumptions of the deductive analysis. How false were the teachings of the economists in a pragmatic, historical and operational sense was evident at the time of the Great Depression. At that time when people were living under the shadows of smokeless chimneys praying for jobs the economists continued to tell that the workers employ means of production and thereby determine the volume of employment. The economists were violating the first maxim that science should deal with what is rather than with what should be.

And some writers go so far as to declare that Economics is not a nomothetic, empirical science. In fact when economists proceed empiri-

[3] Keynes J. M.: The General Theory of Employment, Interest and Money.
[4] Presidential address to the Royal Economic Society.

cally they do not arrive at the static and dynamic laws of the real world and again when they deal with the static and dynamic laws these become mere mathematical generalisations and useless from an empirical viewpoint. As for example the theory of the firm studies the consequences of certain given assumptions. These assumptions are scientific in the same sense that mathematics is scientific—it follows the path which is universally believed to be the scientific one. But the conclusions drawn from the study is not a notable contribution to the stock of knowledge about the economic world—it is merely a mathematical abstraction and not an empirical generalisation.

Formal elegance should not be the criterion of economic theories—the value of an economic theory is to be judged not by the number of simultaneous equations constructed or of the partial differentials derivated or the matrix equations interpolated. What is important with respect to economic theory is its adequacy.[5] Adequacy of a theory means its ability to draw corollaries of certain general type, i.e. the theory must be comprised of certain general statements about the movements of a system. The theory should consist of equations equal in number with the variables. Over and above the constants in the equational system must be constructed independently of the variables, as for example the "gravitational constant" in the famous Newtonian law has validity so long as the mass is independent of any change in velocity. Hence the necessary condition of a theory of value is that "the determining constant must express a relationship with some quantity which is itself not value."[6] Moreover, economic theory in order to be relevant to the positive objectives which the economists generally maximize must be quantitative in nature. For instance, if we say that x is equal to $fk+f'l$ and y is equal to $Lk+Bl$, then our statement has no value unless we construct a relationship between k and l.

And in most cases, economic theory falls short of these requirements and leads to conceptual ambiguity. And it is this ambiguity that compelled Ricardo to reject supply and demand explanation and also compelled Marx to reject the cost of production theory of J. S. Mill. This ambiguity has been augmented in recent years by the continuous application of mathematical methods to economics. Despite the fireworks of mathematical analysis accompanied by the fanfares of the enthusiasts, the question that disturbs the minds of even the mathematically-baptized economists is: "How far is mathematics useful for dealing with complicated economic problems?" It will not be irrelevant to discuss in brief the answer to this question as it has some bearing on the subject matter under discussion.

Some mathematical economists have strong conviction in the saying

[5] Dobb Maurice: Political economy and capitalism.
[6] Dobb Maurice: Political economy and capitalism.

of J. Willard Gibbs that "Mathematics Is a Language" and with this quotation Professor Paul Samuelson adorns the frontpage of his Foundations.[7] But these mathematically obssessed writers perhaps ignore the fact that mathematics can be successfully applied to those branches of science which deal with magnitudes that are internally homogenous. "Mathematics", as Professor Boulding points out, "operates at the level of abstraction where any heterogeneity or complexity in the structure of its variables can be neglected."[8] This fact clearly brings into light the weakness of mathematics as applied to economics—weakness because mathematical treatment of economic variables ignores the actual complexities of the internal structure of these variables. As for example, an eminent mathematical economist making a brilliant analysis of the Keynesian macrodynamic model writes, "Let i, Y and I be the interest rate, income and investment respectively." Thus he deals with the aggregates of those variables only—but it may so happen that the composition of capital or investment brings about a change in the system.

The economists who, greatly influenced by the Stiglerian notion that "Mathematics is the queen of all sciences", are bent upon establishing a happy marriage of economics with mathematics are "unemployed mathematicians" and not economists in the true sense of the term. G. F. Shove's idea that the "Principles" is the product of Ricardo's theories and Marshall's calculus is a false one. Mathematical training simply cannot make a mediocre economist a great one and as George J. Stigler points out,[9] William Whewell reproduced[10] Ricardo's doctrines in symbols only to produce one of the lesser works in economics. The claim that as the analysis of economic problems involves complicated formal reasoning, mathematics should be an important weapon in the arsenal of a competent economist is not justified. After all, economics is not so advanced as physics or other sciences and in the case of economic science, the scientists have not been able to find out a great number of uniformities with which it is possible to build up an analytical framework that may be illuminating in the process of analysing problems relating to those areas where uniformities have not been found out. Hence the primary task of economists at the present inchoate stage of their discipline is to find out "uniformities" and not to build up an analytical schema. Moreover, differential equations which form important tools of analysis in economics are useless. This system of analysis in most cases leads to conceptual ambiguity and as Professor Patinkin has shown, this analysis is unable to draw a distinction

[7] Despite Gibbs, I do not know whether Mr. Samuelson can give us any mathematical equivalent to the simple expression: "I love you."

[8] Boulding K. E. : "Samuelson's Foundations: The role of Mathematics." Journal of Political economy, June 1948.

[9] Stigler G. I.: Five Lectures on Economic Problems p. 38.

[10] Whewell: "Mathematical Expositions of some Doctrines of Political economy." Cambridge Philosophical Transactions. Vols. 3, 4 and 9.

between "market experiment" and "individual experiment" (which differentiation is vital for conceptual clarity of economic problems and for some policy prescriptions). Don Patinkin points out that the symbol $\frac{dq}{dt}$ for example is ambiguous in so far as it does not make clear whether the reference is to the "individual experiment" whose purpose is to relate amount demanded and supplied to arbitrarily given price and population changes or to "market experiments" whose purpose is to relate equilibrium levels of price to arbitrarily given levels of population.[11] And this is really the trouble with the "infinitesimal" type of mathematical analysis (as opposed to "topological" type of analysis) which is applied to economics. This type of analysis as developed by Descartes, Leibnitz and Newton is capable of dealing with relationships between variables subjected to infinitesimal changes "at a point" while topological analysis is adept in dealing with some general relationship of variables "in the large." Therefore, it seems that topological analysis may be more fruitful in dealing with economic problems.

But the fact is that the economists have developed a tendency to warp the economic theory to suit the exigencies of mathematical theory. The difficulty with the economists is that they have not constructed tools of their own to fit the tasks for which they are designed. And hence they are doing something akin to measuring the resistance of an electrically-charged body with a Geiger-Counter and detecting the radioactivity of a substance with a Galvanometer.

The failure of the economists to develop tools of their own is the reason of the failure of a theoretical science of economic dynamics. The mathematically expressed literature of economic dynamics as Professor Koopmans points out, "is limited by two factors: the linearity of the behaviour equations and the highly aggregative character of the variables used."[12] Moreover, the theory of dynamics is possible for a discipline when the concepts are sufficient to designate the specific state of a system at a given time and its postulates permit the deduction of a specific state at a future time.[13] The contemporary economic science in making publicly valid generalisations takes into consideration only generic properties of its subject-matter and neglects the specific property. Hence contemporary economic science is unable to denote the particular state of a system at a point of time. The other requirement of a science of dynamics is the establishment of a relation between a specific state of a system at a given time

[11] Don Patinkin: Money, Interest and Prices, Mathematical Appendix 1: a.

[12] Koopmans T. C.: Three Essays on the State of Economic Science, 1957.

[13] Northrop F.S.C.: "The Impossibility of a theoretical Science of economic dynamics", Quarterly Journal of Economics, November 1941.

and a unique state at any time. This is possible in the case of Newtonian mechanics because the law of conservation of momentum is valid in that discipline. Furthermore, the principle of mechanical causation should be established so that the specific properties of the state at a given time can help in determining the nature of future states. Human wants and other fundamental variables with which economic science(?) deals are continuously changing—hence "there is nothing in economics corresponding to either momentum or energy or their correlation principles in mechanics."[14]

For this fundamental reason even the most developed econometric models are too tiny tools for forecasting complex economic conditions. This is the truth of the matter despite Professor R. G. D. Allen's conviction that "mathematics is the steamshovel of logical argument"[15]—because the assumptions on which the econometric models rest are extremely unrealistic. One of the assumptions is the historical determinism. Behaviour-patterns during the timeseries under study are assumed to be constant. This may be the case when the economic process is comparatively stable—but when the economic variables are in a state of flux the model consisting of constant behaviour-patterns cannot give a true picture of reality. In determining what variables are relevant to the system the statisticians take into consideration only those variables that "fluctuate frequently" and recur at short intervals." So the variables occasionally omitted from the econometric scheme may cause disturbance to the forecasts when they became active. These two assumptions are the result of statistical inference that factors which show high correlation must necessarily be closely related.[16] And it is highly unrealistic to pick out only half a dozen variables from the vast welter of multitudinous, complex, interlocking and shifting relations and to put unnecessary emphasis on them in order to deduce a mathemetical scheme.

It is true that logical untidiness is the Achilles' heel of our discipline at its present stage, but it cannot be denied at the same time that for an empirical science like economics the crucial problem is the effective relationship of theory to observed facts. Francois Quesnay in the Introduction to his book, 'Essai physique sur l'économie animale' wrote:

'These two points of view, that of theory and observation which are reconciled perfectly, if combined in a single person, whenever they are separated wage against each other an incessant but futile war.' (The translation is Prof. Leontief's).

---

[14] Knight F. H.: Preface to Risk, Uncertainty & Profit.

[15] Allen R. G. D.: Mathematical Economics.

[16] Grayson Henry: "The Econometric Approach: A critical analysis," Journal of Political Economy LVI, pp. 253-57 where Professor Grayson mainly criticises Dr. Klein's model as represented in "The Use of Econometric Models as guide to Economic Policy," Econometrica, April, 1947.

Actually an abstract economic model can be effectively related to reality only "through an intricate system of basic definitions, classifications and rules of measurement" without which any rigorously constructed model has no empirical significance. The economists' inability to view a particular economic phenomenon as an integral part of a social whole or to see "the present as history" leads merely to the formulation of an inappropriate set of starting definitions yielding an analytical cul de sac.

Really the ultimate needs, the value system of the society, must find their place in the procedure employed in an economic analysis. The usual economic procedure of arriving at "operationally meaningful" theorems by rationality postulate is insufficient and it has been found out that from this type of theory the social element is usually drained off.[17] Talcott Parsons in his book "The Structure of Social Action" argues that economists must make commitments to value system which are "ideally typical" in the culture under analysis.

Though Professor Koopmans believes in a considerable degree of differentiation between experimental work and theoretical reasoning, yet Professor Leontief points out that such division of labour may be possible only in the case of classical physics which is characterised by the comparative lack of empirical basis. But in the case of such empirical sciences as atomic physics and quantum mechanics (economics also if it is at all an empirical science) the functions of two groups should be blended into a coherent whole.[18]

Economic literature is nothing but a record of continuous conflict between the "theorists" and the "empiricists". The historicists, institutionalists, statistics-gatherers, economic anthropologists on the one side and the mathematical economists, model-builders and theory-constructors on the other side combat with each other and devote the last calory of their energy to falsify the doctrines of their opponents. But despite the perennial mud-slinging by the two combatants, the fact stands that the science of economics is in an amorphous state. Economic literature depicts not a constructive process of reasoning of the economists—it has been rather transformed into a platform for the intellectual gymnasia of certain abstract thinkers. Utopias are no doubt created in literature—but they are created not merely as fiction but as comparative models which human endeavours should strive to attain. But the function of economics is not to inject the spirit of enthusiasm in the hearts of men—its main purpose is to study behaviour-patterns and generalise therefrom certain definite laws which may help to predict certain future phenomena. The success in this process lies in a

[17] Paul Sweezy in the Introduction to his Theory of Capitalist Development shows how the social element is drained off from the usual conception of wage in economic literature.

[18] Leontief W: The State of Economic Science, Review of Economic Statistics, May 1958.

harmonious blending of the two contending groups. If the words of François Quesnay (quoted above) be soaked in Leontief-jargon, then our obvious conclusion is that the need of the hour is a harmonisation of the work of a model-builder and that of a model-tester. And the model-builder, if he assumes the task of a model-tester too, will cry out in a Lawrencian vein, "Oh! give me my theory—let me see what it has. For the economist (in the new sense, of course) it is a dribbling liar!"

An apology: The above discussion should not be looked upon as an angry work (for the devastating sarcasams) born out of Schopenhauerian cynicism or Osbornian anger. It is nothing but an eclectic approach towards a formalisation of some important ideas about the economic science at its much developed (?) stage.

Indo-English Literature

SIVAJI KOYAL

Third Year, Arts

The Elizabethan days saw a reverend father journey to India. Little did the father know that this visit of his to an unknown land was to be a significant one. Today we know that his visit marks the beginning of Indo-English literature. Those literary products which have India as a theme, and are the works of Englishmen are usually known as Anglo-Indian literature. Differing from this, Indo-Anglian literature are those literary works which are written by Indians in English. Together they are known as Indo-English literature.

Anglo-Indian literature begins with the unimportant letters of Father Thomas Stephens, who visited Goa in 1579. From this time onwards for a hundred years Anglo-Indian literature meant, simply, books of travel and adventure. Of these, Sir Thomas Roe, the ambassador of James I at the court of "the Great Mogoar, King of the Orientall Indyes, of Condahy, of Chismer and of Corason" has left a readable account which happens to be the best of all the numerous works that were written then.

The first half of the eighteenth century was in a literary sense uneventful. Robert Orme, one of the greatest of Anglo-Indian historians was the chief name of the period. His "History of the Military Transactions of the British Nation in the Indostan" has been described as a prose epic.

The next name was that of Alexander Dow, who along with "The History of Hindostan" produced two tragic plays "Zingis" and "Sethona" which were put up at Drury Lane.

With the publication of Hicky's "Bengal Gazette," the first newspaper of modern India, it might be said that real English literature in India took its birth (1746-94). The great Orientalist Sir William Jones, who founded the Bengal Asiatic Society translated the "Hitopodesha" and "Shakuntala" and composed elaborate poems like the "Ode in Imitation of Alcaeus". To this period also belonged John Leyden, the first of that long line of writers who expressed in verse the common feelings of Englishmen in the land of timeless civilisation.

During the last years of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth, literary advance was, curiously enough, made only in the historical field. Dominating every other work was James Tod's "Annals and Antiquities of Rajasthan". Mention might also be made of Mary Mertha Sherwood, the famous writer of books for children whose "Little Henry and his Bearer" appeared in 1815.

The stream of literary output flowed on. The years preceding the Mutiny were too eventful. During this period we see Henry Louis Vivian Derozio of whom Sampson says that "he put all the pathos and passion of a sensitive nature into his metrical tale 'The Fakeer of Jungheera'." He has also left a number of sonnets and lyrics all of which prove his wonderful craftsmanship. The other important writers of this time are mostly historians. Such illustrious names as Grant Duff, Elphinstone and Sir John Kaye, founder of "The Calcutta Review" produced works of considerable merit. This period also saw fiction establish itself as a vigorous branch of Anglo-Indian literature. Hockley's "Tales of the Zenana" and other works were full of wit and liveliness. He was followed by Meadows Taylor whose "Tara," "Seeta" and "Ralph Darnell" were remarkable tales with a historical background.

The Mutiny was no barrier to the flowering of creative genius; literary products still went on increasing. Hunter the historian, Lang the satirist, the poets Waterfield and Mary Leslie were all producing numerous books worth mentioning for one or more than one reason. But their works were to be overshadowed by two greater poets. They were Sir Edwin Arnold and Sir Alfred Lyall. Sir Arnold's "The Light of Asia, a poem on Buddha" is a stirring poem and indicates the universal appeal of the message of love that was preached by the Buddha.

The closing years of the nineteenth century saw the publication of numerous works which had India as their theme. The outstanding name in Anglo-Indian fiction during this period was that of Rudyard Kipling. The slim books of Indian stories first made him known to the reading public. But though he wrote books on India, his attitude towards the

country was, to quote a critic, "mischievously hostile." Kipling painted India as a land of wild animals and jungles. He was not an inspired interpreter of India. His service to India was that he made the country interesting and known to the reading public of England which had never before given it serious attention. Also disturbing was E. M. Forster's masterpiece "A passage to India" which deals with the misunderstanding between the two races. Though Forster is a big name, yet we cannot but admit that he deliberately painted India as full of magic as well as wretchedness, leaving out all other objects which might be portrayed. Following Forster came Edward Thompson whose "An Indian Day", "Night Falls on Siva's Hill" and "A Farewell to India" reveal the author's concern with Indian politics. Thompson was also a good hand at poetry and many of his poems are thoughtful ones. Mention must also be made of the soldier brothers George John Younghusband and Francis Edward Younghusband, both of whom were true interpreters of Indian life and spirit. Their works are unusually philosophical and religious in tone.

From the above lines a conclusion easily follows:—Anglo-Indian literature is the continual growth of some centuries. But on the other side Indo-Anglian literature is of recent origin. Lord Bentinck's government, on the advice of Macaulay, decided to impart education to the Indians on western lines. English became the official language of India and the schools and colleges sent forth men who were reasonably at home in English and thereby created conditions favourable to the birth and growth of Indo-Anglian literature .

Rammohan Roy was the father of Indo-Anglian literature. A staunch advocate of English education, Rammohan was also a master of lucid English prose. His "Precepts of Jesus" and innumerable pamphlets on social reforms reveal a wonderful mastery over English. They simply astonished Bentham.

Following Rammohan came Michael Madhusudan Dutt. Madhusudan lives for his Bengali poems, rather than by his "Captive Ladie", a brisk narrative poem on Prithviraj and Samyukta who symbolise the deathless chivalry and romance of the Rajput race. The last three decades of the nineteenth century were an inspiring chapter in the history of Indo-Anglian literature. It was then that the brothers Manmohan and Aurobindo Ghose, the sisters Aru and Toru Dutt and Romesh Chandra Dutt poured out the contents of their heart and mind to the reading public.

A close contact with English and Continental culture made Aru and Toru think of "a feverish dream of intellectual effort and imaginative production." In 1866, their translations of French lyrics of the romantic school, under the name "Sheaf Gleaned in French Fields" appeared. This moving rendering led Edmund Gosse to feel that "if modern French literature were entirely lost, it might not be found impossible to reconstruct

a great number of poems from this Indian version". Toru Dutt's "Ancient Ballads and Legends of Hindustan" appeared in 1822. Here was revealed her warm impulse in a cool alien language. "Our Casuarina Tree" was the most popular of Toru's sonnets and poems. Aru Dutt was her best in English renderings of French lyrics. Her rendering of Hugo's "Morning Serenade" in a sweet and simple language is beyond praise—

"Still barred the doors! the far east glows,
The morning wind blows fresh and free.
Should not the hour that wakes the rose
Awaken also thee?"

Romesh Chandra Dutt, a contemporary of Bankimchandra, was a genius. He was equally famous as an economist, a historian, a poet and a novelist. His works reveal his wonderful command of the English language. If his name could be removed from the "Lays of Ancient India", one might as well say that it was the work of an Englishman. His "Ramayana" and "Mahabharata" in English verse are some of the best specimens of Indo-Anglian poetry. Here Romesh Chandra has used the "Locksley Hall " metre. In depicting the horrors of war, in delineating human emotions, in describing a multitude of events, Romesh Chandra is at his best in this poem.

During the close of the nineteenth century Manmohan Ghose began writing verses. Educated at Oxford he easily grasped the English language and along with Laurence Binyon, Arthur Cripps and Stephen Phillips, he brought out a book of poems—"Primarera". His poems on nature breathe an atmosphere of sadness and melancholy. Many take him to be the most remarkable of Indian poets who wrote in English. His Love Songs and Elegies, and Songs of Love and Death are fully suggestive of this fact. Manmohan was also a lyrist and his "Immortal Eve" and "Orphic Mysteries" are two wonderful pieces of lyrical poetry. Aurobindo Ghosh, Manmohan's younger brother, was also a literary figure who greatly contributed to the development of Indo-Anglian llterature. His blank verse play "Perseus the Deliverer," the narrative poems "Urvasie" and "Love and Death" and other lyrical poems are proof of his manysided poetic genius. In "Savitri", a poem written in blank verse, Sri Aurobindo has given us his idea on divine life. Here we find a fine blending of metaphysics with legend. Sri Aurobindo was also remarkable as a prose writer. "The Life Divine", his most famous work and other prose works like "Essays on the Gita", "The Foundation of Indian Culture", "The Secret of the Veda" are all coloured with philosophy and moral and spiritual teachings.

Perhaps the greatest figure in the field of Indo-Anglian literature of the nineteenth century was Swami Vivekananda. He wrote and lectured

in English in order to make his message universal; and in the great mingling of passion and reason, in the sanity of his judgments, in the fiery majesty of his declamations and in the dignified cadence of his periods, he has hardly any rival. "He taught with authority", said Sister Nivedita and truly his works have an air of eternal vigour about them.

From the beginning of the twentieth century till the present time there has been much commotion and movement in the literary realm. At the beginning of the period we find Rabindranath Tagore with his contributions. His prose work "Sadhana: The Realisation of Life and the Religion of Man" as also the poem "The Child" were originally written in English. Apart from this, his English renderings of his Bengali poems are pearls beyond price. His "Gitanjali", "The Cresent Moon", "Fruit Gathering", "The Gardener" and other books of poems are all rich in thought and expression and embody his lofty philosophy. Over and above this, there was also a touch of mysticism in his numerous works. The fact that Tagore's works were appreciated by his English readers can be explained, in the words of a critic, "by the general appetite for moral reflections, not too deep, with an Eastern setting not too remote." Truly he was the first Indian poet able to interpret the spirit of the East to the people of the West. Another literary figure, who made some definite contributions to Indo-Anglian poetry was Sarojini Naidu. "The Golden Threshold", "The Bird of Time", and "The Broken Wing" are three volumes on which her fame rests. Such commonplace and familiar scenes like a moonlit night, a June sunset, break of dawn are wonderfully described by her in a flowing language. In other poems like "To a Buddha Seated on a Lotus," and "The Flute Player of Brindaban," Sarojini Naidu has expressed the Indian-like message of love and peace.

Indo-Anglian literature has not ended with the writers of whom we have just spoken. There are many writers of yesterday and today whose contribution towards the growth of this literature must be acknowledged. Of the poets Harindranath Chatterjee, Dilip Kumar Roy, Bharati Sarabhai, Lotika Ghose and Dom Moraes are the most well-known. In fiction the outstanding names are that of Mulk Raj Anand, Khuswant Singh, G. V. Desani, K. A. Abbas, Bhabani Bhattacharya and R. K. Narayan. All these writers have tried their best to draw 'real India'. But after all does real India consist of only labourers and coolies? Are the problems that arise from famine and flood and social differences only to be found here? Certainly not. Over and above all this there is much joy, more sunshine and deeper emotional problems. These also need the recognition of the writer's pen. And one cannot but notice the comparatively slow development of the literary forms other than fiction in the realm of Indo-English literature. But speaking of non-literary activity, e.g. history, philosophy etc. and of certain strictly specialized branches of literary activity

we might say that they are well on the road to development. In philosophy S. Radhakrishnan, S. N. Dasgupta and M. Hiriyanna, in history Jadunath Sarkar, K. M. Panikkar and others, in humorous and satirical essays and in literary essays Nirod Chaudhuri and C. Rajagopalachari, in autobiographical literature Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi are the chief names. With their invaluable contributions they have enriched this unique literature and "given it both width and depth, variety and vitality".

Indo-English literature saw a small beginning. With the march of time it is gradually blossoming forth. It might be likened unto a plant that was small in its earlier years. Today it has taken firm and deep root and is branching out in many directions. Many still describe this literature as "alien". But it is wrong to think of it as such. Like modern Bengali or Gujrati literature it is just a branch of Indian literature. The future that awaits Indo-English literature is not full of bright sunshine. Rather it is a little too cloudy. With the removal of English from the official status, we do not know how many will care to learn it, still more how many will care to use it as a medium to express their thoughts and ideas. About Englishmen writing on India we have nothing to say, for it is their wish and desire. All thankfulness awaits them if they ever write on India. Anyhow, leaving all this aside, we have some words to say to the writers of today and tomorrow. Ours fervent hope and desire is that they will truly interpret the spirit of India, make known to the world her message of love and peace and thereby increase international understanding.

The Changing Social Framework

ARUNODAY BHATTACHARJYA

Fifth Year, Arts

I

It is a matter of common knowledge that the explanation for India's lagging behind the developed countries lies primarily in the recency of her efforts for industrialisation. A study of economic history, however, shows that the industrial revolution which marks the starting point of economic development of the modern era, has not taken place in all the countries at the same point of time or in the same situation. While it began about two centuries back in Great Britain, we, in India, are facing it only in the

present decade. Even in Asia, Japan, for instance, precedes India in industrial advancement. And while pioneer countries of industrialisation started from the primitive modes of production and passed through various epochs of development marked by the revolutionary innovations in cotton textile manufacture, steam-engine and railway, automobile and electricity; the recently developing countries may think of employing the atomic energy—a development, perhaps, beyond the imaginative capacity of our forefathers to visualise a century ago. Naturally, therefore, the process of industrialisation of the developing nations to-day are not—and, in fact, should not be—the carbon-copy of that of the forerunners.

However, though industrial revolution differs in point of time, process and stages from country to country, its impact on any economy is far-reaching. It changes the socio-economic framework quite astonishingly. But, why and how does it cause such glaring changes in the organisation and affairs of mankind? The purpose of the present article is to deal with this big question mark, especially in the light of the changing social framework of the present India.

II

Industrial revolution means a change in the 'technological basis of society'. It implies the application of science and technical know-how in the various spheres of the economic life and activity. Its influence on the social life is, therefore, patent. The influences in different countries, however, differ owing to the differences in the existing historical, institutional, psychological and political determinants of social life.

One can, indeed, point out that in some countries the industrial revolution was a spontaneous movement of the economic system: a crystallized precipitate of evolutionary economic forces as was the case with Great Britain. In the days of free-enterprise economy, the state of things to come could hardly be conceived by the adventurous investors and producers with any degree of precision. But the significant fact about industrialisation today is that it has been undertaken in most cases under conscious planning. Apparently, therefore, it is likely that its outcome in the social sphere will be different from what was noticed in the case of the Western countries in the past. It cannot be denied that there will be points of difference. But for that, it would be wrong to over-emphasize them. Economic history of all the developed and developing countries provides us with a number of common points of similarities. Whether in a capitalistic or in a socialistic economy, or in a so-called socialistic-pattern of society, industrialisation, when it sets out, will mould the social framework in almost the same pattern. Its effects on a capitalistic economy will, however, differ from those on a socialistic one so far as the ownership and guid-

ance of means of production and distributional aspects are concerned. In brief, the effects of industrial revolution on men in society are unidirectional. They differ from country to country, not in kind, but in degree.

III

A basic concomitant of industrial revolution is a transition of the economy from a predominantly agricultural to an industrial one. As industrialisation proceeds, more and more people are employed in the newly built factories. Increase in production, especially of manufactured goods has a further cumulative effect. It widens the trade-avenues facilitating the absorption of more and more men in trade and commerce. In fact, the essence of economic development is an expansion of the secondary (manufacturing and factory production) and the tertiary (trade and commerce) sectors as against the primary (agricultural) sector.

A change in the existing occupational pattern would thus follow in the wake of industrialisation. And gradation of different occupations according to the scale of social estimation and privileges would also get reshuffled. Non-agricultural occupations would mark an enormous increase. But one should not hasten to conclude that industrialisation of an economy will mean that the absolute number of persons employed in non-agricultural occupations will be greater than that in the agricultural sector. Nor can it be formulated axiomatically that the former can increase only by decreasing the latter. For, unlike the cases of most western countries, the working population may expand. In Japan, to cite an example, the absolute number of agricultural workers remained more or less stationary, but the increase in population was absorbed in the secondary and tertiary occupations. To some extent, the same trend is perceptible in India. Incidentally, in India, new vacancies created by industrial growth are not yet enough to employ all the existing unemployed and under-employed workers and those resulting from the increased population growth. Nevertheless, the significant fact is that we are experiencing an increase in the ratio of the non-agricultural to the agricultural workers in the economy as a whole. While at the beginning of the Second Five Year Plan, agricultural and allied pursuits continued to absorb about 70 per cent of the total working force, by 1975-76 the proportion would come down to 60 per cent or so.

IV

It is a common experience of all developing countries that as industrialisation proceeds an increasing stream of people flows into the urban areas. No 'back to village' slogan can resist the inflow. Dire economic necessity goads a large section of the rural population to rush to the growing

industrial locations. Without probing further into the causes—which may be either an escape from starvation or a change-for-better-attitude—we can consider the impact of this transfer on the life in society. First, as the urban population swells, the problem of urban housing becomes baffling. The problem was faced by the developed nations, and we, too, must face it to-day. Secondly, the concentration of population in small urban areas gives birth to social and political chaos. There is hardly any great harmony of interest among the varieties of population that constitute the urban life. What is noticed is more of a conflict of interest between the have and have-nots. The tussle becomes a routine affair in a democratic country. And when we are having a socialistic pattern of society with the pivotal role assigned to the government, the signs of political unrests become matters of serious concern. There can be, of course, no denial of the fact that such political upheavals originate from and gain in momentum by the activities of the frustrated low income-earners and, so to speak, 'pavement-dwellers', especially when they get leadership from within or without.

Common interest of a group or sect, however, leads to the growth of numerous organisations. Urbanisation, which is at once a cause and an effect of industrialisation accelerates the tempo with which the various local, regional and inter-regional organisations increase in number and gain in strength. Of cardinal importance among these offsprings of industrial revolution is the trade-union. Collective bargaining has armoured the individual workers against the caprice of the employers, especially when the government has recognized the legitimate right of the workers to stand united. Trade-unions in India are becoming more and more powerful, though, no doubt, our trade-union movements are still behind those in other industrialised countries. Anyway, the sociological effect of trade-unionism unquestionably deserves attention. The workers are lining up under the new leadership of unions as against the traditional group or communal leadership.

V

Moreover, as large numbers of people are mobilised from their ancestral homesteads to industrial sites, the hitherto prevailing pattern of social relationships and coordinations faces a break-down. One well-known victim is the joint-family institution. Whether this is beneficial or baneful to our society is debatable. The controversy is kept outside the ambit of this article. But it can be stated cogently that we are bound to see the loosening of the joint-family fabrics as a corollary of the economical transformation crystallising in our country. In the next place, the cultural and psychological attitudes would demonstrate a radical drift. People become at once individualistic and cosmopolitan. It sounds rather paradoxical. No doubt,

we, in India, are more socially minded people than most other nations. But urban life is making us more and more self-dependent and individualistic. This becomes strikingly apparent if we, even now, compare our urban life to rural life. On the other hand, we know that man is by nature a social creature. Interdependence of needs is impelling us to mix and collaborate with our neighbours belonging to various castes and creeds. In urban life *the spirit of cosmopolitanism thus derives its sustenance.*

Yet another patent feature of this magnificient transformation is the change in the individual's choice of the channels for the satisfaction of his desires and emotions. Freed from the routine-bound life, people like to be in their own way with their leisure; the ways are, of course, limited by the number of alternatives one can have. The significant fact is that these alternatives have changed,—as they frequently do. The radio, cinema, games and sports and various hobbies are the companions of most urban people in their leisure. Clubs and unions are preferred to the traditional social gatherings or frequent visits to relations which were characteristic features of the old rural life. People make friendship with persons having common interests and views, barring the exceptions, who may belong to any caste or race. The prejudices of agrarian life decay in urban climate.

VI

In the new economic climate precipitated by industrialisation the type and nature of workers get transformed. Growth of heavy industries means the use of big and intricate machineries. Skilled workers with technical know-how are required to work them. Even in small-scale industries, specialised technical knowledge is essential. Primitive methods are, of necessity, discarded. The untrained workmen with bare hands, therefore, turn out to be of less importance. And, naturally, the technicians or skilled workers come to occupy positions with greater remuneration and power. Technocrats become the powerful group in society due to the very nature of technology.

It must be borne in mind that when science and technology are applied to all the spheres of economic life and activity, they inject a deep-seated change in human nature and outlook. Indeed, they can be applied only when a people can bear the burden with profit. The workmen must adapt themselves to the mechanised modes of production. They must inevitably become machine-minded. This human aspect deserves serious consideration in our country in rationalising the various industries for reducing cost besides the question of creating more unemployment among the vast mass of unskilled workers.

Furthermore, as industrialisation works out its course, the pattern of income-distribution among the various classes, groups or individuals in the

economy gets remodelled. The proposition in based on the facts of economic history of all industrialised countries. Industrialists become the dominant sections as against the feudal land-lords in an agrarian economy. Besides, persons engaged in trade and factory-work earn much more than those who work in the primary, that is, agricultural sector.

VII

One may, however, point out that the last fact will not happen in India as we have adopted a socialistic pattern of society, which was not the case with the developed countries in the West. Admittedly, we have launched our developmental Plans in a mixed economic set-up with a dominant public sector. We also aim at bettering the lot of agricultural workers. But this does not invalidate the applicability of the above analysis in our country. The process of change may not yet be complete, but the tendencies are conspicuous that it will be so in the offing.

The fact that all these effects of industrial revolution on the social-framework have not fully exerted themselves in India is due, chiefly, to the simple reason that industrial revolution is still in its nascent stage. Of course, the more there is co-existence of small and cottage industries with the large-scale ones, and more equally all the regions get developed, the less glaring and more gradual will be the effects.

In conclusion, it can be stated emphatically that the transformation of our social framework, in the line discussed, is the natural outcome of industrialisation. Whether it is, on the whole, desirable or not, is altogether a different matter and is for the hedonistic or utilitarian philosophers to judge. An economic analysis can indicate only the causes and effects with their inter-relationship without any emotive implication. For, economic calculus, as it is, is based upon scientific neutrality.

The lawyer was in the midst of an argument when the judge, suddenly overcome by a mood of relaxation, put his feet up on the table. The argument stopped.

"Go on," ordered the judge curtly.

"I was wondering, M'Lord," said the lawyer, "as to which end of Your Lordship I was supposed to address."

—Dibyadyuti Hazra, *Fourth Year, Arts*

Some Trends in Contemporary Western Drama

NANDINEE MAJUMDAR

Fifth Year, Arts

In spite of the fact that more and more people have taken to writing plays because it is "fashionable" to do so, much significant dramatic work has been written in the last twenty years or so. It is imperative to mention, at the outset, that the present discussion is confined to modern prose drama, for the appreciation of modern poetic drama is still limited.

The revival of dramatic activity does not point towards a parallel of the Elizabethan situation for the novel still remains the best medium of expression for the spirit of our age. In fact, the present popularity of the drama is surprising, for the rivalry between the stage and the screen was never more marked. With the cinema and the television rapidly ousting the play from its former position of importance, it is certainly strange that there should be a revival of interest in drama. Until very recently, play-going was confined to a group of culture-conscious intellectuals who could afford it. Currently, however, the culture bug having bitten the intelligentsia in most European countries, or more probably, due to the sharp fall in the standard of films one is left with, the average movie-fan has turned play-critic. And one must admit, that the modern playwrights have, on the whole, risen to the occasion.

This is no small achievement. For the task that faces the modern playwright is clearly equivocal. While playwriting is to some, one of the least troublesome ways of making money, (after all, one need only read up one's Freud, add the jargon picked up from the family psychiatrist, punch the already formidable mixture with a complex or two, and one has the leading lady,—a sultry eighteen-year-old, invariably French—and behold, the producers lap it up greedily) it also leads one into the danger of becoming a Hollywood script-writer. The menace of Hollywood-isation is one that threatens every serious playwright today. If he writes a comedy, it emerges after a complete metamorphosis, as a full-fledged musical. Witness the transformation (and I dare say degeneration) of "Pygmalion" into "My Fair Lady". Once Hollywood gets its hands on a play, that is the last the author hears of it, as it was when *he* wrote it. Often, he recognises only the title in a screen version of his play. But then, what would you, for Hollywood is a good paymaster.

The most important factor in moulding the technique of the modern drama has been the influence of the screen. The finances required to produce a play can never be realised as easily as they would be in the case of a film, for obvious reasons. The solution, therefore, is to write plays that could be adapted to the screen without compromising the author. This accounts for the elaborate settings, the extensive stage-directions and the explicit descriptions of the dramatis personae which characterise a modern play, for these leave no room for directors' improvisations. The whole idea is to give the movie-goer a fairly adequate impression of what he would have seen on the stage. The modern playwright does not compete with the film-industry, he gives the screen much scope for further improvement. Play-wrights such as Tennessee Williams for instance, rewrite their plays for the screen with remarkable effect. The successful filming of "A Streetcar named Desire", "Cat on a Hot Tin Roof" "Tea House of The August Moon" and others show that a fusion of cinematic and dramatic art would perhaps achieve the best effect.

Yet the difficulties that impede such a blending of the two are apparent. While a stage-play emphasises dialogue and "inner" action (to use a rather vague expression), a film stresses physical action and movement, and a long dialogue would fall rather flat on the screen. Yet the dialogue does form an important part of a play. It is the surface,—words as opposed to ideas, the jargon as against the characters, these form the "skin" of the play and any attempt to curtail it would be to mutilate the whole work.

This is clearly a point of controversy between the stage and the screen. Although the dialogue of a typical modern play is quick and lively, its fluency is not necessarily sustained throughout the play. In any case, the "language" of the play could never be effectively represented on the screen. While it is true that the spoken word reigns supreme on the stage, there is a wealth of poetry in the language of modern prose drama which would be obscured on the screen due to the profusion of spectacle and external action, and due to the fact that good diction is not nearly as important on the screen as it is on the stage.

In a screen version of the typical modern play, one would therefore miss one of its most distinctive features, its almost poetic language. The plays of the French dramatist Jean Anouilh for example, have more poetry of the theatre than anything a contemporary poet has yet put in metrical lines upon the stage. Or Eugene O'Neill, for instance, who has more than "A Touch of The Poet" in his work. In fact, with O'Neill, the fusion of prose and poetry seems almost deliberate. One sees this even in his least typical plays, such as "A Moon for the Misbegotten", in which one of the characters, the rough-and-tough daughter of a New England farmer, who thinks nothing of hitting her suitors on the head and expresses

herself throughout the play in a crude, coarse language, is found saying towards the end while she sits in the moonlight with her drunken lover:

"You're a fine one, wanting to leave me when the night I promised I'd give you has just begun, our night that'll be different from all the others, with a dawn that won't creep over dirty window-panes, but will wake in the sky like a promise of God's peace in the soul's dark sadness."

Lines such as these could never be represented on the screen without seeming incongruous. The dramatic effect of these lines would be entirely lost on the screen.

The themes chosen by the modern dramatist show a focus of interest on the representation of personal relationships. The tendency is to depict individuals in conflict with each other, rather than with their circumstances, to portray the ties or lack of ties between human beings, and the more intimate, personal emotions. This calls for a limited number of characters, and the play is, as a rule, monopolised by the two or three main figures. The dramatist is obviously aiming at concentration. This is another stumbling block for the screen. The intense mental or spiritual conflict between two people which makes for very effective drama, never makes as good a film, because there is very little outward action and the film is necessarily slow.

The film version of any play is liable to mask the author's personality or purpose to a certain extent. The sentiment masked under cool and elegant mockery, the satire in the guise of brilliant comedy, are features that belong to the stage alone. It is significant that while the modern playwright is eminently successful in his comedies or satires, he is seldom able to wear the tragic mask with ease. Perhaps it is due to their lack of melodrama that modern plays can seldom be successfully filmed.

It is clear, therefore, that despite the huge expenses, the play must not rely on the screen for its presentation. In spite of the over-whelming difficulties it has had to face the stage has come into its own. There have been new ideas and talented playwrights who have brought the old vigour back to drama. Plays like Osborne's "Look Back In Anger" make for arresting, if uneven, theatre. The grafting of old, familiar themes on to contemporary settings seen in Archibald Macleish's "J. B." which is the story of Job transferred to the twentieth century and centres around an American industrialist, represent the dramatist's effort to restore to the modern stage its lost grandeur and loftiness. And, taken as a whole, one could say, with much justice, that the effort has not been in vain.

Culture and Economic Growth

HARIGOPAL AICH ROY

Fifth Year, Arts

Problems of economic development have engaged the attention of an increasing number of economists in recent times. But their analysis suffers from one common defect : it is oversimplified. They have outlined the theories of economic growth solely in terms of economic variables, such as, size and productivity of working force, size of capital-stock, capital-output ratio, etc. They have viewed economic growth in one dimension, but other dimensions of economic development as ethical and cultural factors have eluded their vision.

To tie up these loose ends in the theory of economic development and present an illuminating explanation we have to watch the industrial economy unfolding itself out of the stagnant mediaeval structure. The modern industrial capitalist society emerged out of the feudal mediaeval society. It is not as though there was a passage from pure feudalism to pure capitalism. Capitalism was rather conceived in the womb of feudalism. Schumpeter writes, "We may well wonder whether it is quite correct to look upon capitalism as a social form sui generis or, in fact, as anything else but the *last stage* of the decomposition of what we have called *feudalism*. (Italics mine.) The steelframe of that structure still consisted of the human material of feudal society and this material still behaved according to precapitalist patterns. It filled the offices of the state, officered the army, devised policies—it functioned as a classe dirigeante and though taking care of bourgeosie interests, it took care to distance itself from the bourgeosie..... It was an active symbiosis of two social strata, one of which no doubt supported the other economically but was in turn supported by the other politically."

But in course of this evolution we can discern a slow process of changes coming about in social values. In the old mediaeval society religious occupations or occupations of military-cum-political character were given the pride of place. Productive work and wealth-creating activities were held in contempt. But soon there were changes in religious outlook and these religious changes came to be associated with changes in habits.

It was Luther who first revolted against the existing ecclesiastical order. But as regards the state and the society, he regarded activity of trade and commerce as despicable. But the attitude of latter religious

reformers (like Calvin) towards productive work was distinctively different from that of Luther. The rise of puritanism fostered new outlook. To develop the resources of the earth, it was held, is a secular calling. It is a task in discipline and so congenial to the growth of spirituality. The resources of nature are the gifts of God and it is His design to see men develop them. Emphasis on austerity was thus coupled with a new urge to productive work. The thesis that the development of capitalism was facilitated by these religious changes is confirmed by the fact that in underdeveloped regions in Western Europe the hold of the older church was greater.

In the stagnant mediæval society production techniques and consumption habits did not change so violently and in such a deliberate fashion as they do in the modern age. Production would be usually dominated by time-honoured techniques. Consumption habits, over a fairly long stretch of time, would be governed by social customs. But in the new type of society based on a new conception of social values, decisions were no longer dictated by conventions but by economic rationalism. What commodity to be produced, and in what amount and at what prices were from now on determined by a comparison between total costs and total revenues. This spirit of sober calculation, contradistinguished from the bonds of old conventions, helped the cause of industrial growth.

But the tremendous upsurge of industrial activities cannot be fully explained by the cold calculating spirit. Keynes's view is here different from the tenets of economic rationalism as expounded by Max Weber and others. He mentions "animal spirits of spontaneous enthusiasm" which must have been responsible for development. The fact is that cultural climate so changed itself as to give approbation to productive ventures. Wealth-creating activities were not simply looked upon as secular calling but were looked upon as acts of faith which should be carried out with crusading zeal. Energies were released and sanctions were created for rapid and vigorous programs.

It is not merely in changing habits that these ideological movements dissipated themselves. New values do not emerge in isolation—they are coupled with new habits. In Western Europe Calvinist movement emphasized, besides religious points, the necessity of unceasing work. The intense spirit of nationalism in the Japanese people turned them into hard-working fellows. As one writer contends, "The drive for relentless work was no less important for industrialisation than steam or power." It is not overnight, out of nothing, that a nation may have hard-working people. Mumford writes, "Behind all the great material inventions of the last century and a half was not merely a long internal development of technics: there was also a change of mind. Before the new industrial processes could take hold on a great scale, a reorientation of wishes, habits, ideas,

goals was necessary. Here lies the cardinal importance of new social values.

The values of a society are reflected in the curriculum of education. As new social values emerge the educational curriculum undergoes a radical change. In a stagnant mediæval society the knowledge of classics is enthusiastically propagated. There is a lack of any technical bias in the system. In such an economy skills are of a traditional sort and are handed down from the master to the apprentice directly. But in a dynamic economy techniques are changing and so continuous changes are occurring in types of skill. Nor are the major industrial relations that of master and apprentice or father and son. For greater mobility of labour and for greater adaptability to changes in techniques it is convenient to pass on skills by means of impersonal symbols. This means that remodelling educational system with a technical bias is necessary. The pioneering industrialist will feel the necessity of introducing a new academic curriculum suitable for purposes of industrialization.

From the foregoing analysis cultural factors seem truly to have a large role to play in economic development. It has been found that these new values create a social urge to developmental programs which brooks no barrier nor delay. But ordinarily two factors are invariably emphasized as insuperable impediments to industrial development: (1) shortages of capital; (2) lack of a large market. The fact that these impediments are no impediments in the face of a cultural change can be easily demonstrated. In most of the underdeveloped countries expenditures are not for mere subsistence but are reflections of the cultural pattern. If the cultural background can be changed, ceremonial expenses can be harnessed to the purposes of development. Expenditures on ceremonies in connexion with birth, death and marriage constitute a not insignificant portion of total expenditure in India. Then there are objective instances of surplus invested in gold and silver but not in productive industrial investments. Some may argue here that there being no outlets of productive investment, surplus has been invested passively. But the lack of investment opportunity is itself due to lack of investment. Investment made once along a number of mutually supporting lines will justify investment. Say's law had some formal weaknesses, but it was once accepted not by fools but by economists of average intelligence. It had an important element of truth in it. In underdeveloped countries investment made along a number of supporting lines creates requisite markets for a self-sustaining process of growth. Acting on the basis of a certain wave of optimism a swarm of investors undertakes investment on a number of lines. This optimism held for a while justifies further optimistic moves. Expansion of output by one industry (say, textile industry) gets absorbed by the demand for it of workers in other industries (say, shoe, watch, automobile, etc) whose

outputs are in turn consumed among themselves and also by the workers of the aforesaid (textile) industry.

Alongside of this argument of analytical validity can be posed facts of historical validity. As new opportunities present themselves in the form of markets hitherto unexplored, the efforts of entrepreneurs receive further impetus. When textile industry was introduced in Britain, Indian market and markets in the new continent gave a fillip to production in centres like Manchester and Lancashire. In recent times consumption pattern is least rigid—wants can be created so to say. Exploration of market today cannot mean the opening of frontiers of a quite new country but the accentuation of "demonstration effect" on an international plane through persuasive advertising. Thus the argument of the absence of a large market is also weak.

So the supposedly fundamental diagnosis of underdevelopment in terms of two insuperable impediments is not as fundamental as it appears to be. Conventions of a typically unindustrialised backward community are themselves a fundamental explanation of impediments to development. It remains for the group of pioneering industrialists to convert the community to new faiths—new values. If this group—which is often by the logic of circumstances a social outgroup—succeeds in the mission of inculcating new values into the society, can a process of self-sustaining growth start in underdeveloped countries. Here political factors as the amount of government support the group enjoys are as important as cultural factors in economic development.

BIBLIOGRAPHY

Lewis Mumford—*Technics and Civilisation,* London, 1934.

Schumpeter—*Capitalism, Socialism and Democracy,* New York, 1942.

Max Weber—*General Economic History.*

Keynes—*General Theory of Employment, Interest and Money,* London, 1936.

Rostow—*Process of Economic Growth,* Oxford, 1953.

Lewis—*Theory of Economic Growth,* London, 1955.

A. Datta—*Essays on Economic Development,* Calcutta, 1957.

The Coffee House

SYED TANWEER MURSHED

Third Year, Arts

Like unto the sons of Ishmael, I, too, was driven out into the wilderness. Or so I thought. Reader, raise not the questioning eye-brow, have patience, bear with me—thou wilt soon be enlightened as to what I allude to. I refer to my transfer to Presidency College from St. Xavier's where I had spent a good thirteen summers of my scholastic life. Reader, during thy leisurely perambulations along Park Street, thou must have remarked that at a negligible distance from the magnificent portals of St. Xavier's is situate an inn they call Magnolia Sodafountain, an apellation ingeniously abbreviated to "Mags". My acquaintance with this establishment was made during the last two years of my stay in the School Department, when I, together with some of my associates, utilized the few "off-periods" in visiting the aforesaid restaurant. The frequency of these visits considerably increased on our entering College, when "off-periods" seemed to preponderate over what may be termed "on-periods". And very soon we made the discovery that these were flexible terms, in that an "on-period" could be converted into an "off-period" by the simple but brilliant expediency of playing, like Horatio in the play, the truant. So that, while an assiduous professor of mathematics was unveiling the mysteries of the infinitesimal calculus (differential and integral) to an ever-decreasing number of scholars,—in fact one could almost say that the number of mysteries unveiled was inversely proportional to the number of scholars present—we were blissfully established in the air-conditioned atmosphere of Mags, sipping a chilled lemon-squash, veritable nectar for the gods, of a summer's afternoon. Thus a sympathetic and understanding soul will readily appreciate my predicament, when I, after casting a last, long, ling'ring look behind, joined Presidency College. Adam evicted from Paradise must have felt much as I did. O for those halcyon days, I sang, O for good old Mags. But out of evil cometh good, and lo and behold! Long ere I had spent forty days and forty nights in the wilderness, I began to sing, with full-throated ease, in profuse strains of unpremeditated art—I had discovered Coffee House—God was in His Heaven, and all was right with the world.

This Coffee House, I assert, is a blessing (in disguise?) to humanity in general, and to students of the Presidency College in particular. Why it has not been awarded the Bharat Ratna is one of those unsolved mysteries.

Its merits, like the crimes and misdemeanours of Warren Hartings, Esq., are diverse and any attempt at their detailed enumeration will necessarily prove abortive. Hedged in as we are by limitations of time and space, we can but touch upon a few.

For one thing, the modest demands of its proprietors by way of financial remuneration for the comestibles consumed is, per se, very attractive. And in my case particularly the change from Magnolia's to Coffee House contributed substantially towards relieving me from the pecuniary embarrassment inevitably produced by frequent visits to the former establishment! Nor can one overlook the paramount factor of time. It has been experimentally established, like Sir Isaac's well-known Law of Universal Gravitation, by an enterprising pioneer in this particular field of research, that, given the necessary amount of pluck and determination, and a poker-face, one can utilize one cup of coffee in making a sojourn of approximately three hours; or, to generalize by the use of functional notations,

$$H=f(N)$$

where H denotes the number of hours of stay, and N the number of cups of coffee imbibed. Not bad, sayest thou, reader? Thou'rt in the right. Not 'alf bad as our Limey friends say.

But to wash our hands of these odious, bourgeois, utilitarian aspects of the place who has not heard of Coffee House as the cynosure of all intellectual attraction? Philosophy, indeed, has been transferred from libraries, class-rooms and books—the conventional and prosaic repositories of learning—to C.H.—by which brief and witty appellation the worthy institution is known to the populace. There, for example, is our friend S. B. holding forth an erudite disquisition on the "existentialism" of M. Sartre. What is existentialism, one might enquire, thereby displaying a prurient curiosity. I cannot enlighten such a one. Nor can S. B. Or there, for instance, is friend S. T. M. waxing eloquent on the Outsider Problem as presented by, inter alia, Colin Wilson, Nietzsche, and Albert Camus, a subject about which neither S. T. M. nor his audience knows anything. But does that trivial deficiency retard the precipitous onrush of words? Not in the least. And that gentleman, R. B.—alias Raja—the one trying to abstract the contents of the plate surreptitiously—he can, at any given moment, expatiate on the recondite subject of "behaviourism". The reader may be interested in modern trends in literature. If so, he merely comes to D. B. and goes back replete with James Joyce, Virginia Woolf and the surrealistic school of thought. In fact it has been proved beyond any shadow of a doubt that if one wishes to make learned (and protracted) asseverations on an abstruse topic, one has merely to attach the suffix ISM to a suitable noun (abstract, if possible), attribute the concept thereby

established to a convenient Mrs. Bunbuzy and—pour forth! Poets are known to give to airy nothing a local habitation and a name. The frequenters of C. H. are worthy emulators.

Or perhaps one is not possessed of an intellectual turn of mind. What matter? C. H. is not barred to such as these. In fact, what spot more ideal for the post-mortem of the nefarious activities carried out in the Economics (Pass!) class than Coffee House?—how M. S. gave a realistic, vocal description of two graymalkins engaged in deadly combat, how cachinnogenic the effect was upon the class, how Nemesis (for though the professorial mills grind slowly they grind exceeding small) overtook him, and how he was unceremoniously ejected from the class-room, much to the relief and delight of the author of the demonstration, and the envy of his pusillanimous fellows.

Or perhaps one's mental structure is cast in a more serious mould. What of it? One merely shuts one's ears to the outer din, so to speak and discuss with a kindred spirit the quality of the lectures delivered, or the prospects of one's giving a coruscating performance at the impending examinations.

All such persons are to be discovered in the Coffee House, discussing all such topics. A more variegated collection of humanity would be difficult, indeed impossible, to conceive of—yet they are such stuff as the human kind is made of. The familiar, homely atmosphere, the gay chatter of a myriad tongues (the proprietor of each trying to speak nineteen to the dozen!), the happy, carefree, boisterous laughter—for all the gold of Croesus we would not miss them.

(*N.B.*—To such readers as take the above as a boost for the Coffee House during a slump period, I can do either of two things: I can either (a) hope they will be devoured by bears like the children in the Old Testament who made mock of the prophet, Elisha, or (b) say, "Evil lies in the eye of the beholder," from the south-east corner of my mouth, and with a nasty gleam in my eyes).

Who Wrote *Hamlet* ?

DIBYADYUTI HAJARA

Fourth Year, Arts

A short dialogue. *Location*—The office of Mr. James Burbage and the Mermaid Tavern.

Characters :—Sir Francis Bacon, Mr. James Burbage and William Shakespeare.

SCENE I (Burbage's office)

Burbage : Now, this what's-its-name of yours, Mr. Bacon, I mean this *Hamlet*,—of course we must change the title,—has some good stuff in it and might succeed. But it needs fixing.

Bacon : Fixing ?

Burbage : I couldn't possibly produce it as it stands. The public wouldn't touch it with the long end of a barge-pole. I suppose you are new at this game ?

Bacon : (Muttering indistinctly) I mean to say, I have written some small things on my own, like the *Novum Organum* and *De Interpretationæ Naturæ* and some others.

Burbage : (To whom all the names are Greek) Not plays ?

Bacon : Essays.

Burbage : Essays ! (Gives a short laugh)—Well, as I was saying, this thing needs a bit of fixing. And the man to do it is young Shakespeare. Clever boy. In my Company. He'll soon put it right. Now, about terms. You get one per cent. of the gross.

Bacon : Well, dash it, that's not much !

Burbage : Don't you make me alter my opinion, Mr. Bacon. When you came in, I said to myself, "There's a sensible, level-headed young chap, quite different from the rest of them". If your play is as good as you think it is, why, you'll make

a pile out of it. Sign here. (To an office-boy) Hey, Tom, go down to the Mermaid and get William.

Enter *William Shakespeare*

Well, there you are. Read this play at your leisure and meet us at the Mermaid day after tomorrow.

[Exeunt omnes]

SCENE II (The Mermaid Tavern)

Shakespeare : (Producing a fat sheaf of notes) Well, laddie, I've read your play and I think it is rotten. But it will have to do. I'll be able to polish it up, though it will need some real hard work. The finish you have given the play is weak. What you want at the final curtain is to have the whole crowd jump on one another and kill everybody else. We'll have the King poison the wine and Laertes poison the sword and then Laertes plugs Hamlet with the sword and drops it and Hamlet picks it up in mistake for his own and plugs Laertes, and then the Queen drinks the wine and Hamlet sticks the King with the poisoned sword.

Burbage : Swell!

Bacon : (Protesting) But, surely, isn't all that a little improbable?

Shakespeare : It's what the public wants. Or (sneering) do you think I don't know?

Burbage : (Soothingly) Sure he knows you know, Bill. Don't get your shirt out. We are all working for the good of the company. Anything else, Bill?

Shakespeare : Is there anything else! Why, there is nothing else but something else. For one thing, he has made the hero a loony!

Bacon : (Feebly protesting) His sufferings drove him mad.

Shakespeare : They certainly won't, at least not in any play I am going to have anything to do with. Listen, I have been in this business.....

Burbage : (Patting Shakespeare's arm) 'S all right, Bill, 's all right.

Mr. Bacon's not arguing. So you'll make him not crazy, Bill ?

Shakespeare : I'll do better than that, I'll make him *pretend* to be crazy. Everybody's fooled, but the audience.

Burbage : Mr. Bacon, I told you this boy was clever.

Shakespeare : Gives a chance for comedy.

Burbage : So it does, Bill, so it does. Mr. Bacon, I'll tell you what I am sure Bill here will do to meet you half-way. He'll make Ophelia loony. An audience doesn't mind crazy girls.

Shakespeare : (Reminded of some private grievance) All girls are crazy, anyway. But, coming back to this comedy angle, I'll write in a scene where Hamlet kids the two 'Varsity boys, Rosencrantz and Guildenstern.

Burbage : That'll be fine. It'll go well on Boat Race night.

Shakespeare : (Frowning thoughtfully) "To be or not to be.....," hmm.....I'm wondering about that speech. The public don't like soliloquies.

Bacon (Now thoroughly roused) : Yeah ?

Shakespeare : Yeah !

Bacon : Says you !

Shakespeare : Yes, says me !

Bacon : How about Eugene O'Neill ?

Shakespeare : That's all right about Eugene O'Neill. Those yanks'll do anything.

Burbage : Now, now, boys ! I think, Bill, it'll be better to keep the speech in. It'll give the stage-hands time to set the next scene.

Shakespeare : All right. But then it has got to be longer. I'll write in a line or two. How about "Or to take arms against a sea of troubles" ? Thought of it in a flash !

Bacon : You cannot take up arms against a sea ! It's a mixed metaphor.

Shakesprare : Who says it's a mixed metaphor ?

Bacon : I say it's a mixed metaphor.

Burbage : Boys, boys !

Bacon : (Rising) Oh put it in, put it in.

Burbage : You going, Mr. Bacon ?

Bacon : Yes, to take a couple of aspirins and try to forget.

Burbage : Just a moment, do you approve of the bills reading as follows:

HAMLET

by

WILLIAM SHAKESPEARE

and

FRANCIS BACON

Bacon : I positively refuse to have my name associated with the thing you are producing. [Exit in a huff].

(The dialogue is based on an essay by P. G. Wodehouse).

The Quest For Irony

HIREN GOHAIN

Fourth Year, Arts

".....Laurie put his arm round her shoulder. "Don't Cry", he said in his warm, loving voice. "Was it awful ?"

"No," sobbed Laura. "It was simply marvellous. But Laurie....." she stopped, she looked at her brother. "Isn't life", she stammered, "isn't life..... But what life was she couldn't explain. No matter. He quite understood.

"Isn't it, darling?" said Laurie".

: *The Garden Party* : *Katharine Mansfield*

I would risk saying at once that the test of a great novel is Organic or Imaginative Structure. Coleridge defines the powers of Imagination as the fusion of many into one and as a vital amalgamation of opposites. The organic form does not merely place the discordant elements of creation

side by side, they are held together by a pervasive unity recalling an organism. I shall endeavour to show that irony—in the sense that I maintain—is not an extraneous insinuation, but the complexion of such an organic form. Modern critics, in emphasizing the role of irony seem to me to be on the whole on the right track, even if the formulation remains still awkward. I believe that a wide application of this principle in fictional criticism will be exceptionally rewarding.

In some respects the position taken here is antipodal to that of Mr. Arnold Kettle who in his interesting book on the English novel has occasion to observe that the form or pattern of a novel has no relevance to its criticism unless the author uses it to impose a pattern or design on life as he represents it. That the 'pattern' of a novel should be functional or expressive seems to be a truism. Yet we are afraid that Mr. Kettle's notion of form differs radically from our own. The form we speak of *can* certainly be discerned and discussed, but it is not something that can be geometrically defined. For the esemplastic imagination abhors such tailoring. *Interpretation alone does not inform a novel; if it does, it may as* well fail to infuse life into the novel. Henry James underscores a paradox in his *Art of fiction* that demands a wide hearing:

"In proportion as in what fiction offers us we see life *without* rearrangement, do we feel that we are touching the truth; in proportion as we see it *with* rearrangement, do we feel that we are being put off with a substitute, a compromise, and a convention."

At the heart of the paradox is the conflict between creative humanity and the spirit of things, essentially alien to the former. Our morality, our culture, our values consist of a series of triumphs achieved by creative humanity in the struggle. But the conflict is never resolved, the tension is perpetual. The artist, if he has any sort of penetration, does not merely represent life, but also reveals the underlying antinomy. This revelation is not a matter of gratuitous sermons to the reader, certainly not of ratiocination or analysis. It is the function of the imaginative structure which is thus "significant" in a very wide sense. The point of illumination is where the cruelty and the lawlessness of things and the pity and justice of man intersect. Ivor Richards, claiming that tragedy is the highest product of literature, shows how pity and terror, two opposed impulses counterbalance each other within the tragic form: the impulse to advance and the impulse to recoil exist in keen mutual tension. We may also point out that terror is aroused by the tyranny of things, while pity wells up for the man. Whether the division between man and things is absolute or not is not for me to say. But I doubt whether we can do without a recognition of the chaos, even though it be in a relative sense.

Where the interpretation has recourse to logic and analysis, the paradox recedes to the far horizon. Either we explain the world with facile

competence or argue about in a charmed circle of our own making. (This does not disparage the use of reason !) The only intimate and inclusive "explanation", capable of sustaining the paradox, seems to be provided by poetic imagination, and irony is an unfailing indication of the working of that imagination.

The ironic principle has another philosophical basis which ultimately derives from that aspect which we have just touched upon. Life itself has a certain inexplicability about it. More than often the creative spirit of man suffers from fetters of his own making ! Institutions for example lead as often to a withering death as to nourishment. The inexplicability is a factor of the creative adventure. Deterministic interpretations ignore it. But the soundest accounts, even if primarily deterministic, must give this factor elbow-room. Any representation of life worth the name adopts irony in order to complete the account. This seems to me the secret of that "air of reality" Henry James insists upon.

Before going into a more detailed exposition I ought to produce convincing evidence in favour of my argument. I proceed with what may strike one as peculiarly unfavourable. I mean the case of Shaw and Hardy. Apparently the former only preached in brilliant journalese advanced ideas, while the formula of the latter has been discovered by his detractors to be the age-old "Man proposes, God disposes"! One need not be extraordinarily sagacious to predict that none may hope to win immortality with such testimonials. But when one considers the play *Candida,* carefully, it appears that the thesis about the (economic) emancipation of woman by no means explains its appeal. Whatever her rational views (or Shaw's, for the matter), Candida decisively and voluntarily rejects the hope of liberty ! There are a lot of paradoxical complications in the play, but I need not be detained by them. My point is that in a number of plays Shaw struck the point of illumination and he is bound to be immortal.

The ultra-modern debunking of Hardy—unfortunately led by Dr. Leavis, who calls him a 'second-rate provincial'—seems to mistakes his technical clumsiness for a basic failure. I concede that he was insensitive to certain matters, that his style had a habit of attitudinizing. In *Tess* for example, the heavy stone-henge episode and the sleep-walking scene confound one. Yet we notice how tough and solid Hardy's vision was; he was not a man to shrink from unpleasant consequences, nor one to gloat upon horror. He calls Tess "a pure woman" and thus focusses an ironic light upon her life. Tess herself is certainly pure, but no prude. She faces disasters that overwhelm the ideal aspirations of her life, but she holds out with the amazing toughness of inexplicable life. She commits a murder, but that was for supreme love. In the last chapter where she clings pathetically to Angel Clare, who is a suffering, haggard and limited creature

and wonders at the strange violence of her affection, there is a peak of irony. Again, each detail of the book, each symbol is saturated with this ironic undercurrent. Consider the place where Tess places a bunch of flowers in a jar at the grave of her baby: "What matter was it that on the outside of the jar the eye of mere observation noted the words 'Keelwell's marmalade.'" The complex fabric of human experience unmistakably *reveals* itself, and this alone is a passport to immortality.

Again, I wish to emphasize that the principle of irony is not an esoteric doctrine invented by modern rhetoricians for abstruse conversation. The ripe wisdom of country-lore—its flavoured jokes and yarns, its immunerable proverbs, its peculiar reactions to life—is by and large paradoxical. J. M. Synge felt this when he wrote his *Playboy of the Western World.* Chesterton's cockneys inherit such a tradition. The Elizabethan mixture of dramatic genres was an offspring of folk-wisdom. Anyone can discover for himself instances of reconciliation of opposites achieved by the country tradition.

According to I. A. Richards, complexity of structure is the only sure guarantee against the trick of stock-responses. Wily authors—like demagogues—have recourse to them as often as readers are gulled by them. Stock-responses prevent the growth of our taste, raise a wall between our sensibility and good poetry, allure confidence tricksters into literature. The aspiring Victorian poet, for example, incessantly wept about transience of and beauty! The honest artist would on the other hand resist formulae, assimilate all kinds of experience and put all of them under contribution. Dr. Richards' psychological account of the fact in terms of poise and commingling of impulses is however too daring for us. One of my tutors pointed out to me that Dr. Richards's cœnesthesia had taken value to be quantitative. Such fears however should be dispelled by his *Coleridge on Imagination* where he stated unequivocally that each organisation results in a unique and new attribute pertaining to the whole, which is yet not a consequence of summation.

C. S. Lewis in his *Preface to Paradise Lost* makes a frontal attack upon Dr. Richards' theory. He holds that the desire to escape stock-responses is 'immoral' and implies a retreat from civilization to the arms of the primordial flux. If we have to justify our indebtedness to Richards, we must refute or at least counter these arguments.

Mr. Lewis objects that only a romantic primitivism seeks to reflect the crude tangle of experience. All classical cultures insist upon mastering experience and not on surrendering to chaos. This was certainly the case with most ancient cultures. Yet the poetic or imaginative mastery of experience need not run parallel to moral or metaphysical discipline. In Greece there was at least the notion of poetry as a "divine madness."

Whether the Greek "simplicity" in arts ever overcame the complexity

of experience is a matter where I cannot pretend to authority. If it did, it would seem to be a dubious achievment. But I believe that the tragedies sufficiently disarm such suspicions. The tension between pity and terror may be driven underground, but it remains all the same. Besides, the principle of Sophoclean irony seems to embrace that of the comic reversal. In seeking an explanation of human misery the great tragedians never offered ready-made justifications; the conception of jealous gods executing universal justice seems to me a supreme example of paradoxical insight. Consider Aeschylus' *Prometheus Bound,* where both Zeus and Prometheus are sufficiently rebuked; morality and justice are enveloped in irony. The ideal of simplicity thus does not seem to dislodge an insight into complexity. And the reverend Homer himself seems to have intended sly jokes and chuckles that the Victorian appetite for "surge and thunder" could not divine. In support of my argument I refer the interested reader to the translations of W. H. D. Rouse and the writings of Samuel Butler.

The Hindus——and here I consider myself competent enough to join issue with C. S. Lewis——do not show a particular flair for simplification. Consider the multitudinous symbolism of Hindu art, calmly defying canons of congruity and simplicity. The Hindu philosophy of life, though highly sophisticated (I am speaking of a philosophy of life and not such creeds as Shamkara's), is far from simple. (Incidentally, one may remind oneself of the paradoxes of the Christian faith). But then, what about *Shakuntala* which is surely a supreme example of non-ironic, triumphant simplicity ? The villain here is absolutely free from guilt. (The orthodox view that both Dushyanta and Shankuntala suffer for their clandestine union, which is sinful because without social sanction, seems to be irrelevant). The evil is an obstruction from outside the world of the play, and it is at last absolutely conquered. The profound appeal of the play, its serene and moving beauty like the distant range of white mountain-peaks——how are we to explain all this ? I am not sure if Kalidasa did not weaken his drama by attenuating the evil in men. Such claims as that Kalidasa was an ideal Hindu to do so are simply fantastic. But complexity is not really lacking in the play. The Prastavana itself appears to indicate an independent Indian tradition of "multi-consciousness" defined by S. L. Bethell (*Shakespeare and the popular dramatic tradition*). The stage imitates reality, but the quality of illusion is not lost sight of. The admixture of the comic element too, makes for complexity——the King's sorrow and the fool's antics and puns appear side by side. The "conflict of duties" facing both Shakuntala and Dushyanta in the earlier part of the play is given a life-like, ravaging force. Durbasas himself is given a smart cut by Anasuya and Priyamvada. Another variety of irony——rather Sophoclean——flashes across the famous fifth act. Kashyapa's ascetic virtues cannot prevent him from

heaving deep sighs at the separation from Shakuntala. But all these ironic touches are so delicate and deceptive that our pundits miss them clean and spend their lives in vainly trying to prove that Dushyanta was not acting improperly when he peeped at the girls from behind the trees ! Few of them, I dare say, ever appreciate the humour of the situation when Dushyanta strides out in majesty to rescue the "damsels in distress". Such are the evils of barren academicism !

The Chinese are such old lovers of paradox, such confirmed ironists ——not excluding their great teachers like Mencius and Confucius—— that I perhaps need not press the point about them.

Further, Mr. Lewis defends stock responses on the ground that they are the products and active agents of a living cultural tradition. A culture wants, in its own interest, that all its individual members should be steeped in the values it has defined. Stock-responses sustain those values in actual life. But Dr. Richards nowhere denies that the role of stock-responses is indispensable to society. But an artist who submits to a manipulation of them clearly lacks penetration. It is the mark of a creative imagination to stop at nothing in its work of reorganisation and re-synthesis. And the reader who is a slave to them has a diseased sensibility. If a work of literature is to attain universality and the homage of all mankind, it must transcend the limitations of individual cultures to some extent. Thus the sentiments aroused by a cow in an Indian Kavya may strike a modern American as rather exaggerated. Indians again, are said to excel in a sort of passivity and dumb tolerance. If Kalidasa went all out for such dispositions in his Shakuntala, he would have had far less admirers.

Mr. Lewis warns us of a complete dissolution of structure in a near future, if the present-day fashion of irrationality persists. The tyranny of reason after the seventeenth century has made us incapable of coming to terms with paradoxes and has speedily chased away all possibilities of mythopoeia. Even the romantics could not check the general progress. The modern arts all rebel against reason, while they should have transformed it for the purposes of imagination. They could have restored to imagination its lost heritage. But they have indulged in an exclusive nihilistic riot. "No form!" rather than a "richer form!" seems to be their war-cry.

It is one thing to decry modern art and quite another to set upon the principle of irony itself as an immoral principle. Practical morality is something that has little or no effect upon the making of good literature, though prudery enforces taboos under which the creative spirit suffers. Besides, the practice of irony seems to me to serve the purposes of morality. Mechanical submission to morality makes us slaves to mere habits. The experience of life through literature makes us aware of the foundations of morality——its enmity with chaos, its spiritual victory, its profound

humanness. It makes us cling to moral values with a new understanding and intimacy, it reanimates the current that travels between morality and life in general. The burning irony of *King Lear*——irony penetrates every fibre of this play——shakes to the very roots our shallow notions about morality and inspires a rediscovery of 'eternal' moral values.

It should be clear already that I do not mean by irony 'stoic acceptance'. Irony is both passive and active, and stoicism is a passive attitude only. T. S. Eliot pointed out (*Shakespeare and the Stoicism of Seneca*) that the Stoic acceptance was a narrow, vain, complacent morality. "Stoicism is a refuge for the individual in an indifferent or hostile world too big for him." Irony does not encourage passivity or resignation, nor does it inspire crude cynicism. It tortures and at the same time illuminates, fills us with awe, perplexity, terror, pathos and a genuine humility in a unique equilibrium.

The complex unity of an organism realises itself locally. Recent critical studies have shown how the parallel of organic life extends to literature. Here too, parts reflect the quality of the whole. Ambiguity can be said to be a local sign of the organic irony. I can produce innumerable details from *King Lear* to prove my point. For instance, Lear dies in ecstasy, but ecstasy that proceeds from an illusion. The storm-scenes seem to me to be replete with irony. But very often the ambiguity is not explicit, we recognise it only in the light of the whole. Dickens' *Pickwick Papers* imbibes the ironic principle more than the later novels——and we may do well to remember that Chesterton found in it something that he missed in the rest of Dickens. Having made a close analysis of the storm-scene in *David Copperfield* I was unable to detect a trace of irony. Yet instances are not rare in Dickens. Many of us would remember the scene in *Nicholas Nickleby* where the mad gentleman carries on a fantastic courtship with Mrs Nickleby over the wall. It has been called grotesque. I wonder if it is not something deeper.

At the highest level of the ironic-imaginative novel we get a rich assimilation of disparate experiences, a tense balance between various opposites, a multiplicity of points of view, and an ambiguity pervading the most affecting parts. Dostoevsky wrote a number of such novels. Tolstoy was profoundly intrigued by Dostoevsky, whom he alternately praised and denounced. Once he told Gorky that Dostoevsky was so morbid that he could not create a convincing good character. So he made Prince Myshkin an idiot. But the idiot had in fact a sort of x-ray eye that always saw the heart of the matter, and he was a very human saint. Dostoevsky's feat thus turns out to be a great achievement and not a bungling. Tolstoy himself was an ironist without knowing it. Anna Karenina was not a sentimentalised Victorian heroine. Her fate is something that we cannot accept quietly——"Vengeance is mine, and I will repay." Despite her

suffering and misery, her suicide at the terrible last moments seem to her obscure, incongruous, fantastic. The moralist in him triumphs over the creative artist in *Resurrection*. But *The death of Ivan Ilyitch* remains a sublime and harrowing excursion into the realm of irony. Jane Austen too, is ironical and has no complacency about her. But the evil in her novels has a shadowiness that perhaps defines the range of her perception. The highest type of irony is not simply social-psychological but moral-metaphysical in overtones.

The ironic principle is more in order in fiction than in lyric poetry. Yet Cleanth Brooks argues that all good lyric poetry bears an ironic contact with reality. I should here express my deep debt to his ideas, of which my study is only an extension. He inspires me to believe that we can get out of the dilemma facing literary criticism: barren relativism or barren classicism? I hope that I have slightly realised the possibilities of such an approach.

It was the young lawyer's first appearance in the High Court, and naturally he was full of enthusiasm. 'The case he was to argue was a very simple one, and he had prepared his arguments well. He was virtually sure of victory. Imagine his disappointment, therefore, when the judge delivered judgment in favour of the opposite party. "Well, I am amazed", he exclaimed, forgetting all rules of court-behaviour.
"What did you say?", thundered the judge. "Meet me after the recess. You'll be tried for contempt of court."

The young man was almost in tears, for his professional career was at stake. A conviction would mean that he would never again be allowed to practise in the High Court. Moved by his pitiable condition, a senior barrister of the Court volunteered to defend him.

After the recess the judge explained the charges to the accused, and granted permission to the barrister to defend the young man.
"M'Lord," said the barrister, "allow me first of all to tender to Your Lordship the unqualified apologies of my friend for his misbehaviour in Court. There is, however, an explanation which I would like to offer. This young gentleman, as Your Lordship must have noticed, is young both in age and in the profession, and has virtually no idea of the ways of the Court, I can assure Your Lordship that when my young colleague will have gained some experience in the profession, he will not be amazed at *anything* Your Lordship ever says or does."
A red-faced judge acquitted the young man honourably.

—Dibyadyuti Hazra, *Fourth Year Arts*

That Night

DIPAK RUDRA

Fourth Year, Arts

It was my second night in Simla, characteristically nipping, and there being not much to be gained in risking my footing out in a blizzard in the heart of winter, I decided to turn in early, with a crackling open-hearth fireplace and Shankar, my new, faithfully decrepit man-of-all-work, to spice my mind up with local chatter. The old fellow sat patiently on the rug, stoking the fire and talking thirteen to the dozen. A mist seemed to come into his eyes, as he spoke in the clipped Himāchali dialect.....

"After so many idle days of drip-drip, everyone was thinking of a dreary, wet winter. Then one morning, startling us all, the prodigal sun was back. Well, there we were, out again, shovelling at the hillside, mowing down the yellow grass, turning the rain-sodden earth over in great, brown chunks. The sky had been scrubbed clean, but, then, we looked up only occasionally. We chopped and chopped in a daze, our 'kurtas' got pleasantly damp with sweat, we no longer felt tired. Those stones would have to be rammed in; that ledge was too dangerous—another cloudburst and there would be a roadblock, much inconvenience. The municipality-'wallahs' had told us so.

"The sun rose, it was midday, then it was afternoon. We heard the logyard-sirens snarl angrily and saw the frightened kites wheeling into the sun-flecked blue. We would have to work after dark, someone said. Sohan, our foreman, scurried about for lanterns. I watched the preparations dolefully—these winter nights in the open and my colds never left me. The doctor suspected something serious. That was no matter: I only dreaded the way home these nights of silvery moonlight. So many rustlings and whisperings were heard in the high trees. They said Sundar's daughter still waited at the bend—she was dead and had become a 'churel'. I was always, I admit, somewhat gullible, easily taken in; my friends pestered me for it. Of course, very few of them can laugh at me anymore; they just aren't. Call them what you will, I *have* seen strange things in my time. That summer when my half-bother Ravi fell off Cart Road, I was in Sanjauli, cutting up an old road. In the growing shadows I suddenly saw Ravi writhing on the tar, in a tearing pain. What was wrong? I approached and the whole thing wasn't there. My knees felt watery; I groped for a barrel to sit on. Everything blacked out. An hour later, the swoon had gone and they brought me the news: Ravi was lying

in the valley, his fine young body in smithereens. Then, there was the day Sarlā, my wife, was bitten to death by a reptile (I dare not name it !) in Jakhu. You know, these things keep coming back.

"That was that—I kept handing up the round, heavy stone-blocks. Thud, thud, they bolstered up the weak masses of sweet-smelling earth firmly. A good piece of work, it would soon be finished: I would have to go homewards. The moon I feared so much was resplendent; the lights on the hillsides merged with the stars. An occasional eerie blast shivered through the giant pines and deodars. Already the hullabaloo of the Mall must have had died down—it was colder on these clear nights. Any day the snows would come and it would be a white vista from Summer Hill to Chhote Simla, from Annandale to Jakhu. The last piece of granite was hoisted into place and, in that unearthly splendour of the winter moon, we dispersed, murmuring little expressions of discontent. I was on my long, lonely trek. For once, I had managed to banish all apprehensions. The goddess Tārā alone knew how much firewood had been found, whether I would get the customary blaze to thaw my numb limbs. Yesterday's fare had been royal: the well-meaning 'chowkidār', his brood be blessed, brought plenty of goat's meat. One could not expect such treats every-day; at least the 'chappatis' would be warm, I prayed, and just a little, precious, scalding-hot tea to wash them down with. My neighbours and I sometimes wondered what went on inside those huge, cosy rooms of the rich, what they ate in the eye-pricking day-light of electric bulbs, how they slept. Of course, they were not afraid, saw no 'bhoots', believed in no superstitions. They came from distant places, spoke strange languages, called us ignorant, inefficient rascals, and yet their money fed us; we could not be ungrateful.

"But one day two of them had angered 'Kāmanā', or so Grand-uncle Sheoprasad used to say. A real, red-faced Burra Sahib and his 'mem' had walked into her temple with shoes on! The 'purohit' protested: they laughed and kicked him, and they went away, the execrations of the good priest ringing in their ears. Little did they know that they were taking the shortest way to death. It had rained in torrents and the drizzling still went on. The evil couple passed by the very route I take, the sahib on his sturdy Arab and six ill-fated 'jawāns' tugging the mem's rickshaw. Then it happened: a streak of lightning, a loud report, and the road beneath the miscreants gave way—the whole hill was swept into the dizzy depths far, far below. At Cārignāno the 'chāprāsis' waited and waited, the tallow candles burnt themselves out and the shaggies mourned into the night. No one touched the cold 'khānā'; outside, the wind howled and the shutters rattled madly.

"That was another time and another place. Very little has taken place since then. Yes, they come; every year, that same October night, clouds

gather, it pours and the phantom-rickshaw is seen by those who keep awake.

"I haven't told you of the Churel Baori, but, then, you must have heard. There is a big hospital,[1] in Bemloe, where women go to have babies. Not all take it easy: some leave their lives for the new-born to continue. Now, these wretches can find no peace in the other world; so they stay and wail and plague the living. That 'baori'[2] beside the hospital is where the dead women hide. After midnight you can hear them scream, as the water gushes past, and their motherless children, wherever they are, rise, shaken, from their sleep.

"Speaking to you has done me good, for I could side-track out of my real story. But it happened long ago, and I am now old and a sceptic: I talk too much. Let us go on—so, I was trudging to my shack in Dhāli. Simla, in those days, was just as badly lit as it is now. Only, there was the moon leering over my shoulder. I had nearly reached the Sanjauli Mall; you know, it is a shadowy place, more to my liking than the ever-bright, shameless-seeming Ridge. That blessed silence was there, silence and darkness, and I was reassured. Not a leaf stirred in the foliage overhead, a strange thing, since it had been so gusty earlier. ' I passed Mashobra View and turned a corner. "The next moment, some 'pāgalkhānā', I imagined, broke loose. Two massive hill-pariahs, hurtling in from nowhere, fell on each other with all the ferocity of brutes quarrelling over a mate. Five minutes of biting, shrieking and stampeding, while I watched, stupefied. Then the hell-hounds slunk away, glowering and cursing, probably, in the most unprintable kennel filth.

"Just one more street-brawl, I told myself, quickly damning generations of worthy mastiffs in my irritation. I tried to be angry with the dogs; instead, I felt scared. A strange fear had come and coiled itself round my legs. What, I wondered, had driven the dogs crazy? I couldn't move. A low branch swayed in the rising breeze and hit me across the face. Very flustered, I bent it away, the leaves parted, and *a pair of bare feet swung out.* There were deep incisions, as if made by canine teeth, on them, red, raw and pathetic. Oh, Mohanbābu, every inch of me trembled at the sight! Drawn by a fearful fascination, I looked up. A young woman had hanged herself. The eyes stared out wildly, terrified at something; the clothes were in tatters, rent in long, continuous strands. It was nothing new, the fact as it stood. But those feet those throbbing, swaying, meaningful feet .... in a flash, I saw the whole thing, a lost, mortally frightened girl and those two fire-spitting monsters. Bhagwān, that such a matter could be! Suddenly I became overwhelmingly aware that I, too, was alone, it was well past the witching hour and the night had

[1] The Lady Reading Maternity Home.
[2] Hillstream, equivalent to 'jhorā' of the Eastern Himalayas.

crept up stealthily to my side. I couldn't escape from it: it was here, there, everywhere. I had invited darkness and now the forces of the dark were taking possession of me. Legion mocking feet were dancing a devil-dance. I was drenched in perspiration, my head went swimming and my eyes, transfixed, looked and looked.

"It was broad daylight and bitterly cold when I picked myself off the road. My work-worn clothes were heaped with snow, new-fallen, flaky. I was alive—a miracle in itself. A curious rabble had gathered round me. Parrying their questions, I hobbled away. Two of my fingers showed frostbite. They had removed the body."

The blizzard had calmed. My Omega Seamaster registered a quarter past one. Shankar sat rigid, gazing into the glowing embers. *'Bahut rāt ho chukā;* go get some sleep', I motioned him away. The featureless winter moon shone in through the frosted-glass panes. It was a comfort I could not see the night.

Restoration Stars

KRISHNA KOYAL

Fifth Year, Arts

The triumphant Stuarts were restored in 1660. With them came back the actors and playwrights and the theatres changed characters—from Elizabethan they became Continental. This period was not a period of enduring drama, but was a golden age of English acting and a period of physical change and betterment in the playhouse.

Charles II when he became King in 1660 authorized Sir William D'avenant and Sir Thomas Killigrew to organize two new companies of players. D'avenant immediately gathered together a body of players to whom was given the title "the Duke of York's Company." Killigrew assembled his actors under the title of "The King's Company", and to provide suitable accommodation for them ordered the creation of the first Theatre Royal in Drury Lane in 1663. There was keen competition between the two companies, which only ended in 1682 when the two were amalgamated.

The main actors of the King's Company were Charles Hart, Edmund Kynaston, Michael Mohun, John Lacy. Killigrew's ladies included the

beautiful Mrs. Margaret Hughes, Mistress Catherine Corey, Anne and Rebecca Marshall, dashing Mrs. Knipp and pretty Nell Gwynne. Against them D'avenant assembled such actors and actresses as Thomas Betterton, Robert Nokes, Mrs. Davenport, Mrs. Davies, Mrs. Saunderson who later became Mrs. Betterton, Elizabeth Barry, and Mrs. Bracegirdle.

Of all these Restoration actors and actresses there are few who will bear discussion. Edward Kynaston was born of a decent family—the Kynastons of Otely in Salop. With his extreme good looks he was made to play girls' parts in the days before women were allowed on the stage. The actual date of his birth and when he first appeared on the stage, we do not know; but this much is certain that he lived to a good age—well past sixty—and he died in 1712. He was on the stage for forty years, from 1659 until 1699.

Of all the actors who played women's roles he was easily the most famous. Pepys said that Kynaston was the loveliest lady he ever met. Bowers, the celebrated prompter of Drury Lane, said that it was a matter of dispute among critics as to whether any woman touched the heart more deeply than he did. Cibber remarked that when Kynaston gave up female roles and played male parts, "every sentiment came from him as if it had been his own, as if he had himself that instant conceived it, as if he had lost the player and was the real king he impersonated." He was a popular man and a popular actor, but he made enemies too. He had a happy married life. He was, according to many critics, one of the most important pillars of the Theatre Royal in Drury Lane.

Another such considerable pillar of the Drury Lane Theatre was John Lacy. He had great talent and instructed Nell Gwynne in the art of acting. Lacy could play nearly everything. He held his popularity for over two years, and was renowned for his remarkable stage-wardrobe which many gentlemen went to inspect. He was one of the great Falstaffs —sharing the distinction with Quinn, Betterton and later Sir Herbert Tree. He took great enjoyment in playing parts which enabled him to make "cracks." He could play fine gentlemen, stupid fops or rogues with equal facility. He was expert on the fiddle too.

Mistress Catherine Corey, one of the first to tread the boards of Old Drury, was a good character actress, whose biggest success was probably in *The Alchemist*. She played many roles and excelled in those in which she had to represent age. She once caused a real uproar at Drury Lane. Egged on by Lady Castlemaine, a frequent visitor to the Drury Lane, she made up like a certain Lady Harvey, against whom Castlemaine had a grudge. Not only did she make up like her, but she gave an imitation of her, which was so good that the lady herself recognized it. The outraged victim got the actress arrested, but Lady Castlemaine obtained her release, and made her do the whole thing over in the presence of the

King while the hirelings of Lady Harvey pelted her with oranges and hisses. Mrs. Corey is heard of no more after 1692.

Mrs Knipp was another very popular actress. Pepys had great admiration for her and wrote, "Pretty enough, but the most excellent mad humoured thing and sings the noblest that ever I heard in my life." She was the mistress of Sir Charles Sedley and played parts in his comedies. Killigrew thought highly of her talent and told Pepys: "Mrs. Knipp is likely to be the best actor that ever came upon the stage, she understanding so well".

Mrs. Margaret Hughes was a very beautiful woman. She played many important roles. Pepys said of her, "A mighty pretty woman and seems, but is not, modest". But he was very glad to give her a kiss! She captivated and subdued the stern soldier Prince Rupert from his scientific research to which he had turned when there was no more need to lead cavalry charges. He wooed her with great determination. She bore him a daughter, but she ruined him, and at the end her extravagance ruined her. She had to sell off her jewels which the Prince had given her, some of which Nell Gwynne bought.

Michael Mohun was another of the bright stars of old Drury Lane. He was a man of small stature but of great art and power. He had a pleasant manner, and was always the peace-maker when disputes and strife rose—which was a common happening then.

Charles Hart, his co-sar, was a grand-nephew of Shakespeare. He was a fine actor. He acted the role of Alexander the Great in such a splendid manner that he created a sensation. The Earl of Rochester called him the "Roscius"[1] and Mohun the "Aesopus"[2] of the stage of that time. In Hart's days tragedians ruled the stage, but he could be as good a comedian as he was a tragedian. He was very handsome and had a fine voice. When playing he became unconscious of his audience, so absorbed was he in the part he portrayed.

The greatest actor on the English Stage in those days was Thomas Betterton. He first appeared in 1661 at Lincoln's Inn Field. His acting of Hamlet was a memorable one for it brought a freshness to the role that won the hearts of his audience. Pepys regarded it as "the best acted part ever done by man" and Betterton as "the best actor in the world". King Charles II, who esteemed him very highly, sent him to Paris to learn French theatrical art. He was fairly tall, had a dignified austere figure and possessed a voice with remarkable intonation. His other main roles were in *King Lear, Othello, Macbeth, Love for Love, The Provoked Wife* and *The Way of the World.* He bade farewell to the stage in *The Maid's Tragedy* on April 13, 1710. Four Royal Personages honoured him, Charles II, James II, William's Queen Mary and Anne. All his life he worked

[1] A celebrated Roman actor.
[2] Another actor and a contemporary of Roscius.

hard and took little rest. He was a just man in all his dealings and an ideal husband. He returned good for evil. He was the forefather of the great Hamlets from Burbage to Gielgud and Olivier. He died in 1710 and was buried in Westminster Abbey. Mrs. Betterton, who too was a great actress, survived him but lost her reason. The story of the Bettertons is the story of the stage and its players in its happiest, most attractive light.

The name mostly coupled with Betterton was Elizabeth Barry. She was the daugter of a barrister who fought on the king's side. After her father's death D'avenant took her into his house and trained her for the stage. She was very dull at first, but the young Earl of Rochester took an interest in her and instructed her personally. She first appeared in 1673 at Dorset Garden as Isabella, Queen of Hungary. In a few years she blossomed forth as the greatest tragic actress of the 17th century. Cibber said that she had a presence of "elevated dignity", that her voice was full, clear, and strong "so that no violence of passion could be too much for her", yet she could subside into "the most affecting melody and softness". Her private life was notorious. She acted her last in 1710, the day after Betterton retired, and died in 1713.

Another famous actress of this period was Anne Bracegirdle, a most fascinating woman. She was placed under the care of Betterton and his wife when very young. She first appeared in *The Orphan* when little more than a child. She was well known for her playing of romantic and comic roles. Her rendering of Portia, Isabella, and Cordelia were of considerable merit; but in the delightful roles of Angelica (*Love for Love*) and Araminta (*The Old Bachelor*) she reached her heights. These two roles were especially written for her by Congreve who admired her very much. She was a very respectable woman and was as good as she was beautiful. Cibber said that her virtues made her the delight of the town. Her figure was perfect, she had dark brown hair and eyebrows and eyes of the same colour. She was charitable too. She retired from the stage early in life in 1707, lived to be 80 and died in 1748. She was buried in the cloisters of the Westminster Abbey.

The most romantic figure in the Restoration period was Nell (Eleanor) Gwynne. Her story is romance itself. Where did she come from, the girl who captured all hearts, ruled a king and kept his love, swore like a trooper, lived an immoral life yet delighted all? "Who proved herself one of the most delightful comediennes, who left a long line of Dukes to succeed her, and who, more than any one else in its long story, is bound up in the popular imagination with Old Drury, though her career there was so short?"

Not much is known of her early life. She was probably born in Hereford from where she came. She was illiterate and hardly knew herself. Some said that she was an orange-girl in the pit of Drury Lane.

She attracted the notice of Lacy who instructed her in the art of elocution, deportment and so forth. She improved quickly and won the affection of Charles Hart. He took her in hand and coached her for the theatre. She spoke well, danced perfectly and acquired a most fascinating laugh. Her début came in a serious role (she was never successful in tragic parts), 'Cydaria', in Dryden's *The Indian Emperor* in 1665. She then appeared in 1669 in Howard's *The English Monsieur* and was a great success. Her merits as an actress were of not much value, but she had the ability to acquire knowledge and certain style without much toil.

The King visited the theatre one afternoon in 1669 when Nell was playing a comic role in Dryden's *The Maiden Queen.* He was completely captivated by her, and that very evening he carried her away and made her his mistress. But his gain was Drury Lane's loss. Nell never returned to the stage.

"The romance that surrounds her memory hides much that is sordid and squalid. What remains is affection and respect." She possessed a loyalty and truthfulness which would have graced her so-called betters; she loved her country and worked for it in her way. She loved her mother, to whom she owed nothing but her birth, and she loved her King. She held him longer and more closely than any of the other women; his last thoughts were of her—"Don't let Nelly starve" he said to James—and to James's credit, he did not. Nelly outlived her king by two years.

These men and women were then with all their faults and virtues the makers of the famous Theatre Royal at Drury Lane. To them we are grateful for ushering in a world of imagination and fancy, a world of laughter and tears. The tradition that the Elizebethan actors created was enriched by these Restoration actors and actresses, and they have been followed with great love and respect. The galaxy of names that follow their lead would have done credit to any great man or woman.

Doctor Zhivago

KETAKI KUSHARI

Fifth Year, Arts

It had been the dream of Dr. Zhivago's life, we are told, 'to write with an originality so covert, so discreet, as to be outwardly unrecognisable in its disguise of current, customary forms of speech'. Elsewhere Pasternak confidently claims that the living language of our time is urban, that the seemingly incongruous and arbitrary jumble of impressions in contemporary art is not a stylistic fancy but taken directly from life, from streets in cities which hurry past us with their busy crowds and vehicles. Nothing should give more pleasure to the reader of the controversial book *Doctor Zhivago* than the discovery that the language of Pasternak, both in the prose and in the verse, testifies to his striving after a rare identification of purpose and practice. The translators humbly admit that their work has been approximate and point out that Pasternak makes use of sound and word association in the manner of a poet of genius. The magic inherent in particular sounds and words in peculiar juxtaposition to one another is a major sustenance of great literature and the value of translations lies in conveying a rough idea of the original. It is a proof of Pasternak's genius that through the simple, unassuming surface of the English translation we can catch glimpses of the strange and bright water-life which the Russian must be. For, Pasternak achieves a felicitous union of the sensuous image and the emotive memory through the medium of a personal rhythm; and every movement in this rhythm reveals the unique, strictly individual manner in which the author's alert artistic sensibility received, recorded and reacted to external impressions, or expanded and clarified immediate intuitions. Pasternak never resorts to stock images which blur our responses ; his words force us to evoke the image concerned with great liveliness and leave an apprehension of something sincerely and intensely felt and perceived.

> 'When they came out the fresh air seemed as unfamiliar as after weeks of illness. Noises, rounded, as if polished on a lathe, rolled echoing lightly through crisp frosty, nut-clean space.'

> 'Like gas butterflies the street-lamps,
> Touched by the morning, trembled.'

When he speaks of the countryside Pasternak does not assume a tone of forced, pastoral pseudo-artlessness which he condemns; his language has always that vital urban quality which is his ideal and at once goes

to the heart. Trees in Pasternak hold out 'napkins of snow hospitably towards the train' and dark water where a boat has made a rift among waterlilies shows 'like juice in a water-melon where a segment has been cut out'.

It is necessary to emphasize that *Doctor Zhivago,* though full of limpid descriptions and lyrical monologues, is not an assemblage of sparkling pebbles; it has the essential element of *ordonnance* or structure. As the reviewer of Quiller-Couch's anthology of English Prose said in an issue of the *Times Literary Supplement* : 'Good prose must have a pace : it must step like a well-bred horse.' The real excellence of the prose style in *Doctor Zhivago* cannot be borne out by extracts; to appreciate it we must go through the entire book and trace the continuous and stately progress of the rhythmic sequence from the first sentence to the last. And this is all the more true because Pasternak's language is everywhere informed and modified by a predominating passion and a conscious assimilation and reinvigoration of the national tradition. His theme is Russia, 'his incomparable mother; famed far and wide, martyred, stubborn, extravagant, crazy, irresponsible, adored, Russia with her eternally splendid, disastrous and unpredictable gestures.' He delineates with sympathy and and penetration the tragedy, the terror, the pathos of the Russian Revolution; he shows how the lives of individual men and women enmeshed in the fateful webs of history can be fruitful, fragrant and significant; he proves how trifling such things as reshaping the world are in comparison with the riddles of life and death and the beauty of genius and human love.

It would be unwise to throw aside as irrelevant the political aspect of *Doctor Zhivago.* In fact a proper understanding of the greatness of the book must include an appreciation of Pasternak's interpretation of a great movement in history. In relation to the Russian Revolution this book is as little malicious or perverse as *A Tale of Two Cities* was in relation to the French Revolution. Pretty platitudes or hollow sentiments are what Pasternak detests with all his being; he wishes to tell the burning truth, truth coming into being only when facts are overlaid with some measure of the artist's 'wilful, human genius, of fairy tale, of myth.' I believe Pasternak gives a truer picture of the Russian Revolution than any text-book of history can possibly do. This is because Pasternak makes us see this important event through the eyes of sensitive, suffering men and women and also because he sees it steadily and whole, whereas whatever a historian sees is generally fragmentary and incomplete. The entire Russian society and landscape become the throbbing orchestra of Pasternak's theme: the immense stretches of black, virgin forest, Moscow blinded by the sun and the white heat of asphalt yards, the bleak ashy mornings and shimmering glassy afternoons, the mooing of cows and the whispering

of lime-trees. The very rats and pigeons are part and parcel of the human story and happenings of history. 'Rome came out of Greece and the Russian Revolution came out of the Russian enlightenment', because the Revolution was accompanied by the desolation of the orphan, the fall of the school-girl, the premature death of the artist and the practice of constant, systematic duplicity leading to small cardiac haemorrhages. The First World War complicated the issue. It is a fact to be noted that Zhivago never sees two of his children though they are born long before he dies. This state of affairs is manifestly abnormal : 'Why has Thou cast me off, O Light everlasting! Why are we always separated, my dear ones? Why are you always being swept away from me?' Overcome by cold and hunger and deprived of the normal channels of self-expression and satisfaction of desires, the Russians succumb to the cheerless zeal of sin. Pasternak touches carefully the stories of atrocities—which reach their climax in the gruesome story of Tanya's childhood in the last chapter—and he never over-emphasizes them, always remembering to set against them episodes which open the springs of pity and tears and which help to re-establish our faith in the potentialities of human nature for godly tenderness and self-sacrifice.

Pasternak's judgments on the Revolution are precise and unequivocal and I feel that it is necessary to give a few examples in order to allay misapprehensions regarding his intentions. Pasternak, it will be seen, never accepts the proposition that the end justifies the means.

> 'It was then that falsehood came into our Russian land. The great misfortune, the root of all the evil to come, was the loss of faith in the value of personal opinions. People imagined that it was out of date to follow their own moral sense, that they must all sing the same tune in chrous, and live by other people's notions, the notions which were being crammed down everybody's throat. And there arose the power of the glittering phrase, first tsarist, then revolutionary'.
>
> '... the whole upheaval takes a few weeks or at most years, but for decades thereafter, for centuries, the spirit of narrowness which led to the upheaval is worshipped as holy.'
>
> 'In those days it was true, if ever, that "man is a wolf to man". Traveller turned off the road at the sight of traveller, stranger meeting stranger killed for fear of being killed. There were isolated cases of cannibalism. The laws of human civilisation were suspended. The laws which men obeyed were jungle laws; the dreams they dreamed were the prehistoric dreams of cave-dwellers.'
>
> '... all that about no more fighting and all being brothers, I call that being godly, not menshevik, and about the works and factories going to the poor, that isn't bolshevik, that's according to humanity and loving-kindness.'

Doctor Zhivago is at the same time a witness to the immense and ruthless power of history and the vindication of private life as against meaningless, unthinking collectivization. The power of this novel must ultimately

derive from the moral sense which gives birth to it. The valuable experience which a great work of art communicates to us, shaped and irradiated as it is by universal rhythm, is not ponderable in the scales of common comprehension, but gives rise to an exhilaration which consists of joy as well as pain, the one existing in the other. While we enjoy and appreciate it politics or morality does not enter into the picture as a separate problem, as a problem unconnected with our process of artistic appreciation; if it enters at all, it enters as the stuff of art, as, that is to say, an important aspect of life. The truth that *Doctor Zhivago* embodies is nothing consciously superimposed on the story but is something fused with pathos and irony, description and reflection, into one symbology. Similar fusions, I believe, may be discerned in the passion-perdition conflict of Shakespeare, the vortical anguish of Dostoievsky, the plangent serenity of Valmiki or the apocalyptic and beautifully relentless dogmatism of Dante. When we perceive such a fusion we ask no questions: we can only thank the artist. It is a moment of light and revelation, a moment when our conflicting responses are reduced to a state of harmony and equipoise. *Doctor Zhivago,* incidentally, is a very Christian book. Even where Pasternak does not use the overt language of Christianity his language has yet strong religious overtones.

Though sharing fully the geniality of temperament of the great Russian authors, Pasternak does not fall behind his other European fellow-travellers in matters of technique. He does not, of course, surprise us by novelties; but he has a sure and brief manner of handling things and he makes certain objects appear and reappear in such a way that our attention is focussed on them. And then he makes some of those objects the themes of some of his poems, so that the whole chain of repetition has an effect similar to that of reiterated imagery in poetry. In the novel proper the way the Lara-Komarovsky liaison of the beginning is ominously renewed towards the end must be regarded as a masterly stroke. Komarovsky is the evil genius of Lara's life; and I feel that whenever Pasternak speaks of their attachment his language seems to be linked to the passages and poems on Mary Magdalene. This increases the range and depth of suggestion.

The poems are the crowning glory of the book and are deeply integrated with the novel. To appreciate any foreign poem in translation at least two translations are necessary, one absolutely literal and another giving an idea of the original metre and rhymes. In the English translation of *Doctor Zhivago* now available to us the poem 'A Fairy Tale' is represented by two such translations. We get a fairly good idea of the compression and discipline of the original; and as Pasternak claims, we can watch St. George growing smaller in the distance and hear the horse's hooves ringing on the surface of the poem.

Pasternak's poems have the haunting and solitary beauty of the white moon in the frosty night sky of Russia. As these shining and lovely apparitions glide before our eyes we watch the unfolding of a rich and ample mind keenly aware of itself and of the world at large and capable of bringing about a unique blending of *mémoire visuelle* and *mémoire emotive.* Pasternak has an abiding affection for the sights, sounds and smells of the earth and heartily enjoys whatever miracles our daily life can offer. His succession of images has the necessary combination of rapidity, abruptness and continuity and the English translations suggest that the Russian of the poems must be remarkably crisp.

'Don't cry, don't pucker your swollen lips,
Don't gather them into creases,
For that would crack the dryness
Formed by the spring fever.

'Take your hand off my breast.
We are high-tension cables.
Look out, or unawares
We shall again be thrown together.

'Years will pass, you will marry.
You will forget these unsettled ways.
It is a great step to be a woman,
To drive others mad is heroism.

'As for me, I have the reverence
And lifelong devotion of a servant
Before the miracle of a woman's hands,
Back, shoulders, neck.

'However many rings of pain
The night welds round me,
The opposing pull is stronger,
The passion to break away.'

We hope that the common man of Russia will appreciate the greatness of this very human and heart-warming book written by his countryman. It is a product of lifelong devotion and suffering.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B.A.
1915-16	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1916-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B.A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20	Mahmood Hasan, B.A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22	Syama Prasad Mookerjee, B.A.
1921-22	Brajakanta Guha, B.A.
1922-23	Uma Prasad Mookerjee
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25	Subodh Chandra Sen Gupta, B.A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B.A.
1927-28	Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B.A.
1929-30	Taraknath Sen, B.A.
1930-31	Bhabatosh Datta, B.A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B.A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B.A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B.A.
1934-35	Ardhendu Baksi, B.A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B.A.
1936-37	Asok Mitra, B.A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B.A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B.A.
1940-41	Manilal Banerjee, B.A.
1941-42	Arun Banerjee, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B.A.
1948-49	Subir Kumar Sen, B.A.
1949-50	Dilip Kumar Kar, B.A.
1950-51	Kamal Kumar Ghatak, B.A.
1951-52	Sipra Sarkar, B.A.
1952-53	Arun Kumar Das Gupta, B.A.
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta, B.A.
1954-55	Sukhamoy Chakravarty, B.A.
1955-56	Amiya Kumar Sen, B.A.
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee, B.A.
1957-58	Asoke Sanjay Guha, B.A.
1958-59	Ketaki Kushari, B.A.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti, B.A.
1915-16	Prafulla Kumar Sircar, B.A.
1916-17	Prafulla Kumar Sircar, B.A.
1917-18	Rama Prasad Mukhopadhyay, B.A.
1918-19	Mahmood Hasan, B.A.
1919-20	Paran Chandra Gangooli, B.A.
1920-21	Syama Prasad Mookerjee
1921-22	Bimal Kumar Bhattacharyya
1921-22	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Akshay Kumar Sircar
1923-24	Bimala Prasad Mukherjee
1924-25	Bijoy Lal Lahiri
1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Sunit Kumar Indra
1928-29	Syed Mahbub Murshed
1929-30	Ajit Nath Roy
1930-31	Ajit Nath Roy
1931-32	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1932-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Provat Kumar Sircar
1936-37	Arun Kumar Chandra
1937-38	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	Bimal Chandra Datta, B.A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B.A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibnlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindramohan Chakravarty
1950-51	Manas Mukutmani
1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhuri
1953-54	Pradip Kumar Das
1954-55	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Devendra Nath Bannerjee
1956-57	Subal Das Gupta
1957-58	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Tapan Kumar Lahiri